যৌন-বিজ্ঞান

(সচিত্র)

আবুল হাসানাৎ, আই, পি,

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্-বি, ডি-এস্-সি কর্ত্তৃক

ভূমিকা-সম্বলিত

মূল্য সাড়ে চারি টাকা

যৌন-বিজ্ঞান

(সচিত্র)

ভূমিকা

পুরাকালে ভারতবর্ষে কামবিদ্যা আলোচিত হইত এবং এই বিদ্যা শাস্ত্রের সম্মান লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে লোকে কামশাস্ত্রের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিত। যে প্রকার পর্য্যবেক্ষণের ফলে কামশাস্ত্র বা কাম বিজ্ঞান গঠিত হইতে পারে, তাহার ধারা বহুকাল হইল এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কামবিদ্যা বিদেশীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল। আধুনিক কামবিদ্যায় সমস্ত মৌলিক গ্রন্থই বিদেশীয় ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই সঙ্কলন; এই সকল পুস্তকে কামবিদ্যার যে আলোচনা আছে, তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে এবং লেখকগণের মতামতও সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাত দোষশূন্য নহে। আলোচ্য গ্রন্থও মূলতঃ বিদেশীয় কাম-

বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয় কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে যৌনবিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা আছে। গ্রন্থকার অশেষ পরিশ্রম করিয়া বহু বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কামশাস্ত্র, আরবীয় কামবিদ্যা সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত পুঁথি ও পুস্তক, ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি নানা প্রাচ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থকারের 'যৌন-বিজ্ঞান'কে কামসংহিতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি কামবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ না হইয়াও বহু আয়াসলব্ধ তথ্যগুলির আলোচ-নায় যে নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যেখানে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ বর্ত্তমান, সেখানে তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া সুচিন্তিত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যৌন-বিজ্ঞানে' বিজ্ঞান-গ্রন্থোপযোগী সকল গুণই আছে। গ্রন্থকারের লিখন-ভঙ্গী মার্জ্জিত ও সুরুচিসঙ্গত। তাঁহাকে অনেক নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছে। পরিভাষা সকল ক্ষেত্রে সুকল্পিত না হইলেও কুত্রাপি তাহা ভাব-প্রকাশে অস্বচ্ছন্দতা আনে নাই।

গ্রন্থকারের সহিত সকল কামবিজ্ঞানী একমত হইবেন,

এমন আশা করা যায় না। 'রতিকালের স্থায়িত্ব', 'জন্মনিয়ন্ত্রণ', প্রক্রিয়ার উপযোগিতা বিচার ইত্যাদি কতিপয় গুরু বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক পণ্ডিতের মতভেদ দেখা যাইবে। এই সকল মত বিরোধসত্ত্বেও গ্রন্থের কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

'যৌন-বিজ্ঞান' পাঠে সাধারণে উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি

১৪ পার্শী বাগান,
কলিকাতা।
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪২।

শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু

মুখবন্ধ

যে সমস্ত কারণে আমি এই পুস্তক প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, তন্মধ্যে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাই প্রধান। আমি শৈশব হইতেই অতি-প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের অর্থ আবিষ্কারে একটা তীব্র আকাঙ্খা ও দুনিবার কৌতূহল অনুভব করিতাম। ঝাড়-ফুক, যাদুমন্ত্র, যোগ-তাসাওয়াফ, হিপ্‌নটিজম, মেস্‌মেরিজম, পেলম্যানিজম প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী অধ্যাত্ম-বিদ্যা শিক্ষা এবং তাহাদের অর্থ ও ক্রিয়া আবিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকারের সাধ্য-সাধনাও করিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি সূফীবাদ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা শ্রেণীবিশেষের জন্য লিখিত হইয়াছিল; তাঁহাদের নিকট উহা আদৃত হইয়াছে।

আমার বর্ত্তমান গ্রন্থ শ্রেণী-বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে কঠোর অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সে সব কথা আমি উপক্রমণিকা অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নে মিঃ এল্, কে, চ্যাটার্জ্জী আই-সি-এস, ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি এবং বিশেষ করিয়া মৌঃ আবুল মনসুর আহমদ বি, এল সাহেবের সাহায্যের জন্য তাঁহাদের নিকট আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত মিঃ এইচ, জি, এস্ বিভার, আই-সি-এস্, খানবাহাদুর

মোহাম্মদ এম,এ, খালেক আই-পি, মিঃ এস্, এন্, দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার, এ, বি, রেলওয়ে, মিঃ এম, এইচ্, খান আই, পি, মৌঃ এম্, সিরাজুল ইসলাম এম্-এ, বি-এল, মুন্সেফ, নবাবজাদা সৈয়দ হাসানআলী চৌধুরী প্রভৃতি সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট আমি নানাপ্রকার সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়াছি।

তাহা ছাড়া আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে পুস্তকাদি পড়িতে দিয়া আমার সাহায্য ও উপকার করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছি, ঐ সমস্ত পুস্তকের নামের তালিকা দেওয়ায় বিরত হইলাম। উহাতে পুস্তকের পৃষ্ঠা বাড়ানো হইত মাত্র। কারণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমি এ বিষয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক অধ্যয়ন করিবার পর এই পুস্তক রচনায় হাত দিয়াছি।

এই পুস্তকের চিত্রাবলীর জন্য আমি বিভিন্ন ডাক্তারী বইএর সাহায্য লইয়াছি। তন্মধ্যে ডাঃ গ্রে-প্রণীত শরীর-তত্ত্ব হইতে আমি অনেক মডেল গ্রহণ করিয়াছি। সেজন্য উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক ও গ্রন্থকারের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রুফ দেখায় ব্যস্ততাবশতঃ কিছু কিছু ছাপা ভুল রহিয়া গেল।

এই গ্রন্থের একটী ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প আছে। তাহার উপকরণও যোগাড় হইয়া আছে। তথাপি দুইটী কারণে আমি বাঙ্‌লা সংস্করণ আগে প্রকাশ করিলাম। প্রথম কারণ এই যে, আমাদের তরুণ শিক্ষার্থিগণকে মাতৃভাষার সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা দেওয়ার দাবী আজ সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিবার মত

পারিভাষিক শব্দ বিদ্যমান নাই বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনীষিগণের সাধু প্রচেষ্টা আমাকে বহুলাংশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যদিও আমাকে অল্প-বিস্তর শব্দ তৈয়ার করিতে হইয়াছে, তথাপি আমি গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে, জটীল বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের অভাব আমি আমার মাতৃভাষায় খুব বেশী অনুভব করি নাই। পারিভাষিক শব্দের অভাবে আমাদের মাতৃভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের উপযোগিতায় যাঁহারা সন্দিহান, আশা করি শীঘ্রই তাঁহাদের সন্দেহের অবসান হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষাপীঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা বাঙলার মনীষী সার আশুতোষের স্বপ্ন সফল হইতে আর বেশী দেরী নাই। বাঙলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগ, বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ ও সাহিত্যসেবীদের চেষ্টার ফলে তাঁহার সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে।

মনোবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ গবেষক ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম, বি, ডি-এস্-সি মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি আশা করি, যে আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, অনুরূপ সদিচ্ছা লইয়া বাঙলার পাঠকসমাজ ইহা অধ্যয়ন ও সমালোচনা করিবেন।

ময়মনসিংহ **আবুল হাসানাৎ**

১লা চৈত্র ১৩৪২,

বিষয়-সূচী

উপক্রমণিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

যৌন-বোধ

তৃতীয় অধ্যায়

যৌন-ইন্দ্রিয়

চতুর্থ অধ্যায়

যৌন-বোধের প্রকৃতি

পঞ্চম অধ্যায়

যৌন-বোধের বিকাশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

যৌন-বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ

সপ্তম অধ্যায়

বেশ্যা-প্রথা

অষ্টম অধ্যায়

দাম্পত্য-জীবন

নবম অধ্যায়

দম্পতির রতি-জীবন

দশম অধ্যায়

প্রজনন

একাদশ অধ্যায়

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

যৌন-বিজ্ঞান

উপক্রমণিকা

যৌন-বোধের সংজ্ঞা—তীব্রতা—নিরোধ চেষ্টা—সাহিত্যে আত্মবিকাশ—ভারতীয় পণ্ডিতগণ—বাৎস্যায়ণ—কোকা পণ্ডিত—কল্যাণ মল্ল—নাগার্জ্জুন—লুপ্ত যৌনশাস্ত্র—গ্রীস—রোম—সেরাসিন—ইসলাম—অধঃপতন—মধ্যযুগ — আধুনিক ইউরোপ—আধুনিক ভারত—যৌন-তত্ত্বে অবহেলা—অবহেলার কুফল—ধর্ম্মে—নীতিতে—সমাজে—রাষ্ট্রে—যৌন শিক্ষার বিপদ—শাসনের প্রয়োজনীয়তা—শাসনের জটিলতা—গোপনতা ও স্পষ্টতা—সরলতার উপকারিতা—গোপনতার কুফল—শাসনের ব্যর্থতা—বিরুদ্ধ মতবাদ—প্রকৃতির শিক্ষা—গোপনতার অসম্ভাব্যতা—কিংকর্ত্তব্য—প্রশ্ন কি ?—যোগ্য শিক্ষক—শিক্ষা-প্রণালী—শিক্ষকের অভাব—শিক্ষা ও শিক্ষকতায় ব্যক্তিত্ব—বর্ত্তমান গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য—প্রকৃত যৌন-শাস্ত্রের অভাব—বর্ত্তমান পুস্তকের উপকরণ—পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা—অজ্ঞতা ধর্ম্মের ভিত্তি নয়—যৌন বিকল্পের প্রসার—পূর্ব্বসংস্কার জ্ঞানাহরণের পরিপন্থী—বিজ্ঞান-সাধনার ক্রমবিকাশ—মত-পার্থক্য স্বাভাবিক—সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই জ্ঞানের উৎস—আদর্শ দাম্পত্য-জীবন।

যৌনবোধের সংজ্ঞা

এক লিঙ্গের প্রাণী বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীর দিকে যে দৈহিক আকর্ষণ বোধ করে তাহাই যৌন-বোধ। যৌন-বোধের এতদপেক্ষা নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক প্ল্যাটো যৌন-বোধের সংজ্ঞা দিতে গিয়া রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—sexual feeling is ceaseless striving to come together by man and woman clept apart through the wrath of God—নারী ও পুরুষ ভগবানের অভিশাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পরস্পরে বিলীন হইবার জন্য যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে সেই চেষ্টার নামই যৌন-বোধ।

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে যৌন-বোধই মানব-মনের

সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বৃত্তি। এই বৃত্তির তীব্রতা সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কোয় ডি কারেল (Francois de Curel) বলিয়াছেন—সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে উন্নত, সুসংস্কৃত ও মার্জ্জিত-রুচি হইলেও যৌন-বৃত্তিতে তাহারা আজিও বনের হরিণ-হরিণীই রহিয়া গিয়াছে। আবার শরীর-বিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সমস্ত সৃষ্টির গোড়ার কথা এই যৌন-বোধ।

—তীব্রতা

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যৌন-বোধকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করিতে মানুষ বরাবর একটা অহেতুক লজ্জা বোধ করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলে একসঙ্গে কোমর বাঁধিয়া এই যৌন-বোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। ধর্ম্ম পরকালের নিতান্ত মনোরম সম্ভোগের লোভ ও কল্পনাতীত শাস্তির ভয় দেখাইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্র কঠোর হস্তে শাসন করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। সেণ্ট ভিক্টরের ধর্ম্ম-মন্দিরে ধর্ম্ম-যাজকগণের যৌন-বোধ সংযত করিবার জন্য বৎসরে পাঁচবার তাহাদের রক্ত মোক্ষণ করা হইত। পৃথিবীতে কোনও দেশে কোনও যুগেই সেণ্ট ভিক্টর মন্দিরের অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের যৌন-বোধের তীব্রতা তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

নিরোধ-চেষ্টা

কিন্তু লোকসান হইয়াছে খুবই। যৌন-বোধের বিরুদ্ধে এই সার্ব্বজনীন শত্রুতা ইহাকে মানব-মন হইতে দূর করিতে না পারিলেও প্রকাশ্যভাবে ইহার আলোচনা বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যৌন-বৃত্তির ন্যায় এমন তীব্র মানব-বৃত্তি সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা হইতে না পারায় ইহা মানুষের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইতে ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে

মানুষ অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা উন্নতি লাভ করিলেও এই অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে স্বীয় আদিম অকর্ষিত মনোবৃত্তির দাস হইয়াই রহিয়াছে।

বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া জগতে নূতন সভ্যতা বিস্তার করিতেছে। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি ও -রক্ষার মূলীভূত যে বৃত্তি, সে বৃত্তিকে অবলীলাক্রমে চাপা দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু লজ্জা বা কৃত্রিম নীতিজ্ঞান মানুষের প্রয়োজনবোধের তীব্রতাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে একশ্রেণীর নীতিবাগীশদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া মানুষ এই অতিপ্রয়োজনীয় যৌন-বোধের কৃষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইয়াছে। সেইজন্য প্রকাশ্যভাবে না হইলেও সামাজিক দৃষ্টির অন্তরালে একটী শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল যার নাম যৌন-শাস্ত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতার ফলে এই শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইতে না পারিয়া একটু বক্র ও কুটিল গতিপথ অবলম্বন করিয়াছিল। ফলে উহাদ্বারা মানুষ আশানুরূপ ও প্রয়োজনানুযায়ী উপকৃত হয় নাই।

সাহিত্যে আত্মবিকাশ

তবু একথা মানিতে হইবে যে, যতই অপূর্ণাঙ্গ হউক না কেন, সমাজ-দৃষ্টির যতই অন্তরালে হউক না কেন, যৌন-শাস্ত্র নামে একটী শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু শাস্ত্রটী বৈজ্ঞানিক রূপ প্রাপ্ত হয় নাই।

যৌন-বৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন সর্ব্বপ্রথম আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতগণ। গ্রীক ও সেরাসিনীয় পণ্ডিতগণও যৌন-শাস্ত্রকে বিজ্ঞানরূপে অধ্যয়ন করিবার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন বটে,

ভারতীয় পণ্ডিতগণ

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এ বিষয়ের আলোচনা হওয়ার অনুপ্রেরণা ভারতীয় পণ্ডিতগণই দিয়াছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাৎস্যায়ন নামক এক পণ্ডিত "কামসূত্র' নামক একটী অতি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করেন। বাৎস্যায়নের

বাৎস্যায়ন

পূর্ব্বেও প্রায় দশজন পণ্ডিত মানুষের যৌন-বৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের বিষয়ীভূত করিবার উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইলেও উহাতে বিষয়টী এমন ধারাবাহিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার আলোচনার মধ্যেও যে বৈজ্ঞানিকের অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সহিত পরিতুল্য।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে আরও কতিপয় যৌন-শাস্ত্রের পুস্তক আছে। ইহাদের মধ্যে কোকা পণ্ডিতের কাম-শাস্ত্রই প্রধান। কোকা পণ্ডিত বেনুদত্ত নামক এক রাজার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার

কোকা পণ্ডিত

রতি-রহস্য নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোঁকা পণ্ডিতের উক্ত পুস্তক তদানীন্তন ভারতে ও পরবর্ত্তী সময়ে এত জন-প্রিয় হইয়াছিল যে, রতি-শাস্ত্র বা যৌন-শাস্ত্র অবশেষে কেবলমাত্র কোক শাস্ত্র নামেই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষায় রতি-শাস্ত্র-বিষয়ক শেষ পুস্তক কল্যাণমল্ল নামক এক

কল্যাণমল্ল

পণ্ডিতের রচিত 'অনঙ্গ-রঙ্গ'। এই পুস্তকখানি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোদী পরিবারের কোনও এক রাজার আদেশে পণ্ডিত কল্যাণমল্ল কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ঋষি নাগার্জ্জুন তাঁহার প্রিয় শিষ্য তুণ্ডিকে উপদেশ দিবার ছলে 'সিদ্ধবিনোদন' নামক এক রতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।

নাগার্জ্জুন

প্রাক্-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে আরও বহু যৌন-শাস্ত্রবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র বা অন্য কোনও প্রকার যন্ত্র না থাকায় ঐ সমস্ত পণ্ডিতের কোনও পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইহাতে দুইটী অশুভ ফলোদয় হইয়াছে। প্রথমতঃ ঐ সমস্ত পণ্ডিতের গবেষণার ফল হইতে আমরা বঞ্চিত রহিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত পণ্ডিতের নামে অর্থলোলুপ দায়িত্বজ্ঞানহীন পুস্তক-বিক্রেতাগণ কতকগুলি কুরুচিপূর্ণ, বীভৎস ও অশ্লীল পুস্তক দিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কোকা পণ্ডিতের নাম করা যাইতে পারে। অনেক যৌন-শাস্ত্রবিৎ কোকা পণ্ডিতের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। কোকা পণ্ডিত বলিয়া কেহ থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহার রচিত কোনও পুস্তক যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি কোকা পণ্ডিতের রচিত বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক যৌন-বিষয়ক পুস্তক 'গরম পিঠা'র মত বিক্রয় হইতেছে।

লুপ্ত যৌন-শাস্ত্র

গ্রীস যে-যুগে তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্য দেশ ছিল, সেই যুগে সে-দেশের সাহিত্যে যৌন-বিজ্ঞানও খুব প্রসারলাভ করিয়াছিল। প্ল্যাটো-অ্যারিষ্টটলের ন্যায় বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতগণ প্রকাশ্যভাবে ছাত্রগণকে যৌন-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। অ্যারিষ্টটল 'অভিজ্ঞ ধাত্রী' (Experienced Midwife) নামক মূল্যবান গ্রন্থরচনা

গ্রীস

করিয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটলের পূর্ব্বে হিপোক্রেটীসও এ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "স্ত্রীলোকের শারীরিক গঠন" "বন্ধ্যাত্ব" এবং "কৌমার্য্য" ইত্যাদি বিষয়ে রচনা আর এখন পাওয়া যাইতেছে না। 'ভেনাসের আকৃতি' বিষয়ক পুস্তকসমূহে রতি-প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রোম

রোমীয় সম্রাটগণ এ বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেজন্য মার্শাল (৪৩—১০৪২ খৃঃ), জুভেনাল (৬০—১৪০ খৃঃ), ক্যাটুলাস (৮৭—৫৪ খৃঃ পূঃ), টিবুলাস, পেট্রোনিয়াস প্রভৃতি বহু কবি ও পণ্ডিত কবিতায়, রস-রচনায় ও প্রবন্ধে যৌন-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন।

সেরাসিন

সেরাসিনীয় সভ্যতার আমলে যৌন-বিজ্ঞান অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সময় যৌন-শাস্ত্র বাস্তবিকই বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। মুসলিম চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎগণের এমন একখানা চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তক আরবী ও ফারসী ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহাতে অন্যান্য বিভাগের ন্যায় যৌন-বিভাগও স্থান না পাইয়াছে। ফলতঃ মুসলমান হাকিমগণ যৌন-বিভাগকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করিতেন। যৌন-ব্যাপারে মুসলমানদের কোরআন-হাদিসে বহু মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ থাকায় ঐ সমস্ত আয়াৎ ও হাদিসের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোরআন-হাদিসের তফসিরকারগণও বিস্তৃতভাবে যৌন-বিষয়সমূহের আলোচনা করিয়াছেন। হাকিম আবু আলী সিনা, জালালুদ্দীন সায়ুতী তাঁহাদের চিকিৎসা-বিষয়ক সমস্ত পুস্তকেই যৌন-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি, দার্শনিক ইমাম

গাজ্জালী তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ 'কিমিয়া-ই-সাদৎ" ও "এহিয়া-উল-উলুমে" যৌন বিষয়ে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ যোগ করিয়াছেন। ইসলামে বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, তালাক, স্ত্রীর সংখ্যা, স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কোরআন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় ঐ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদের বিশেষ কোনও স্বাধীনতা ছিল না। কাজেই কোরআন-নির্দ্দিষ্ট মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়াই মুসলমান পণ্ডিতগণ যৌন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইসলামে বৈরাগ্যের ব্যবস্থা না থাকায় স্বামী-স্ত্রীর যৌন-সম্বন্ধের উপর কোনও প্রকার অনাবশ্যক নিয়ম-শৃঙ্খলার আরোপ করা হয় নাই। মুসলমান বাদশাগণের অনেকেই বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত বহু-সংখ্যক উপপত্নী রাখিতেন। ইহাদের সকলের যৌন-বাসনা পূরণের জন্য স্বভাবতঃই বাদশাহ্‌গণকে অসাধারণ রতিশক্তি-সম্পন্ন হইতে হইত। সেজন্য বাদশার পারিবারিক চিকিৎসকগণকে অধিকাংশ সময় রতিশক্তি-বর্দ্ধক ও বীর্য্যস্তম্ভক ঔষধের আবিষ্কারে নিয়োজিত থাকিতে হইত। এই-ভাবে বাদশাগণের ব্যক্তিগত কাম-লালসাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা কল্যাণ-প্রদ দিক বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

সম্প্রতি কায়রো হইতে আরবী ভাষায় বহু যৌন-বিষয়ক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থই বিশেষ গবেষণার ফল। ইহার মধ্যে 'বৃদ্ধের পুনর্যৌবনপ্রাপ্তি' নামক গ্রন্থ পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফারসী হস্তলিখিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের আলোচনা করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে 'পরীক্ষিত ঔষধসংগ্রহ' (খোলাসাতোল মোজার্‌রেবাত) এবং 'কিমিয়ায়ে আশ্‌রাৎ' নামক গ্রন্থ দুইটীই আমাদের নিকট অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে রতিশক্তিবর্দ্ধক ও বাজীকরণ,

বীর্য্যস্তম্ভনের বহু মূল্যবান ঔষধের উল্লেখ আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার অনেকগুলির উল্লেখ করিলাম।

ভারতের মুসলমান সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু সাহিত্যে যৌন-বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রাচীন ভারতীয় ও আরবীয় পণ্ডিতগণের মতবাদের সংমিশ্রণ মাত্র। বিখ্যাত 'লজ্জতন্নেসা' গ্রন্থ তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

কিন্তু ভারতীয়, গ্রীক, রোমীয় ও সেরাসিনীয় সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তত্তদ্দেশীয় যৌন-বিজ্ঞান স্বভাবতঃই রতি-শাস্ত্রে পরিণত হইল।

অধঃপতন

জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির আর্থিক দারিদ্র্যের অবিচ্ছেদ্য সহচররূপে মানসিক দারিদ্র্যও আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত জাতির সাম্রাজ্য ও সভ্যতার মধ্যাহ্নে যে সব বিষয় উহাদের মধ্যে বিজ্ঞানরূপে, মানব-কল্যাণের হেতুরূপী সত্যানুরাগরূপে, স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের আন্তরিক সাধনারূপে অধীত ও আলোচিত হইত, সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা লোপ পাইয়া সেই বিজ্ঞান তাহাদের কাম-চর্চ্চা ও কামোদ্দীপনার উপাদান রতিশাস্ত্রে অবনত হইল। যে জটীল রহস্যপূর্ণ বিষয় তত্তৎকালের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের আলোচনা ও গবেষণার বিষয় ছিল, তাহা নিষ্কর্ম্মা, মদ্যাসক্ত, পাপাচারীদের গণিকালয়ের হাস্য-পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হইল। সুতরাং প্রাচ্য দেশের যৌন-গবেষণার ফল চিরস্থায়ী হইল না।

মধ্যযুগীয় ইউরোপ যৌন অনাচারের লীলাভূমি ছিল বটে, কিন্তু বাহিরে কৃত্রিম ধার্ম্মিকতার ভড়কটা ষোলআনা বজায় ছিল। কাজেই

সেই যুগে ইউরোপে যৌন-শাস্ত্রের শিক্ষা-গত আলোচনা হওয়া দূরের কথা, নারী-পুরুষের যৌন মিলনকে প্রকাশ্যভাবে শয়তানের কার্য্য বলিয়া নিন্দা না করিলে ভদ্র সমাজে স্থান পাইবার উপায় ছিল না। সমস্ত গীর্জ্জা ও মঠ বিবাহেতর যৌন-অনাচারের লীলাক্ষেত্র, এবং ধর্ম্ম-যাজক ও মঠাধ্যক্ষগণ ঐ অনাচারের নায়ক হইলেও তাঁহারা বাহিরে চিরকৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যের স্তুতিগানে শতমুখ ছিলেন। বিবাহকে তাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বল ও হতভাগ্য লোকের কাজ বলিয়া দয়া-পরবশ হইয়া ঐ কার্য্যে অনুমতি দিলেও পুত্রোৎপাদন ব্যতিরেকে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে যৌন মিলনকে তাঁহারা সকলে মিলিয়া সমস্বরে নিন্দা করিতেন। সুতরাং ঐ আবহাওয়ার মধ্যে যৌন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা হইবার কোনও উপায় ছিল না।

মধ্য যুগ

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সত্যানুসন্ধানে ও প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিষ্ঠা ও সঙ্কল্প সাধনে তাঁহাদের চিত্তের দৃঢ়তা আজ সর্ব্বজন-বিদিত। এই সাধনায় কত সত্যদর্শীকে কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামীর যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হইয়াছে, তাহাও আজ কাহারও অবিদিত নাই। পাশ্চাত্য, বিশেষতঃ ইউরোপীয়, বৈজ্ঞানিকদের চিত্তের এই দৃঢ়তা, সত্যের জন্য তাঁহাদের এই আত্মত্যাগ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিদ্রোহ অন্যান্য বহু বিজ্ঞান-শাখার ন্যায় যৌন-বিজ্ঞানকেও কুসংস্কারমুক্ত করিয়া জ্ঞানালোকের রাজপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার ফলে জার্ম্মানীর

আধুনিক ইউরোপ

বেবেল, ইটালীর মণ্টিগাজা, ফ্রান্সের লামার্টাইন ও মপাঁসা, সুইজার-ল্যাণ্ডের ফোরেল, ভিয়েনার ফ্রয়েড এবং ইংলণ্ডের মার্শাল ও মেরী ষ্টোপস্, ডেনভারের বিচারপতি লিণ্ডসে প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক-গণ যৌন-শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের একটি অতি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় শাখারূপে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে হ্যাভ্‌লক এলিসের নাম মনোবিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞানের দিক হইতে যৌন-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম গবেষণার জন্য বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের শিক্ষা ও প্রচারের ফলে ঐ সমস্ত দেশে আজ শত সহস্র বৈজ্ঞানিক সমাজ-কল্যাণের দৃষ্টি-কোণ্ হইতে যৌন-বিষয়ক গবেষণা করিবার জন্য এবং উহাকে শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম উপায়ে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য শত শত গবেষণাগার স্থাপন করতঃ উহাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে সাধনায় সমাহিত হইয়াছেন। মানুষ যদি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া থাকে, তবে এই শ্রেষ্ঠ জীবের সৃষ্টি-রহস্যই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম রহস্য। মানবের সাধনাকে যদি কোথাও জয়যুক্ত হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে এই রহস্যোদ্ঘাটনে। বস্তুতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কাছে—শুধু বৈজ্ঞানিকের কাছে নয়, নিতান্ত সাধারণ মানুষের কাছেও—ইহা একটা পরম বিস্ময়ের বিষয় যে মানুষ এতবড় প্রয়োজনীয় এবং মানব-জাতির জীবন্মৃত্যু ও কল্যাণ-অকল্যাণ-সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি এতকাল এমন নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ উপেক্ষা করিল কেমন করিয়া!

ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষও এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা যাহা-কিছু ইউরোপের তাহাই

নিঃসন্দেহে গৃহীতব্য মনে করেন ; আবার আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা যাহা-কিছু ইউরোপীয় তাহাই বর্জ্জনীয় মনে করিয়া থাকেন ; বলা বাহুল্য, এই দুই দলের কোনও দলই যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য দেখাইবার সুযোগ পাইবেন না। কারণ যৌন-বিজ্ঞান ফ্যাশানের বস্তু নয়, ইহা মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সত্যিকার বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বহু প্রকারের। কিন্তু যৌন-বিজ্ঞান জীবন-বিজ্ঞান। জীবনের সঙ্গে আর কোনও বিজ্ঞান-শাখার বোধ হয় এমন প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। এই প্রত্যক্ষতা ও ঘনিষ্টতার হিসাবে অত প্রয়োজনীয় যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, যৌন-বিজ্ঞানের তুলনায় তাহাও পরোক্ষ ও অ-ঘনিষ্ঠ প্রতীয়মান হইবে। কারণ, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি মানুষের কৃত্রিম অবস্থা—তাহার রোগ ; আর যৌন-বিজ্ঞানের ভিত্তি মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সত্য অবস্থা—তাহার সৃষ্টি।

আধুনিক ভারত

তথাপি সমস্ত শিক্ষা-মন্দিরে যৌন-তত্ত্ব অসঙ্গত অনাদর ও অবহেলা পাইয়া আসিয়াছে। কলেজের ছাত্ররা মনোবিজ্ঞানে অহরহ কত illusion এবং hallucination এর তত্ত্বকথা মুখস্থ করিতেছে। কিন্তু যৌন-বোধের মত অমন কঠোর মানসিক সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাদের অতবড় বিরাট মনোবিজ্ঞানের কিতাবের কোনও পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনোবিজ্ঞানের বিরাট বিরাট গ্রন্থের ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষপৃষ্ঠা পর্য্যন্ত গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে পাঠকের মনে হইবে, যৌন-বোধ মানব-মনের কোনও অংশ ত নহেই, উপরন্তু স্মৃতির আয়ত্ত কোনও যুগেও মানুষের মনে যৌন-বোধ ছিল না। অথচ ঐ সমস্ত

যৌন-তত্ত্বে অবহেলা

গ্রন্থ-লেখক মনোবৈজ্ঞানিকগণ ভাল করিয়াই জানেন যে, যৌন-মনোবৃত্তি মানুষের তীব্রতম মনোবৃত্তি। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা সত্য, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই সত্য। উন্নত ধরণের সমস্ত চিকিৎসা-গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াও পাঠক যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও উপদেশ পাইতেছে না। পৃথিবীর ওজন কত লক্ষ টন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কত লক্ষ মাইল, খৃষ্টপূর্ব্ব কত শতাব্দীতে কোন্ রাজা কোন্ জঙ্গলে কত বড় প্রাসাদনির্ম্মাণে কত টাকা খরচ করিয়াছিলেন, প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের অপ্রয়োজনীয় শত কথা আমাদের শিক্ষার্থিগণকে মুখস্থ করাইয়া তাহাদের মস্তিষ্ক ও স্মৃতি-শক্তিকে পীড়িত করা হইতেছে, কিন্তু হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, বেশ্যাগমন ও মদ্যপানের ভীষণ অপকারিতার হাত হইতে বালক ও যুবকগণকে রক্ষা করিয়া, অনিয়মিত জন্মের অন্ধ প্রকৃতির হাত হইতে পিতামাতাকে রক্ষা করিয়া যৌন-জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিয়মিত করিবার কোনও চেষ্টা বা গবেষণা হইতেছে না।

এ উপেক্ষা ও অবহেলা আমাদের সামাজিক জীবনে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কি আমরা বুঝিতেছি না?

অবহেলার কুফল

প্রকৃতি স্রষ্টার নিয়মের অধীন। স্রষ্টা স্বয়ং সে নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। যাহারা স্রষ্টার সে নিয়ম লঙ্ঘন করে, প্রকৃতি তাহাদের উপর ভীষণ প্রতিশোধ লইয়া থাকে। স্রষ্টা আমাদিগকে যে জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দান করিয়াছেন, যে ক্ষেত্রে আমরা তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া স্রষ্টার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অমান্য করিব, প্রকৃতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে সেখানে আমাদের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। যৌন ব্যাপার প্রকৃতির একটা বিরাট রহস্য। এ রহস্যোদ্ঘাটনে

প্রকৃতির দান জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আমরা নিয়োজিত না করায় আমাদের ধর্ম্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের সমাজ-দেহের সর্ব্বত্র অগণিত বিষ-ফোঁড়া দেখা দিয়াছে। মানুষের জননেন্দ্রিয় তাহার রসনার ন্যায়ই দুইটী বিপরীত গুণের অধিকারী। মানুষের এই দুইটী প্রত্যঙ্গই চরম শুভ ও চরম অশুভ কার্য্যসাধনে সক্ষম। রসনা সম্বন্ধে আমরা যে বৈজ্ঞানিক সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি, জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাহা করি নাই। তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে।

যেখানে রহস্য, সেখানেই ঐশীশক্তি আরোপ করা মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তি। যৌনক্রিয়া সাধারণ ব্যাপার হইলেও মানব-সৃষ্টি একটা রহস্য-পূর্ণ ঘটনা। সুতরাং যৌন-ব্যাপারে মানুষের সাধারণ অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক ভণ্ড তপস্বী ধর্ম্মের নামে যৌন-স্বৈরাচার সাধন করিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-মন্দিরে ধর্ম্মের নামে যে বেশ্যাবৃত্তি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, ইহাদ্বারা বুদ্ধিমান ভণ্ডেরা যে শুধু নিজেদের কাম-লালসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে তাহা নহে, সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম-ধারণাকে নিতান্ত নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত দগ্ধ করা বা জীবন্ত সমাহিত করা, কন্যাকে হত্যা করা, ঈশ্বরকে দেহদানের নামে ধর্ম্ম-যাজক বা মঠাধিকারীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া, সন্তানলাভের আশায় মন্দির-বিশেষে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়া, স্বামীর পদতলে স্বর্গের অবস্থিতিহেতু পুরুষের সহস্র অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ইত্যাদি সহস্র যৌন-অনাচার ধর্ম্মের নামে চলিয়াছে। ইহাতে যে নারীজাতির উপরই কেবল পুরুষের অবিচার সাধিত হইয়াছে

ধর্ম্মে

তাহা নহে, ইহাতে পুরুষেরও অনেকখানি আত্মিক অবনতি ঘটিয়াছে। যে সত্য জানিবার ও বুঝিবার অধিকার স্রষ্টা সকল মানুষকে দিয়াছেন, সেই সত্যকে প্রহেলিকার আবরণে গোপন রাখার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমানেরা জন-সাধারণকে যে-ভাবে-ইচ্ছা প্রবঞ্চিত করিয়াছে। জন-সাধারণের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা মানব-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপাদানটীর অসদ্ব্যবহার করিয়া জগতের ভূয়সী অকল্যাণ করিয়াছে।

ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে নীতিজ্ঞান, যৌন-অজ্ঞতা সেই নীতিজ্ঞানকেও পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই। মানুষের তীব্রতম অনুভূতিকে একটা কৃত্রিম আবরণের চাপে পিষ্ট করিয়া রাখায় মানুষ সমাজের বহিরাবরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ভণ্ডামী আয়ত্ত করিয়াছে।

নীতিতে

সভা-সমিতিতে দাঁড়াইয়া মানুষ অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যে কাজটীর তীব্র নিন্দা করিতে পারে, মুহূর্ত্তেক পরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সেই কাজটীই সাধন করিতে তাহার বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধে না। সাহিত্য-ও সমাজ-জীবনের সর্ব্বত্র একটা কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামীর আবহাওয়া বিরাজমান। সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের মূলভিত্তি যে সত্যবাদিতা, সরলতা, সততা ও স্পষ্টবাদিতা, মানব-চরিত্রের সেই মহৎ গুণসমূহ আজ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, যৌন-জীবনের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামীই মানবের কর্ম্ম-জীবনের সকল স্তরে সংক্রমিত হইয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনে ভণ্ডামী ও মিথ্যাবাদিতার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, যে বলে যে সে জীবনে মিথ্যাকথা বলে নাই, সে যেমন ভণ্ড, তেমনি যে বলে, সে জীবনে ভণ্ডামী করে নাই, সে তেমনি মিথ্যাবাদী।

সমাজ-জীবনে এই অজ্ঞতার কুফল আরও শোচনীয় আকারে দেখা দিয়াছে। দাম্পত্য-অশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ, ব্যভিচার, বলাৎকার, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি, মদ্যপান পর্য্যন্ত সমাজ-অঙ্গের সহস্র প্রকারের দুঃসাধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির নিদান এই যৌন-অজ্ঞতা।

সমাজে

রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতার কুফল বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও মারাত্মক হইয়াছে। যৌন-অজ্ঞতার ফলে সিফিলিস, গণোরিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি জঘন্য ব্যাধিতে সমাজ-দেহ জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে। বিরাট মানব-জাতির একটা বিপুল অংশ আজ ঐ সমস্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নিজেরা ত পঙ্গু হইয়া আছেই, উপরন্তু সমস্ত রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করিয়া অহরহ ঐ সমস্ত ব্যাধি বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত যৌন-ব্যাধি মানুষের শক্তি ও আয়ুর উপর ভীষণভাবে ক্রিয়া করিতেছে। তরুণদের মধ্যে শতকরা একজনও পাওয়া যাইবে না যে হস্তমৈথুন অথবা পুংমৈথুনে অভ্যস্ত হয় নাই। ইহার ফলে মানব-সমাজের এই ভাবী পিতৃমাতৃগণের সকলেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত। এই সমস্ত স্বাস্থ্যহীন ও ব্যাধিগ্রস্ত ছেলে-মেয়ে ভবিষ্যতে যে সমস্ত সন্তানের জন্মদান করে, তাহারা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, অল্পায়ু ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের শিশু-মৃত্যুর ভয়াবহ গড়-পড়তার কারণও ইহাই। সুতরাং যৌন-ব্যাধির ফলে মানব-সমাজের যে বিরাট অংশ আজ নানাবিধ জঘন্য ও শক্তি-নাশক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জগতকে নিরানন্দ ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতেছে, তাহাদের জীবন মানব-কল্যাণকামী সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে জটীল সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহারা সাধারণ-

রাষ্ট্রে

ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জনন-নিরোধের কার্য্যক্রম লইয়া গবেষণা করিতেছেন। এই সমস্ত গবেষণার ফল জন-সমাজে প্রচার না হওয়া পর্য্যন্ত মানব-জাতির কল্যাণ হইবে না।

আমরা উপরে যৌন-অজ্ঞতার কুফলের কথা খুব জোর গলায় বলিলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌন-শিক্ষা বিস্তারের কথা ততটা জোর গলায় বলিতে পারিতেছি না। কারণ যৌন-তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে আলোচনা করিবার পক্ষে যতখানি বিপদ আছে, অন্যান্য শিক্ষণীয় ব্যাপারের মত ইহার শিক্ষাদান কার্য্যে তদপেক্ষা অধিক বিপদ আছে। যৌন-বৃত্তি মানবের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বৃত্তি একথা বলিয়াছি। কিন্তু ঐ সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, এই বৃত্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত সাধারণ বৃত্তিও বটে। শিশু-সমাজকে বাদ দিলে এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত মানুষেরই কোনও-না-কোন প্রকারের যৌন অভিজ্ঞতাও আছে। সুতরাং যৌন-তত্ত্বের আলোচনা হইতে যৌন-বোধকে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব। মানুষের এই সাধারণ দুর্ব্বলতার সুযোগগ্রহণ করিয়া সমস্ত সভ্যজাতির সাহিত্যে যৌনশাস্ত্রের নামে এবং বেনামীতে যে বিষাক্ত রাবিশের স্তুপ সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারিতেছি না। যৌন-বিষয়ক পুস্তকাদির উপর আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহের শ্যেনদৃষ্টি দর্শন করিয়া অনেক সরলপ্রাণ যৌন-তাত্ত্বিক দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ফরাসী যৌন-তাত্ত্বিক ডাঃ মাইকেল ডি মণ্টেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা কিরূপে সম্ভব হইতেছে যে, যৌনক্রিয়ার মত স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য সম্বন্ধে কথা বলিতে আমরা লজ্জাবোধ করি এবং ঐ সম্বন্ধে

যৌন-শিক্ষার বিপদ

আমরা গম্ভীরভাবে ও যুক্তি-সঙ্গতরূপে আলোচনা করিতে পারি না? আমরা নরহত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু যৌন-ব্যাপারের ন্যায় স্বাভাবিক্ কার্য্য সম্বন্ধে সচ্ছন্দে কথা বলিতে পারি না।"

কিন্তু এই না পারার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই? আমরা কি যৌন-বোধ-নিরপেক্ষভাবে যৌন-ব্যাপার আলোচনা করিতে পারি? আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে যৌন-তত্ত্বের নামে যে সমস্ত পুস্তক স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহাদের শতকরা আশিটাই কি রতি-তত্ত্ব নহে? জনহিত ও সমাজ-কল্যাণের সদুদ্দেশ্য হইতেই কি ঐ সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে? তাহা নহে। মানুষের স্বাভাবিক যৌন-ক্ষুধায় ইন্ধন যোগাইবার অসদুদ্দেশ্যেই এই সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত রতি-শাস্ত্রের আক্রমণ হইতে অজ্ঞ জন-সাধারণকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য।

শাসনের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু রাষ্ট্র স্বভাবতঃই কলা ও বীভৎসতার সূক্ষ্ম ও নির্ভুল বিচারক নহে। কাজেই আইন-সম্মার্জ্জনীর মুখে বীভৎসতার আগাছার সঙ্গে বহু শিল্প-নিদর্শনও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং ইহা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। শিল্পকে যেমন বীভৎসতা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে, তেমনই যৌন-বিজ্ঞানকে রতি-শাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া বিচার করিতে হইবে। বিষয় খুব জটীল, সন্দেহ নাই, কিন্তু মানব-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে তাহার দায়িত্ব পূরণ ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই হইবে। সুতরাং যৌন-বিজ্ঞান আলোচনা বহু ক্ষেত্রে রতি-পরিহাসে পরিণত হইবার

শাসনের জটীলতা

সম্ভাবনা থাকিলেও বৃহত্তর অমঙ্গলের প্রতিরোধের জন্য এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে দিতে হইবে।

প্রথম কারণ, বহু যৌন-বৈজ্ঞানিকের দৃঢ় মত এই যে, যৌন-গোপনতা অপেক্ষা যৌন-স্পষ্টতা আমাদের ঢের বেশী কল্যাণ সাধন করিবে। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের কাছেও কথাটী যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবে। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যৌন-ব্যাপারে কানাকানি করিয়াই আমরা মানুষের এতসব অকল্যাণ করিয়াছি। আমরা যদি এসব ব্যাপারে অস্পষ্ট, অর্দ্ধ-স্পষ্ট, দ্ব্যর্থক, ছদ্মার্থক শব্দ ব্যবহার না করিয়া আন্তরিকতা, সরলতা ও স্পষ্টবাদিতাসহকারে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতাম এবং সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ালোচনার মতই ইহাকে সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবে এ ব্যাপারে কৃত্রিম লজ্জা ও সাধিত ভণ্ডামী আমাদের কথা ও কার্য্যকে অমন অর্থহীন ও সন্দেহাত্মক করিয়া তুলিতে পারিত না। "ভালর কাছে সব ভাল" বলিয়া আমাদের দেশে যে প্রাচীন কথাটী প্রচলিত আছে, ইহা নিতান্ত ফাঁকা কথা নহে।

গোপনতা ও স্পষ্টতা

অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় যৌন-ব্যাপারের আলোচনা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সচ্ছন্দভাবে করিতে হইবে। দৃঢ় সবল চিত্তে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা না থাকিলে কেহ প্রকাশ্যভাবে এসব ব্যাপারে সচ্ছন্দভাবে কথা বলিতে পারিবে না, আশা করি, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। বলিবার ভঙ্গিতেই যত পার্থক্য। এক জনের মুখে যাহা পরম শ্লীল ও কলাপূর্ণ,

সরলতার উপকারিতা

অপরের মুখে তাহাই অশ্লীল ও বীভৎস। আবার যাহার মনে পবিত্রতা নাই, সে নির্লিপ্তভাবে এ বিষয়ে কোনও কথা বলিতে পারিবে না। আন্তরিকতাপূর্ণ সরল চিত্তের সুস্পষ্ট প্রকাশ যৌন-তত্ত্বের যত বড় নিগূঢ় কথাই বহন করুক না কেন, শ্রোতার মনে উহা কদাচ রতি-বাসনার উদ্রেক করিবে না। বক্তার আন্তরিকতা শ্রোতার প্রাণের বীভৎস-রসের সম্ভাবনাকে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া উহাকে নিরস্ত করিয়া দিবে।

পক্ষান্তরে আমাদের কানাকানি, আমাদের গোপনতা, আমাদের অস্পষ্ট ভাষা, সর্ব্বোপরি আমাদের আন্তরিকতাহীন কৃত্রিম ও দুর্ব্বল শাসন তরুণ ও জিজ্ঞাসু প্রাণে একটা সন্দেহের ছায়াপাত করিতেছে এবং তরুণ প্রাণের স্বাভাবিক কল্পনা-প্রিয়তা সেই সন্দেহের কঙ্কালকে অভিনব কাল্পনিক রূপের রক্ত-মাংসে সজীব করিয়া তুলিতেছে। সকলেই একদিন তরুণ ছিলেন; তারুণ্যের স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকলেই একবার নিজের নিজের তদানীন্তন মনোভাবটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন, তরুণ মনের সে কাল্পনিক মূর্ত্তি লোভনীয়তায় ও আকর্ষণীয়তায় বাস্তবকে অনেক ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই জানেন, পাপের বাস্তব রূপ অপেক্ষা তাহার কাল্পনিক রূপ অনেক বেশী লোভনীয় এবং ইহাও সকলে জানেন যে, "বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ" অনেক বেশী মারাত্মক।

গোপনতার কুফল

দ্বিতীয় কারণ, আইন ও সামাজিক দমন-নীতির দ্বারা অশ্লীল শিল্প ও সাহিত্যকে নির্ম্মূল করা অসম্ভব। দমন-নীতির উদ্দেশ্য ত তাহাতে সফল

হইবেই না, বরঞ্চ আইন ও সমাজকে ফাঁকি দিয়া উহা অধিকতর বীভৎস হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। "নিষিদ্ধ ফলের" প্রতি মানুষের স্বাভাবিক লোভ উহার মূল্য এবং বিক্রয় অসম্ভব ও আশাতীতরূপে বাড়াইয়া দিবে মাত্র। অশ্লীলতা দূরীকরণের অতি-উৎসাহী প্রবক্তাগণের অসহিষ্ণুতা আমাদের উদ্দেশ্যের সাফল্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। শ্লীলতাবাদিগণ বোধ হয় মনে করেন, অশ্লীল আর্ট ও সাহিত্য শয়তানের সৃষ্টি, ঐ সমস্ত আর্ট ও সাহিত্যকে অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিলেই স্বয়ং শয়তানকে ভস্মীভূত করা হইল। রতি-সাহিত্যকে মানুষের যৌন-ক্ষুধার জন্য দায়ী করা, দুনিয়ার রোগ বৃদ্ধির জন্য ডাক্তারের আধিক্যকে, অপরাধ বৃদ্ধির জন্য আদালত ও উকিলের আধিক্যকে এবং মানুষের বার্দ্ধক্যের জন্য ঘড়ীর আধিক্যকে দায়ী করার মতই ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। ফলতঃ কেবল অশ্লীল আর্টিষ্ট ও সাহিত্যিককে জেলে পূরিয়া বা অশ্লীল আর্ট ও সাহিত্যকে অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিয়া দেশ হইতে অশ্লীলতা দূর করা সম্ভব হইবে না। সে উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে মূলে সংস্কার করিতে হইবে, অশ্লীল আর্ট ও সাহিত্য যে অগ্নির ইন্ধনমাত্র সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হইবে। সমাজের ভ্রূকুটি বা পুলিশের লাঠির সাহায্যে চারিদিকে 'চুপ্ চুপ্' চীৎকার করিয়া মানুষের প্রকৃতিকে দমন করা সম্ভব হইবে না। সুশিক্ষার দ্বারা যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের মনকে শুদ্ধ, প্রবুদ্ধ ও নির্ম্মল করিতে হইবে। যৌন-ব্যাপারের প্রতি কুটীল ও বক্র দৃষ্টিপাতের পরিবর্ত্তে সোজা সরল দৃষ্টিপাত করিবার মত মানসিক সবলতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। যে সমস্ত জাতির মধ্যে নারীর জন্য অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে, সেই

শাসনের ব্যর্থতা

সমস্ত জাতির পুরুষরা নারীর মুখের দিকে সহজ সরল দৃষ্টি দিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের বক্রদৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য সহচর কাম-লালসা। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নারীর অবরোধপ্রথা নাই, সে জাতির পুরুষরা সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নির্লিপ্তভাবে শুধু পরস্ত্রীর মুখে দৃষ্টিপাত করা নয়, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে এবং তাহাদের গাত্রস্পর্শ করিতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপার স্বতঃই শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যৌন-ব্যাপারেও তাহাই। মানুষ যদি আশৈশব এই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় যে, যৌন-ব্যাপার তাহার অন্যান্য দৈহিক ব্যাপারের মতই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, তবে ও-সম্বন্ধে তাহাদের অহেতুক সঙ্কোচ থাকিবার কোনও কারণ ঘটিবে না। অধ্যাপক মিচেল্‌স্ সত্যই বলিয়াছেন—**The safest foundation for the treatment of sexual matters is to be found in a rational way of thinking and feeling. In a nation which regards the sexual impulse as natural and truly human there will be less tendency to misuse that impulse.**

বিরুদ্ধ মতবাদ

কিন্তু আশৈশব শিক্ষাদ্বারা যৌন-শিক্ষাকে সহজ ও যৌন-ব্যাপারকে সচ্ছন্দ করিয়া তোলার পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রহিয়াছে; কারণ শিশুকে যৌন-শিক্ষা দিবার চেষ্টা আগুন লইয়া খেলা করা মাত্র। জার্ম্মাণ চিকিৎসাবিৎ ডাঃ হান্‌স্ ডানবার্গ বলিয়াছেন—"শিশুকে মিষ্টান্নের দোকানে বসাইয়া রাখিয়াও তাহাকে মিষ্টান্ন না দেওয়া যেরূপ বিপজ্জনক, তাহাকে যৌন-তত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টাও সেইরূপ বিপজ্জনক। লোভনীয় বস্তুকে শিশুর দৃষ্টিপথের

অন্তরালে রাখাই নিরাপদ। অজ্ঞতা-জনিত ভীরুতা মানুষকে অনেক অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।"

ডাঃ ডানবার্গের এই কথা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। পক্ষান্তরে ডাঃ ক্যাথারিন ডেভিস গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সুখী দম্পতিসমূহের শতকরা সাতান্ন জনই শৈশবে যৌন-ব্যাপারে উপদেশ লাভ করিয়াছিল। ডাঃ হ্যামিল্টনের গবেষণার ফল এই যে, তাহাদের শতকরা পয়ষট্টি জনই শৈশবে যৌন-বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিল।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও আমাদের সাধারণ জ্ঞান-লভ্য একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। যৌন-ব্যাপারটা

প্রকৃতির শিক্ষা

আমরা শিশুদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে পারি না। গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীসমূহ শিশুদের সম্মুখেই অহরহ যৌনক্রিয়া করিতেছে এবং তাহার ফলে প্রসব-ক্রিয়াও শিশুদের চক্ষের সম্মুখেই হইতেছে। শিশুদের দৃষ্টিপথ হইতে এই সমস্ত পশু-পক্ষীর যৌন-সম্বন্ধ গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত শিশুদের মধ্যে অতি অল্পবয়সেই লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। যৌন-প্রদেশে তাহারা সময়ে সময়ে যে একটা অভিনব অনুভূতি বোধ করিয়া থাকে, ইহাও সত্য কথা। সুতরাং স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যৌন-ব্যাপারটা শিশু-মন হইতে গোপন রাখা প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যৌন-ব্যাপার যদি শিশুদের নিকট প্রকাশিত হইয়াই পড়ে, তবে ঐ সম্বন্ধে সরলভাবে সুশিক্ষা দিয়া শিশুদিগকে সত্য ও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে দেওয়াই উচিৎ, না, ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া

শিশুগণকে নিজ নিজ বুদ্ধি-ও কল্পনা-শক্তি-প্রসূত সিদ্ধান্ত করিতে দেওয়া উচিৎ? কোন্‌টা মানব-কল্যাণের মাপকাঠিতে অধিকতর গ্রহণীয়? পিতামাতা গুরুজন যদি এই সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া যান, যদি শিশুর সরল প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে ধমকাইয়া দেন, তবে হয় শিশুকে নিজের কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, নয়, নিজের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সঙ্গীর নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর নিকট হইতে কোমল-মতি বালক-বালিকাগণ এসব ব্যাপারে যে বিকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, পুংমৈথুন, হস্তমৈথুন, সমমৈথুন, পশুমৈথুন ও বেশ্যাগমন প্রভৃতি সর্ব্বনাশী কদর্য্য অভ্যাস সেই বিকৃত শিক্ষার বিষময় ফল।

গোপনতার অসম্ভাব্যতা

নীরবতা ও অশিক্ষার এই বিষময় ফলের সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলসমূহ যোগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শিশুগণকে যৌনশিক্ষা দান করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে ডাঃ ডানবার্গের সতর্কবাণীও বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। শিশুগণকে যৌন ব্যাপারে শিক্ষাদান করিতে গেলে তাহাদের দৃষ্টি ও মন যৌন-ব্যাপারের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় নিবদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে সুফলের চেয়ে কুফল হইবে অনেক বেশী। সুতরাং এইখানে উভয়সঙ্কট।

কিংকর্ত্তব্য

প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিশুদের নিকট যখন যৌন-ব্যাপার গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই, তখন শিশুগণকে যৌন-ব্যাপারে শিক্ষাদান করিব কি না, প্রশ্ন তাহা নহে; প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কিভাবে শিশুগণকে যৌন-শিক্ষা দান করিলে

প্রশ্ন কি?

তাহাদিগকে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর হাত হইতে রক্ষা করা যায় এবং যৌন-ব্যাপারের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় মনোযোগী হইয়া তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া না বসে।

এই উভয় মাপকাঠিকে সীমারেখা নির্দ্ধারণ করিয়া যৌন-শিক্ষা দান করা সম্ভব কি না ডাঃ ফোরেল, ডাঃ এলিস ও অধ্যাপক মিচেল্‌স্ এ-বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কেবলমাত্র মাতা এবং স্থানবিশেষে পিতা ও মাতা উভয়েই শিশুর যৌন-শিক্ষক হইতে পারেন, অন্য কেহ নহে। ম্যাডাম স্মিথ জেগার নাম্নী বহু-সন্তানের-মা ও আদর্শ গৃহিণী একজন ফরাসী মহিলা তদীয় L' education sociale de no filles নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন—"যদি আমরা আমাদের সন্তানগণকে যৌন-বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিতে চাই, যদি তাহাদিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর, বাড়ীর চাকর-চাকরাণী ও অশ্লীল পুস্তকাদির কবল হইতে রক্ষা করিতে চাই, তবে দুর্ব্বোধ্য নীতিকথা বলিয়া বা কৃত্রিম লজ্জা দেখাইয়া সে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সন্তানগণকে স্নেহ ও সরলতার দ্বারা সহজভাবে সত্যের সম্মুখীন করিতে হইবে। বালকের বেলা পিতা বা শিক্ষক এবং বালিকার বেলা মাতা বা শিক্ষয়িত্রীই যৌন-ব্যাপারে উপযুক্ত উপদেষ্টা।"

যোগ্য শিক্ষক

শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে ফ্রয়েড, ফোরেল, মিচেল্‌স্ ও এলিস সকলেই মোটামুটি একমত। প্রকৃতিই শিশুগণকে শিক্ষা দিবে, শিক্ষকের কর্ত্তব্য-হইবে শুধু সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা করা। প্রকৃতি শিশুর মনে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করিয়া দিবে; শিশু সরলভাবে

শিক্ষা-প্রণালী

পিতৃমাতার কাছে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর চাহিবে। পিতামাতা যদি স্নেহভরে শিশুর বয়সোপযোগী সরলভাবে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেন, তবেই তাঁহাদের উপদেষ্টার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল। ডাঃ ডানবার্গ শিশুকে যৌন-শিক্ষা দিবার নামে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যৌন-শিক্ষা অর্থে তিনি সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মতই যৌন-ব্যাপারকেও কতকগুলি পাঠে বিভক্ত করিয়া শিশুগণকে ধারাবাহিকভাবে সেই পাঠ দেওয়া হইবে। কিন্তু সে ভাবে যৌন-শিক্ষা দিবার কথা কেহ বলে না। যৌন-শিক্ষার অর্থ হইতেছে, শিশুদের স্বাভাবিক কৌতুহলের সত্য সরল উত্তর দেওয়া। প্রকৃতি যতদিন যে শিশুর মধ্যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা জাগ্রত না করিবে, ততদিন সেই শিশুকে সেই বিষয়ে কোনও শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃতির দ্বারা জাগ্রত কোনও কৌতুহলকে দমনও করিতে নাই। শিশুর সরল প্রশ্নের উত্তরে এমন সরলভাবে ব্যাপারটী বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তাহার মন একদিকে যেমন যৌন-ব্যাপারের সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকে নিবদ্ধ হইবে না, পক্ষান্তরে তেমনি তাহার শিশু-মনের উপযোগী নিবৃত্তি লাভ করিবে। যে উত্তর শিশুকে দেওয়া হইবে, তাহা যেন কুসংস্কারস্রষ্টা কোনও মিথ্যা স্তোকবাক্য না হয়। মনে রাখা উচিত যে, মিথ্যা কথা শিশুর কাছে ধরা পড়িয়াই যাইবে। কারণ শিশুকে সত্য কথা শিক্ষা দিবার জন্য প্রকৃতি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। পিতামাতা যদি সে সত্য গোপন করিবার জন্য শিশুকে কোনও ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেন, তবে শিশু পিতামাতার সততায় বিশ্বাস হারাইবে। পিতামাতার প্রতি এই আস্থাহীনতা শুধু যৌন-ব্যাপারে নহে, সাংসারিক আরও বহু ব্যাপারে শিশুর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের

কারণ হইবে। যৌন-ব্যাপারে কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াও পিতামাতা শিশুর কল্যাণের চেয়ে ঢের বেশী অকল্যাণ করিবেন। মোটকথা, শিশু-মনে শৈশব হইতেই যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে এমন ধারণা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে শিশু এই ব্যাপারকে অতি সরলভাবে গ্রহণ ও সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সমস্তই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। পিতা-মাতার শিক্ষা-গুণে এমন অনেক ছেলেমেয়ে দেখা যায় যাহাদিগকে সকালে পিতা অথবা মাতা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সকালে পায়খানা কেমন হইয়াছে এবং তাহারা অম্লানবদনে বাহ্যে শক্ত কি নরম, কি রং ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছে। পক্ষান্তরে এমন ছেলেমেয়েও দেখা যায়, যাহারা কিছুতেই মলমূত্র সম্বন্ধে কোন উত্তর দেয় না; লজ্জায় মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে মলমূত্র সম্বন্ধে এই সহজ স্বাভাবিক সরলতা যৌবনে যৌন-ব্যাপারে সরলতায় পরিণত হইতে পারে। মলমূত্র সম্বন্ধে সরলতা যদি সম্ভব হয়, তবে ঋতুস্রাব ও শুক্রস্রাব সম্বন্ধেই বা সরলতা সম্ভব হইবে না কেন?

কিন্তু আমাদের দেশে মুশ্‌কিল হইবে পিতামাতাকে লইয়া। আমাদের দেশের পিতামাতা যে শিক্ষা ও সংস্কার লইয়া বড় হইয়াছেন, তাহাতে নিজেদের যৌবন-প্রাপ্ত সন্তানের ঋতুস্রাব বা শুক্রস্রাব সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করা ত দূরের কথা, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের শিশু সন্তানকেও এ বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায়, এই সমস্ত ব্যাপারে আমাদের বর্তমান মতবাদ ও ধারণায় যৌবন-প্রাপ্ত সন্তানদিগকে যৌন-ব্যাপারে কোনও কথা বলা পিতামাতার পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব।

শিক্ষকের অভাব

পক্ষান্তরে শিক্ষার দিক হইতেও শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার অনেক বিপদ আছে। শৈশব হইতে বিষয়ের পর বিষয়, সত্যের পর সত্য ক্রমে যদি শিশু-মনে বিকাশ লাভ না করে, যৌন-ব্যাপারের প্রাকৃতিক রহস্য যদি ধীরে ধীরে ক্রমে-ক্রমে শিশু-মনের নিকট নিজেকে প্রকট না করে, তবে তার ফল বিষময় হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় শিশু-মন হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, অন্যথায় কুসংসর্গে বিকৃত ধারণায় ভ্রান্ত থাকে। এই উভয় অবস্থাতেই যৌবনাগমে সত্য বিকাশে তাহার মনের উপর একটা অবাঞ্ছনীয় বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। যৌন-সত্য লাভের এই আকস্মিকতা মানুষের বহু শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে।

শিক্ষায় ও শিক্ষকতায় ব্যক্তিত্ব

সুতরাং বালক-বালিকার যৌন-শিক্ষা শৈশবেই আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। যৌবনাগমে সেই শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর ও গভীরতর করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে ইহাপেক্ষা সুনির্দ্দিষ্ট কোনও প্রণালী নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। এ শিক্ষা স্বভাবতঃই শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসা ও শিক্ষকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু মোটের উপর একথা খুব দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষা-প্রণালী যতই ত্রুটীপূর্ণ হউক না কেন, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সরলতার দ্বারা দেওয়া হইলে সে শিক্ষা সর্ব্বত্রই গোপনতা অপেক্ষা সুফল প্রদান করিবে।

সুতরাং যৌন-ব্যাপারের সুন্দর ও সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর ভাবী মানব-সমাজের ধর্ম্মীয়, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ, এবং যৌন-শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের উপরই মানুষের অন্যান্য বহু সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। পক্ষান্তরে ইহার গুরুত্বের অনুপাতে ইহা জটীলও বটে।

এই জটীল প্রশ্নের মীমাংসা এক দিনেই হইয়া যাইবে, ইহা কেহ আশা করিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মাতৃ-ভাষার সাহিত্য-ভাণ্ডার অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেও এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটীর দিকে মাতৃভাষার কোনও সেবকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যে দুই একজন এ কাজে হাত দিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই সীমা-রেখা হইতে তাহা করিয়াছেন; বিষয়টীর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। এক শ্রেণীর লেখক যুবকদের যৌন-চাঞ্চল্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার মানসে কুরুচিপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত লেখা কোনও সাহিত্যসেবীর হইতে পারে না; কারণ মাতৃভাষার সেবা-বৃত্তিকে এমন জঘন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি কোনও সেবকের হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং উহা অন্যায়-লোভী পুস্তক-ব্যবসায়ীদেরই কার্য্য বলিয়া আমি ধরিয়া লইয়াছি। পুলিস ও আদালত এই শ্রেণীর পুস্তকের উপর নিতান্ত ন্যায়সঙ্গতরূপেই আক্রমণ চালাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অন্য এক শ্রেণীর পুস্তক আছে, যাহাতে লেখকগণ শালীনতা রক্ষা করিতে গিয়া যৌন-ব্যাপারে কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক বক্তৃতা করিয়াই কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন, প্রকৃত সমস্যাটীর সম্মুখীন হন নাই। এই দুই শ্রেণীর পুস্তক ছাড়া আর এক শ্রেণীর পুস্তক আছে, যাহা যৌন-শাস্ত্র নামেই চলিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা ধাত্রীবিদ্যার পুস্তক মাত্র। ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে আমাদের মনে হয় যে, লেখকগণ যৌন-বিজ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যার পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

প্রকৃত যৌনশাস্ত্রের অভাব

উপক্রমণিকা

ধাত্রীবিদ্যা আমাদের সমস্যা নয়; কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক শ্লীলতা দ্বারা সমস্যাটীকে ঢাকিয়া রাখাও প্রকৃত সমাধান নয়। আর যৌন-উত্তেজনা দিয়া তরুণদের চঞ্চল বৃত্তিকে আরও চঞ্চল করিয়া তোলা ত দস্তুরমত অপরাধ। সুতরাং আমাদের সাহিত্যে আন্তরিকতার সহিত যৌন-সমস্যার আলোচনার নিতান্তই অভাব, একথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বিষয়টীর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার আশুতাই আমাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আমি কোকা পণ্ডিত, ঋষি বাৎস্যায়ন, মহর্ষি সিদ্ধ নাগার্জ্জুন ও পণ্ডিত কল্যাণমল্ল প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রবিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব, পারস্য ও মিশর দেশীয় পণ্ডিতগণ এবং ডাঃ ফ্রয়েড, ডাঃ ফোরেল, এলিস, ক্রাফ্‌ট্ এবিং, ওয়েষ্টার মার্ক, ক্যাথারিন ডেভিস, মেরী ষ্টোপ্‌স্, অধ্যাপক মিচেল্‌স্ ডাঃ মার্শাল প্রভৃতি বহু আধুনিক যৌন-বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তা লইয়াছি। ধাত্রীবিদ্যা-বিভাগে আমি প্রধানতঃ ডাঃ জিলেট ও ম্যাডিলের মতবাদের উপর নির্ভর করিয়াছি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আমি ডাঃ ফিল্ডিং ও মিঃ ফাড্‌কের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু পাঠকের বিরক্তির ভয়ে আমি আমার পুস্তক উদ্ধৃতির দ্বারা কণ্টকিত করি নাই। উদ্ধৃত না করিলেও আমারা যেখানে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি, পরম সততার সহিত তাঁহার মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তক রচনায় আমাকে যে সমস্ত পুস্তক পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে আমি যথাস্থানে তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি। এইস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীকে আলোচনার

এই পুস্তকের উপকরণ

উপযোগী নির্ভরযোগ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টার ত্রুটী আমি করি নাই। এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য গত দশ বৎসর কাল আমি এ বিষয়ে আরবী ও ফারসী হস্তলিপি এবং সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাদি অধ্যয়নে রত ছিলাম। ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের পুস্তকে এ বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণা-সূত্র পাওয়া যায়, ভারতীয় মাপকাঠিতে তাহা প্রযুক্ত হইতেছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বহু ভারতীয় ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিমের সহিত আমাকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা

এই সমস্ত আলোচনা ও অধ্যয়নের ফলে আমার এই পুস্তকটী বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমস্ত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের সূত্রকে ভিত্তি করিয়া আমি এই পুস্তকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, ঐ সমস্ত সূত্র যদিও প্রতীচ্য জগতে নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তবু আমাদের দেশে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হইতে পারে এ জ্ঞানও আমার আছে। ভারতীয় পাত্রে ঐ সমস্ত সূত্র প্রয়োগ করিবার যে চেষ্টা আমি করিয়াছি তাহার প্রয়োগ-ক্ষেত্র অতিশয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমার পুস্তকের পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এই পুস্তকে আলোচিত প্রত্যেকটী সূত্রকে নিজের দেহ ও মনের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের মতামত আমাকে জানাইবেন। ঐ সমস্ত মতামত অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কঠোরতার সহিত সে গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে। একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ইহা যে কত প্রয়োজনীয়, আশা করি, প্রত্যেক পাঠক তাহা স্বীকার করিবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যৌন-ব্যাপারকে সরলভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের শ্রেণীভুক্ত করিয়া যথারীতি অধ্যয়নের দ্বারা মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। যৌন-বিষয়ের আলোচনায় তরলমতি বালক-বালিকা পথভ্রষ্ট হইবে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের মনোভাবের ভ্রমপূর্ণতা ও যুক্তির অসারতা আমি বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি। আমি আবার তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অজ্ঞতা কস্মিনকালেও নীতির রক্ষাকবচ নহে। যৌন-ব্যাপারে মানুষকে অজ্ঞ রাখা অসম্ভব; কারণ প্রকৃতি তাহার শিক্ষাদাত্রী। সুতরাং সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া সুশিক্ষার ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অজ্ঞতা-জাত নীতির কি কোনও মূল্য আছে? আমরা বহু প্রকারের বিবাহ-প্রথার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। ঐ সমস্ত বিবাহ-প্রথাকে আমরা যতই পাপ মনে করি না কেন, যতই ঘৃণ্য বর্ব্বরতা মনে করি না কেন, যাহাদের মধ্যে ঐ সব প্রথা প্রচলিত আছে, তাহারা কিন্তু সরল আন্তরিকতার সঙ্গেই ঐ সমস্ত 'পাপ'কে ধর্ম্ম মনে করিয়া আসিতেছে। সুতরাং অজ্ঞতা কস্মিনকালেও ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তিভূমি হওয়া উচিৎ নয়।

অজ্ঞতা ধর্ম্মের ভিত্তি নয়

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমি যৌন-বিকল্পের এত বিস্তৃত আলোচনা করায় উহাতে বালক-বালিকা বিপথগামী হইতে পারে। এ ধারণাও নিতান্ত ভ্রান্ত। যাহা অহরহ ঘটিতেছে, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ সমস্তই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘদিনের নৈষ্ঠিক সাধনা ও অনুসন্ধানের ফল। সরল-মনা পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন, এই পুস্তক পাঠে তাহার পুত্র-কন্যাগণ

যৌন-বিকল্পের প্রসার

এই সমস্ত যৌন-বিকল্প শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু তিনি একটু পর্য্যবেক্ষণ সহকারে লক্ষ্য করিলে জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষা-গুণে ঐ সমস্ত অভ্যাস ইতিপূর্ব্বেই আত্ম-বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং কি হইবে, তাহা প্রশ্ন নয়, যাহা হইয়াছে, তাহার সংস্কার কি ভাবে করা যায়, তাহাই আসল প্রশ্ন। এ সমস্ত অভ্যাস দূর করিবার জন্য আমরা ব্রহ্মচর্য্য, মনোচিকিৎসা, ইচ্ছাশক্তি-সাধনা প্রভৃতি প্রতিকারোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি। হইতে পারে, বিশেষ বিশেষ পাঠক এই পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। কিন্তু আমি সমস্ত বিষয়টীকে জ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি-কোণ্ হইতে দেখিয়াছি, এবং সেইভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি।

পূর্ব্ব-সংস্কার জ্ঞানা-হরণের পরিপন্থী

সুতরাং পাঠকগণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যৌন-বিজ্ঞানের ন্যায় জটীল বিষয় অধ্যয়ন করিতে গেলে জ্ঞানাহরণের তীব্র ক্ষুধা লইয়াই করিতে হইবে। ঘটনাবলীর অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়া উহাকে নিরপেক্ষ আলোচনার কষ্টিপাথরে কষিলেই সত্যের খাঁটী সোনা পাওয়া যাইবে। ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, দেশ, কাল এই সমস্তই আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পূর্ব্ব-সংস্কার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত পূর্ব্ব-সংস্কার কোনও বিষয়েই আমাদিগকে স্বাধীনভাবে জ্ঞানাহরণ করিতে দেয় না। বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনায় আমি সকল ব্যাপারে সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি-কোণ্ হইতে সমস্ত বিষয়টী দেখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। কতটা সাফল্যলাভ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহার

বিচার করিবেন। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে সত্যানুসন্ধিৎসাই একমাত্র অনুপ্রেরণারূপে আমাকে এ-কার্য্যে পরিচালিত করিয়াছে।

আমি স্বীকার করি, সকল বিষয়ে হয়ত আমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সত্যের রূপ দর্শন করিতে পারি নাই। কিন্তু সে দোষ আমার বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে।

বিজ্ঞান-সাধনার ক্রম-বিকাশ

দেহ-তত্ত্ব, পদার্থ-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সে সমস্ত বিজ্ঞানের উপর যৌন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই সমস্ত বিজ্ঞান নিজেরাই সূক্ষ্মরূপে নির্ভুল নয়। সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই মানব-মনের একটা অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। এ সাধনা, এ গবেষণা অনন্তকাল চলিবে। যৌন-বিজ্ঞানও এই ক্রটী-মুক্ত নয়। সুতরাং আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অভিমতই শুধু গ্রহণ করিয়াছি, যাহা ভবিষ্যতে নূতন আবিষ্কারের আলোকে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বর্ত্তমানে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। যে সমস্ত মতবাদকে এককালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মীয় তত্ত্বকথারূপে আকড়িয়া ধরিয়া ছিলেন, সে সমস্তেরও ত বহু সংস্কার ও রদ-বদল হইয়াছে। ইহাই দেখাইবার জন্য আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রাচীন মতবাদ আলোচনা করিয়া তাহার সঙ্গে আধুনিক মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে ক্রটী করি নাই।

কোনও বিষয় সম্বন্ধেই সকলের একমত হওয়া সম্ভবপর নহে। যৌন-বৈজ্ঞানিক মতবাদেও অনেক বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে এবং থাকিবেই।

মত-পার্থক্য স্বাভাবিক

কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যানুসন্ধান যাঁহারা করেন, মতভেদের জন্য তাঁহারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারান না। সত্যের সঙ্গে স্বার্থের এইটুকুই

পার্থক্য। বহু বিভিন্ন মতের মধ্য হইতে আমি একটী মাত্র মত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অন্য মতে আমার অশ্রদ্ধা আছে, তাহা নহে। আমি একটী মত গ্রহণ করিয়াছি এইজন্য যে, সত্যানুসন্ধানে একটীর বেশী মত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিচারে একটীমাত্র মত গ্রহণ করিয়াছি এবং অপর সকলের সঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে মতভেদ ঘোষণা করিয়াছি।

কিন্তু আমার পাঠক-পাঠিকাগণ কি আমার প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করিবেন? গ্রন্থকার একা, পাঠক-পাঠিকা বহু। সকলকে সন্তুষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কাহারও পক্ষে হয় নাই। আমি জানি, এমন পাঠকের অভাব নাই, যাঁহারা আমার বক্তব্য পাঠ না করিয়াই আগে হইতেই মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিবেন। বাঙ্গলা দেশেই এ বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পর-মত-সহিষ্ণুতার অভাব আমাদিগকে জ্ঞানান্বেষণে প্রতিপদে বাধা দিতেছে, তবু আমরা সংস্কার-মুক্তভাবে জ্ঞানাহরণের চেষ্টা করিতেছি না। আমরা আমাদের জরাজীর্ণ সংস্কারগুলি যক্ষের মত পাহারা দিতেছি। আমি আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের সমস্ত মতভেদই জ্ঞানানুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত? তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারকে জ্ঞান ও বিচারের নিক্তিতে ওজন করিয়া গ্রহণ ও বর্জ্জন করিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। কোনও একটী বিষয় প্রথম দৃষ্টিতে যতই অসম্ভব ও অযৌক্তিক মনে হউক না কেন, যতই বিপ্লবমূলক বোধ হউক না কেন, আমাদের চির-পোষিত ধারণার যতই তাহা বিরোধী হউক না কেন, বিষয়টীকে এক কথায় বিনাবিচারে অগ্রাহ্য করিবেন না। তাহা যদি করেন, দুনিয়ার অনেক

সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই জ্ঞানের উৎস

সত্য হইতেই আপনি বঞ্চিত থাকিবেন। আর সত্য যখন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে, সাহসের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিবেন। সত্য গ্রহণে সাহস চাই বলিয়াই আমি একথা বলিতেছি। সত্য কাহারও মুখাপেক্ষী নয়—সে সত্যই; আপনি চাহিলেও সে সত্য, আপনি না চাহিলেও সে সত্যই। একথা পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিবার বিশেষ কারণ এই যে, মানুষ তাহার পূর্ব্বসংস্কারের অনুকূল মতসমূহকে যত সহজে গ্রহণ করে, উহার বিরুদ্ধ মতগুলিকে ঠিক তত সহজেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। অগ্রাহ্য করিবেন করুন, কিন্তু বিরুদ্ধমতের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করিবার মত অসহিষ্ণু হওয়া কি উচিত? আমরা জানি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিক যদি মরা মানুষ বাঁচাইবার জন্য গবেষণা করেন, তবে তাহাতে আমাদের ক্রুদ্ধ হইবার কোনও কারণ নাই। যদি তিনি বিফল-মনোরথ হন, তবে কাহারও কোনও লোকসান হইবে না; কিন্তু যদি সফলকাম হন, তবে আমরা একটা নূতন সত্যের সন্ধান পাইব।

আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, আমার পাঠক-পাঠিকার মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা জ্ঞানের কষ্টিপাথরে সমস্ত বিষয়ই 'যাচাই' করিয়া থাকেন। আমি জানি, তাঁহারা আমার এ উদ্যমের প্রশংসা করিবেন। কিন্তু তাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব না। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে অনেকখানি আশা করি। আমার এ সাধনায় উহাঁরা আমার সহায় হইবেন, আমার এ গ্রন্থের ত্রুটী ও অসম্পুর্ণতা দূরীকরণে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলভাগী করিবেন, দৃঢ়তার সহিত আমি এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। তাঁহারা এই জটীল বিজ্ঞানালোচনায় যখন যে

পরামর্শ দিবেন, আমি শ্রদ্ধার সহিত সে পরামর্শ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া এ বিষয়ে অধ্যয়ন করিলে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন সুখের আকর হইবে, বাঙ্গলার দম্পতিরা আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা হইবে, ব্যভিচার ও যৌন-বিকল্প বাঙ্গলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া দূরীভূত হইবে। যৌন-সুখের সন্ধানে যাহারা বিবাহ-প্রথার উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে, শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা বিবাহ-জীবনকেই চরম সুখের কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব। আমরা উপসংহারে দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে ডাঃ ফোরেলের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়া উপক্রমণিকার উপসংহার করিতেছি ঃ

ফোরেলের কল্পিত দাম্পত্যজীবন

তিনি লিখিয়াছেন—ভবিষ্যতের মানুষ শৈশব হইতেই যৌন-বিজ্ঞান ও উহার বিভিন্ন দিকের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইবে। মানুষ মদ্য বা অন্য কোনও প্রকার নেশা খাইবে না। মানুষ কাঞ্চন-কৌলিন্যে বিশ্বাসী থাকিবে না, সহস্র লোকের রক্ত শোষণ করিয়া এক ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে না ; সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের কাম-লালসায় ইন্ধন যোগাইবার জন্য সহস্র প্রেমিকের প্রাণ ও সহস্র নারীর সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে না। মানুষ বিলাসী থাকিবে না ; শিল্প-কলা ও ললিতকলা সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বাহুল্য থাকিবে না। স্বাস্থ্য-সম্মত, স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ পোষাকে মানুষ তৃপ্ত থাকিবে। আড়ম্বর ও বিলাসিতা

যে শিল্প-কলা নহে, একথা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিবে। সুতরাং মানুষের আবাসবাটী আড়ম্বরপূর্ণ ইষ্টকস্তুপ থাকিবে না; মানুষের বাসোপযোগী কবিত্বময়, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, শিল্পকলার নিদর্শন হইবে। মানুষ ভণ্ডামী ভুলিয়া যাইবে; সত্যকথা সত্য করিয়া জোরের সঙ্গে বলিবার অভ্যাস হইবে। যৌন-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তরুন-তরুনী অন্যান্য দশটী বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় নিজেদের যৌন-উপযোগিতা আলোচনা ও বিচার করিবে। তাহারা পয়সার হিসাব করিতে যেমন ভুল করে না, যৌন-ব্যাপারে কিম্বা অংশীদার নির্ব্বাচনেও তেমনি ভুল করিবে না। নারী-পুরুষ উভয়েরই তালাকের অধিকার থাকিবে, কিন্তু তালাকের প্রয়োজন থাকিবে না।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

যৌন-বোধ

যৌন-বোধ কাহাকে বলে—যৌন-বোধের দৈহিকতা—স্বাস্থ্যের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ—মনের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ—যৌন-বোধের প্রকৃত স্বরূপ—যৌন প্রদেশ সমূহ—রতিক্রিয়ায় যৌন-প্রদেশের ক্রিয়া—ব্যক্তিভেদে যৌন-প্রদেশের অনুভূতিশীলতার ব্যতিক্রম—যৌন-বোধ ও চতুরিন্দ্রিয়—যৌন-বোধ ও দর্শনেন্দ্রিয়—যৌন-বোধ ও ত্বগিন্দ্রিয়—যৌন-বোধ ও শ্রবণেন্দ্রিয়—যৌন-বোধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়—যৌন-বোধের প্রকৃতি—রতিক্রিয়ার দৈহিক প্রতিক্রিয়া—প্রকৃতির ব্যবস্থা—যৌন-বোধের মানসিকতা।

যৌন-বোধের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নহে, একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অসুবিধা হেতু বিভিন্ন যৌন-বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ভাবে যৌন-বোধের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যৌন-বোধ কাহাকে বলে

প্রেগ (Prague) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কিশ্ বলিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে দৈহিক ও আঙ্গিক মিলনের যে বাসনা অনুভব করে, সেই বাসনার নাম যৌন-বোধ। শৈশবে এই বোধ নিদ্রিত থাকে, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা স্ফুরিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে বার্দ্ধক্যে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক কিশের এই ব্যাখ্যা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হইলেও উহার প্রধান ক্রটী এই যে, এ ব্যাখ্যায় মানুষের যৌন-বাসনাকে অনাবশ্যকরূপে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কারণ নারী-পুরুষ যে কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে তাহা সত্য নহে; সম-লৈঙ্গিক

ব্যক্তির প্রতি মানুষের যে যৌন-আকর্ষণ, তাহাকে বিকল্প আখ্যা দিলেও উহা যে যৌন-বোধের অন্তর্গত, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রাণী-জগতে যৌন-বোধ একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিটী ক্ষুৎ-পিপাসার মতই শক্তিশালী। কর্ষণ ও অভ্যাসের দ্বারা অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এই বৃত্তিটীকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইলেও সে নিয়ন্ত্রণ দেহ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। ক্রোধ, লোভ ও মোহ কামের মতই বৃত্তি বটে, কিন্তু কাম-বৃত্তি নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেহের উপর যতটা প্রতিক্রিয়া হয়, ক্রোধ, লোভ বা মোহের নিয়ন্ত্রণে ততটা হয় না। এক ব্যক্তি ঘন ঘন রাগ করিলে বা লোভ করিলে তদ্দ্বারা তাহার শরীরের উপর যতটা ক্রিয়া হইবে, একজন ঘন ঘন কামবৃত্তি চরিতার্থ করিলে তদ্দ্বারা তাহার শরীরের উপর ঢের বেশী ক্রিয়া হইবে। সুতরাং মানুষের যৌন-বোধের সহিত তাহার দেহের যে নিকটতম সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

দেহের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ

শরীরের সহিত যৌন-বোধের নিকটতম সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্বাস্থ্যেরও সহিত যৌন-বোধের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ শরীরের সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থার নামই স্বাস্থ্য। কাজেই শরীরের অবস্থা যাহার স্বাভাবিক, যৌন-বোধও তাহার স্বাভাবিক হইবে, ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ

দেহের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ট, মনের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ তাহার চেয়েও ঢের বেশী ঘনিষ্ট। যৌন-বোধ মনের উপরে

মনের সহিত যৌন-বোধের সম্বন্ধ

ঠিক কি প্রণালীতে কাজ করে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সূত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আদিম কালে লোকের ধারণা ছিল যে, যৌন-বোধ মলমূত্রত্যাগের প্রয়োজনের মতই একটা দৈহিক প্রয়োজন মাত্র। মানুষ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ দ্বারা অধিকতর যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসু হইবার পর ধারণা করিল যে, যৌন-বোধ মানুষের সৃষ্টি-বাসনার নামান্তর মাত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই ধারণাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ দেখা গিয়াছে, সৃষ্টির জন্য মানুষের যৌন-কামনার প্রয়োজন হয় না। পুরুষের শুক্রকীট যে কোনও প্রকারে স্ত্রীলোকের জরায়ুতে ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। সম্প্রতি আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীলোকের ডিম্বের সহিত যে কোনও প্রকারে মিলাইয়া দিতে পারিলে সহবাস-প্রণালী-ব্যতিরিকেও সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে। ফলতঃ সন্তান উৎপাদনে পিতা বা মাতার সৃষ্টি-বাসনার কোনও প্রয়োজন যে নাই, একথা বর্ত্তমানে একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে, যৌন-বোধ মোহ বা মাৎসর্য্যের মত দেহ-নিরপেক্ষ কোনও বৃত্তিমাত্র নহে, পক্ষান্তরে উহা মলমূত্র ত্যাগ বা সন্তানোৎপাদনের ন্যায় কোন দৈহিক প্রয়োজনও নহে।

যৌন-বোধের প্রকৃত স্বরূপ

তবে যৌন-বোধ কি? আধুনিক শরীর-বিজ্ঞানও মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণের বহু গবেষণার ফলে ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে যে, যৌন-বোধ মানুষের দৈহিক

সম্বন্ধযুক্ত একটী মনোবৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারা মানুষ একাধারে দৈহিক ও মানসিক আনন্দলাভে সমর্থ হয়।

যৌন-বোধ প্রধানতঃ স্নায়ুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মানুষের দেহে স্নায়ু-প্রধান যে সমস্ত স্থান আছে, সেখানে যৌন-বোধ অতিশয় প্রবল। এই

যৌন-প্রদেশ সমূহ

সমস্ত স্থান যৌন-বোধের সহিত এমন ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, ইহাদিগকে যৌন-স্থান বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্থানের স্নায়ুসমূহ যৌন-বোধের সহিত অতিশয় সহানুভূতিযুক্ত। মানুষের মনে কোনও কারণে যৌন-বোধের স্ফুরণ হইলে ঐ সমস্ত স্থানে উক্ত অনুভূতির প্রতিধ্বনি হয় অথবা ঐ স্থানে স্পর্শন বা ঘর্ষণের দ্বারা যৌন-অনুভূতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মান হিসাবে নিম্নে যৌন-প্রদেশ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল ঃ

(১) লিঙ্গপ্রদেশ—পুরুষের লিঙ্গ, স্ত্রীলোকের যোনি ও ভগাঙ্কুর (Clitoris)

(২) ভগদেশ (Vulva)

(৩) স্ত্রীলোকের স্তন, বিশেষতঃ স্তনের বোঁটা।

(৪) উরুদেশ।

(৫) গুহ্যদ্বার।

(৬) ঠোঁট।

(৭) গাল।

(৮) পুরুষের স্তন।

(৯) নিতম্ব।

(১০) কোমর।

(১১) নাভি।

(১২) বগল।

(১৩) অঙ্গুলি।

(১৪) ঘাড়।

(১৫) চিবুক।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে মানুষের শরীরের সর্ব্বত্রই যৌন-বোধ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মানব-দেহের যে যে স্থানে চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেই যৌন-বোধ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। তবে উপরে যে সমস্ত স্থানের নাম করা গেল, সেই সমস্তের সহিত যৌন-বোধের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত স্থানে হস্ত বা মুখ বা অপরের, বিশেষতঃ বিপরীত-লিঙ্গ লোকের ঐ সমস্ত অঙ্গের ঘর্ষণ বা স্পর্শন হইলেই যৌন-বৃত্তি জাগ্রত হয়।

সেজন্য যৌন-মিলনের সময় স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানাপ্রকার সংযোগ চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে।

রতিক্রিয়ায় যৌন প্রদেশের ক্রিয়া

কারণ নিদ্রিত কামভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই যে কেবল ঐ সমস্ত যৌন-প্রদেশের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা নহে। স্বামী স্ত্রীর আরব্ধ সঙ্গম-ক্রিয়াকে অধিকতর সুখদায়ক করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পরের প্রতি অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করিবার জন্যও ঐ সমস্ত প্রদেশে ঘর্ষণ ও স্পর্শন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া যৌন-বিজ্ঞানে চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত অঙ্গের কোনও-কোনটা এত তীব্র অনুভূতিশীল যে, ভিন্ন ব্যক্তি

ছাড়াও নিজে নিজে ঐ সমস্ত স্থানে যৌন-সুখ অনুভব করা যাইতে পারে। হস্তমৈথুন, উরুমৈথুন এই সমস্ত যৌনপ্রদেশের অনুভূতিশীলতার জন্যই হইয়া থাকে। যৌন-বৃত্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য, অথবা যৌন-বৃত্তি অন্য কোনও কারণে জাগ্রত হইলে, মানুষ স্বীয় যৌন-প্রদেশসমূহ মর্দ্দন বা ঘর্ষণ করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকে। ইহার কারণ মানুষের যৌন-প্রদেশসমূহের অনুভূতিশীলতা।

ব্যক্তিভেদে যৌন-প্রদেশের অনুভূতি-শীলতার ব্যতিক্রম

বলা বাহুল্য, ব্যক্তি-ভেদে উপরোক্ত স্থানসমূহের অনুভূতিশীলতার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। পুস্তক পাঠে এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম ধরিবার কোনও সাধারণ সূত্র জানিবার উপায় নাই। স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পরস্পরের যৌন-প্রদেশসমূহের অনুভূতিশীলতা উপলব্ধি, এবং সঙ্গমের সময়ে এবং তাহার প্রাক্কালে ঐ সমস্ত প্রদেশের সম্যক সদ্ব্যবহার, করিতে পারে। অন্যথায় যৌন-সম্মিলন কদাচ সুখের হয় না।

যৌনবোধ ও চতুরিন্দ্রিয়

মানুষ তাহার যৌন-প্রদেশসমূহে যে যৌন-অনুভূতি অনুভব করে, তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের ভিতর দিয়াই করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ চক্ষুদ্বারা কোনও সুন্দরী রমণীর সুগঠিত দেহ দর্শন করিলে বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার যৌন-প্রদেশসমূহে যৌন-অনুভূতি জাগ্রত হয়। মানুষ চারিটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যৌন-অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। যথা—দর্শন বা চক্ষু, স্পর্শন বা ত্বক, শ্রবণ বা কর্ণ, ঘ্রাণ বা নাসিকা।

আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এখানে মনশ্চক্ষুকেও আমরা চক্ষুর অন্তর্গত ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিব। কারণ অনেক দর্শনক্রিয়া আমরা কল্পনানেত্রেও করিয়া থাকি।

যৌন-বোধ ও দর্শনেন্দ্রিয়

মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে চক্ষুই বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানাহরণের সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যৌন-বৃত্তির দিক হইতেও চক্ষুই বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয়। মানুষ তাহার মানস-নেত্রেই তাহার চির-পুরাতন ও চির-নূতন স্বপ্নময়ী স্বপনচারিণী রূপসী মানস-প্রতিমার রূপ ধ্যান করিয়া আসিতেছে। 'সুন্দর' 'রূপসী' প্রভৃতি প্রেমের পরিকল্পনাগুলি সমস্তই দর্শন-সাপেক্ষ।

প্রধানতঃ চক্ষু দ্বারাই আমাদের যৌন-ক্ষুধা জাগ্রত ও তৃপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের কবিগণ 'সুন্দরের' যে কল্পনা ও ধ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে যৌন-বোধ জড়িত ছিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যাহা-কিছুকে সুন্দর বলি, এবং সে বলায় যদি শিরায়-শিরায় একটা পুলকের ঝঙ্কার অনুভব করি তবে, আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, সে সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে যৌন-বোধ লুক্কাইত আছেই আছে। কারণ 'সুন্দর' কথাটা বৃত্তি-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আমার নিকট যাহা ভাল লাগে, তাহাই আমার নিকট সুন্দর। আমার এই ভাল লাগারও একটা মাপকাঠি, অর্থাৎ সোজা কথায় উদ্দেশ্য, আছে। সুতরাং এ জগতে সত্যিকার 'সুন্দর' জিনিষ খুব কমই আছে যাহার সঙ্গে যৌন-বোধ জড়িত নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধের অনেকখানি যে যৌন-বোধ, তাহার আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির মধ্যেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ খুঁজিয়া বেড়াই। পুরুষের কাছে নারীই সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও নারীর কাছে পুরুষই সৌন্দর্য্যের আকর। আবার পুরুষের কাছে নারী-দেহের মধ্যে তাহার যৌন-প্রদেশসমূহই সৌন্দর্য্যের চরম নিদর্শন। আদিকালে নারী-পুরুষের সৌন্দর্য্য বিচার হইত তাহাদের যৌন-প্রদেশের সৌন্দর্য্য দিয়া। সেইজন্য পুরুষ ও নারী পরস্পরকে পরস্পরের নিকট লোভনীয় করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের যৌন-প্রদেশ সমূহ কৃত্রিম উপায়ে দর্শনীয় করিয়া রাখিত। বর্ব্বর যুগে নারী ও পুরুষ যৌন-বৃত্তি জাগ্রত করিবার জন্য দলে-দলে নৃত্য করিত এবং ঐ নৃত্যে সকলেই নিজ নিজ যৌন-প্রদেশসমূহ আড়ম্বর সহকারে প্রদর্শন করিত। এমন কি মধ্যযুগে ইউরোপে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এমন কায়দায় পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, যাহাতে তাঁহাদের যৌন-অবয়বসমূহ বিপরীত লিঙ্গের লোকের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিতে পারে। পৃথিবীর কোনও কোনও স্থানে এখন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের যৌন-প্রদেশ বৃহত্তর করতঃ রাস্তায় ভ্রমণ ও নৃত্যাদি করিয়া পুরুষের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুসভ্য ইউরোপের নারীরা তাহাদের স্তন ও উরুদেশ প্রদর্শন করাকে সৌন্দর্য্যের নিদর্শন মনে করিয়া থাকেন। জাপানে আজিও যৌন-সম্মিলনের যে সমস্ত চিত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-অঙ্গসমূহকে অস্বাভাবিকরূপে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। এইভাবে প্রাধান্য দিতে দিতে মানুষ লিঙ্গকে দেবতার শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া ফেলিয়াছিল। লিঙ্গ-পূজা

পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। সুসভ্য হিন্দু ও রোমীয়দের মধ্যে আজিও লিঙ্গপূজা বিদ্যমান আছে।

সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও শালীনতা-বোধের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যৌন-অঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে বিরত হইতেছে। কতকটা বাধ্য হইয়াও মানুষকে ইহা করিতে হইয়াছে। কারণ প্রাথমিক যৌন-প্রদেশসমূহ অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীলোকের যোনি অতিশয় কোমল অঙ্গ। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত অঙ্গ প্রদর্শন করিয়া বেড়াইলে উহারা প্রয়োজনানুরূপ সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। ঐ সমস্ত কোমল অঙ্গ সুরক্ষিত রাখিতে হইলে আবরণ অপরিহার্য্য। এইজন্য, এবং শালীনতার জন্যও, মানুষ প্রাথমিক যৌন-প্রদেশসমূহ আর আগেকার মত প্রদর্শন করিয়া বেড়ায় না।

কিন্তু মানুষের চক্ষুর ক্ষুধা মিটাইবার উপকরণ ত চাই। তাই বাজারে পুলিশের সতর্ক চক্ষুকেও ফাঁকি দিয়া প্রত্যহ হাজার হাজার রতিক্রিয়ার ছবি বিক্রয় হইতেছে। রতিক্রিয়ায় যাহারা সতত লিপ্ত ও তৃপ্ত, তাহারাও রতিক্রিয়ার এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর ফটো দর্শন করিতে ভালবাসে এবং সেই সমস্ত ছবি দর্শন করিয়া কল্পনায় যৌন-সুখ অনুভব করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, আঙ্গিক রতিক্রিয়া মানুষের চক্ষুর যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে না।

কিন্তু ছবিতেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। গৃহকোণে নির্জ্জনে চক্ষুর ক্ষুন্নিবৃত্তি শত হইলেও আংশিক তৃপ্তিমাত্র।

সে জন্য মানুষ শালীনতার মুখ রক্ষা করিয়া প্রাথমিক যৌন-অঙ্গসমূহ পরিত্যাগ করতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর যৌন-অঙ্গসমূহকে প্রাধান্য দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যৌন-অঙ্গের মধ্যে স্ত্রীলোকের নিতম্ব ও স্তনই প্রধান। এতৎব্যতীত পুরুষের শ্মশ্রু-গুম্ফ ও স্ত্রীলোকের কেশও যৌন-বোধের অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার আর্য্য, সেমেটিক ও অন্যান্য সমস্ত জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের প্রশস্ত নিতম্ব সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। নিতম্ব দুলাইয়া পুরুষের মন আকর্ষণ করিয়া হাটিতে পারা নারীর একটা বিশেষ গুণ বলিয়া বিভিন্ন জাতির কবিতায় স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশে মনোরম চন্দ্রহার ও বিছাহার প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা নিতম্বকে লোভনীয় করার প্রথা আজিও বিদ্যমান আছে। ইউরোপীয় সুসভ্যজাতিসমূহের মধ্যেও আটা পোষাকের মধ্যে সুগঠিত নিতম্বকে ফুটাইয়া তোলা নারী জাতির সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অন্যতম নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিতম্বের পরেই স্ত্রীজাতির স্তনের স্থান। যৌন-বৃত্তির দিক হইতে বিচার করিলে স্ত্রীজাতির স্তনকে নিতম্বের উপরে স্থান দিতে হয়। কিন্তু স্তনের দোষ এই যে, ইহার আয়ু অতি ক্ষণস্থায়ী। নারীর অন্যান্য অঙ্গে যখন ভরা যৌবন থাকে, তখনই তাহার স্তনে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ নারীর স্তন যৌবনের প্রারম্ভে ৫।৬ বৎসরের অধিক সুগঠিত, দৃঢ়, সুগোল ও উন্নত থাকে না। তাই নারী-সৌন্দর্য্য-বিচারকেরা নারীর স্তনকে তাহার নিতম্বের নিম্নে স্থান দিয়াছেন।

সমস্ত জাতির সাহিত্যই নারীর স্তনের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে। সিক্ত-বসনা নারীর স্তনের স্তুতিগানে বাঙ্গলার কবিরা অসংখ্য কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় নারীরা 'টাইটব্রেষ্ট' প্রভৃতি

কৃত্রিম অবলম্বনে স্তন উন্নত রাখিয়া তাহা অর্দ্ধাবৃত রাখাকে সৌন্দর্য্যের নিদর্শন মনে করিয়া থাকেন।

পুরুষের দাড়ি গোঁফ ও স্ত্রীলোকের কেশও সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এই সমস্তের বাজারমূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে ইহাদের খুব কদর ছিল। ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির কেশের মূল্য আজিও কমে নাই। প্রসিদ্ধ যৌন-বিজ্ঞানবিৎ হ্যাভলক এলিসের মতে দেশ ও কালভেদে কেশের প্রতি নারী-পুরুষের আকর্ষণের তীব্রতাভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ সৌন্দর্য্য-বোধের অন্তরালে যৌন-বোধ লুক্কাইত রহিয়াছে। আমাদের যৌন-বোধের কতখানি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া জাগ্রত ও তৃপ্ত হয়, ইহা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদের চক্ষুর যৌন-ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই শিল্পকলা, সিনেমা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যৌন-বোধের দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় আমাদের ত্বক। রতিক্রিয়া আমাদিগকে যে এতখানি আনন্দ দান করিতে পারে, সে কেবল আমাদের ত্বকের যৌন-অনুভূতিশীলতার জন্যই।

যৌন-বোধ ও ত্বগিন্দ্রিয়

প্রধানতঃ ত্বকের উপরই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বকই সর্ব্বাপেক্ষা আদি ও কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত। পশু-পক্ষীর মধ্যে প্রধানতঃ এই ত্বকের ভিতর দিয়াই যৌন-বৃত্তি উন্মেষ লাভ করিয়া থাকে।

শৈশব হইতেই এই স্পর্শ-সুখানুভূতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কিশোরীদের মধ্যে যখন সর্ব্বপ্রথম যৌন-অনুভূতি জাগ্রত হয়, তখন প্রধানতঃ তাহা স্পর্শ-সুখানুভূতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাহারা তখন চুম্বন, ঘর্ষণ ও মর্দ্দনেই তৃপ্ত হয়। প্রকৃত সঙ্গম-ক্রিয়াকে তাহারা ভীতির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে।

সুড়সুড়ি ও মর্দ্দন প্রভৃতি হাতের, চুম্বন ও দংশন প্রভৃতি দাঁতের ক্রিয়া সমস্তই ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতির তৃপ্তিসাধক।

সুড়সুড়ি প্রধানতঃ হাঁচির উদ্রেক করে এবং ইহা নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য রক্ষাকবচবিশেষ। কিন্তু সুড়সুড়ি দ্বারা যৌনবোধেরও উদ্রেক হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যৌনপ্রদেশসমূহ কোমল বলিয়া ঐ সব স্থানে সুড়সুড়িও খুব বেশী। কাজেই হঠাৎ কেহ ঐ সমস্ত স্থান স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাতে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু যৌন-কার্য্যে ঐ সুড়সুড়িই আবার সমস্ত যৌন-চেতনাকে উন্মুখ করিয়া দেয়। এই সুড়সুড়ির বর্দ্ধিত মাত্রাই মর্দ্দন। যে সমস্ত অঙ্গে সুড়সুড়ি দিলে যৌন-চেতনা জাগ্রত হয়, যৌন-চেতনা বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত স্থানে প্রচাপনের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য নারীর যৌন-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির সময় সে তাহার যৌন-অঙ্গসমূহে পুরুষহস্তের স্পর্শন ও মর্দ্দন আকাঙ্ক্ষা করে।

চুম্বন ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতির আর একটী জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আমাদের অধরোষ্ঠ অতিশয় চেতনশীল অঙ্গ। ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সীমারেখা হওয়ায় ইহা স্পর্শগুণে অত্যন্ত অনুভূতিশীল। ইহার সঙ্গে অধিকতর চেতনশীল জিহ্বার সহযোগিতা থাকায় ইহা আমাদের যৌন-চেতনা বৃদ্ধির পরিপোষক। জিহ্বা ও ঠোঁট এতটা চেতনশীল

বলিয়াই আমাদের যৌনবোধে ইহারা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। চুম্বন করার প্রথা সমস্ত সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে।

চুম্বনের বর্দ্ধিত মাত্রার নাম দংশন। যে সমস্ত স্থানে চুম্বন করিলে মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, যৌন-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সেই সমস্ত স্থানে কোমল দংশনও প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আলিঙ্গন আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতির অপর নিদর্শন। যৌনকার্য্যে এই আলিঙ্গন অতীব প্রয়োজনীয় অংশ।

সুড়সুড়ি বা মর্দ্দন, চুম্বন বা দংশন ও আলিঙ্গন আমাদের যৌন-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অংশ। হ্যাভলক্ এলিস্ প্রভৃতি বিখ্যাত যৌন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অভিমত এই যে, যৌন-প্রবৃত্তি বিবৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত কার্য্য অনায়াসে করা যাইতে পারে। কিন্তু শুক্রস্খালনোদ্দেশ্যে এই সমস্ত কার্য্য করিলে উহা স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায় এবং তখনই কেবল উহা যৌন-বিকল্পে পর্য্যবসিত হয়।

রতিক্রিয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থান যে নগণ্য নহে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, সঙ্গীত যৌন-বৃত্তির জাগরণ ও হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনও কোনও যৌন-বিজ্ঞানবিদের অভিমত এই যে, যৌন-বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য পুরুষ অপেক্ষা নারী জাতির উপর অনেক বেশী। বেশী-কমের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একথা প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ই স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের যৌনবোধের অনেকখানি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জাগ্রত হয়।

যৌন-বোধ ও শ্রবণেন্দ্রিয়

সঙ্গীত যে সাধারণভাবে আমাদের মনোবৃত্তির উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল,

সেকথা এক রকম বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত অসঙ্গত কথাবার্ত্তাও যে আমাদের মনোবৃত্তিকে আঘাত করিতে পারে, ইহা আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান হইতেও বুঝিতে পারি। সঙ্গীত ব্যতীত বক্তৃতা, উচ্ছ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস, এমন কি গালাগালি আমাদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সে কথা অধিকাংশ পাঠকই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিতে পারেন।

সুইডেনের ভাষাতত্ত্ববিৎ স্পার্ব্বার (Sperber) বলিয়াছেন যে, প্রাণী-জগতে ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে দুইটী অভাব পূরণের জন্য : একটী, সন্তান মাকে ক্ষুধা নিবেদন করিতে, অপরটী প্রেমিক প্রেমিকাকে যৌন-ক্ষুধা নিবেদন করিতে। এ কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে যে একেবারেই সত্য নাই, একথা আজিও কোনও পণ্ডিত বলিতে পারেন নাই।

আমরা শুধু যে আমাদের প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর শুনিতে ভালবাসি, তাহা নহে, আমরা প্রিয়জনের মুখে প্রেম-কথা, এমন কি যৌনবোধাত্মক কথা, —যাহাকে সাধারণতঃ অশ্লীল কথা বলা হইয়া থাকে—তাহাও শুনিতে ভালবাসি। যৌনবোধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এতটা তৃপ্ত হইতে চায় যে, আমরা প্রিয়জন ছাড়াও অপর লোকের মুখে অশ্লীল কথা শুনিতে আনন্দ বোধ করি। ফলতঃ, যৌনব্যাপারের কার্য্যাদি দর্শন যেমন মানুষের একটা সাধারণ চক্ষের ক্ষুধা, সেইরূপ যৌনব্যাপারের বাক্যাদি শ্রবণও তাহাদের একটা সাধারণ কর্ণের ক্ষুধা।

তবে বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই ক্রিয়া পুরুষ

অপেক্ষা নারীর উপরই বেশী। ইহার কারণ এই যে, যৌবনাগমে পুরুষের কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তিত হয় যে, নারীর কর্ণে সে পরিবর্ত্তন এক অপূর্ব্ব সুধা ঢালিয়া দেয়। যৌবনাগমে নারীর কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্ত্তন আসে না। সেই জন্য নারীর কর্ণে কণ্ঠস্বর একটা বিপুল ক্রিয়াশীল যন্ত্র।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, সই, আকুল করিল মোর প্রাণ"—এটা শুধু নারীতেই সম্ভব। নারী জাতির উপর কর্ণের এতটা প্রভাব যে,—

"এখনো তাহারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি"

—কেবল নারী জাতিই বলিতে পারে। ইহার কারণ হ্যাভলক্ এলিসের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"পুরুষের কণ্ঠে যতটা পৌরুষ আছে, নারীর কণ্ঠে ততটা নারীত্ব নাই।" ইহার অর্থ এই যে, যৌবনাগমে পুরুষের কণ্ঠে যে পরিবর্ত্তন আসে, নারীর কণ্ঠে সেরূপ কোনও পরিবর্ত্তন আসে না।

এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহাদের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইন্দ্রিয়। তাহাদের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মানুষের মধ্যেও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান নগণ্য নহে। ইহার কারণ এই যে মস্তিষ্কের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

যৌনবোধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়

আমাদের মনোবৃত্তির উপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাব কতটুকু তাহা আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সুগন্ধ হইতে আমাদের মানসিক প্রফুল্লতা ও তাহা হইতে আমাদের শারীরিক পরিবর্ত্তন, এবং দুর্গন্ধ হইতে আমাদের

মানসিক বিষণ্ণতা ও তাহা হইতে আমাদের শারীরিক পরিবর্ত্তন, এই সমস্ত ব্যাপার হইতে আমরা আমাদের শরীর ও মনের উপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাবের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারি।

মন ও শরীরের উপর ঘ্রাণশক্তির এই প্রভাব বশতঃই আমাদের যৌনবোধের উপর উহার প্রভাব অতি সহজ হইয়াছে। ঘ্রাণশক্তি দ্বারা যৌনবোধকে প্রভাবান্বিত করা প্রকৃতির সুনির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায়। হিপোক্রাটিস্ (Hippocratis), মনিন (Monin) ও ভেঞ্চুরীর (Venturi) অভিমত এই যে, মানুষের ঘ্রাণশক্তি ও তাহার শরীরের গন্ধ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে ; এবং মানুষের যৌনবোধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিপরীত লিঙ্গের যৌবনশক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে।

এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে অতিশয়োক্তি বা পরীক্ষাক্ষেত্র-সুলভ সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে. কিন্তু এটা অস্বীকার করিবার কোনও বিজ্ঞানসম্মত কারণ নাই যে, নাসিকার সহিত যৌনবোধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। ইহার দৈহিক কারণ এই যে, নাসিকার সহিত মস্তিষ্কের সুতরাং সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ঘনিষ্টতা রহিয়াছে। অবশ্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ যৌনব্যাপারে ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা ততটা প্রভাবান্বিত নহে, তথাপি আমরা ইহা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, এমন অনেক গন্ধদ্রব্য আছে যাহা দ্বারা আমাদের যৌনবোধের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রিয়জনের শরীর ও পোষাকের গন্ধ যেমন প্রিয়, অ-প্রিয়জনের শরীর ও পোষাকের গন্ধও তেমনই অপ্রিয়। তখন আমরা একথাও মানিয়া লইতে বাধ্য যে, যৌনবোধের উপর যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাব বিদ্যমান, তেমনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপরও যৌনবোধের

যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান আছে। ইহাতে তবু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ামাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত আমাদের যৌনবোধের অনেকখানি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

এখন প্রশ্ন এই—যৌনবোধের প্রকৃতি কি ?—ইহা প্রধানতঃ শারীরিক না মানসিক ? ইহার উত্তর আভাষে আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। জটীল তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ইহা বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের যৌনবোধ গোড়াতে মানসিক, মধ্যভাগে শারীরিক ও উপসংহারে বিশেষাঙ্গিক। একথা বলিবার কারণ এই যে, গোড়াতে সে কোনও বিশেষ স্থানে বা অঙ্গে ঐ বোধের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে না। অথচ সে বোধটা কতই না তীব্র ! তৎপর ক্রমে যখন তাহার সমস্ত শরীরে উত্তেজনা আসে, যখন বিপরীত লিঙ্গের আসঙ্গলিপ্সা তাহার মনে তীব্র হয়, তখন তাহার যৌন-অঙ্গও উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনা হেতু তখনকার অনুভূতিকে শারীরিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহা তখনও সুনির্দ্দিষ্টভাবে আঙ্গিক নহে। পরবর্ত্তী আঙ্গিক মিলনহেতু যখন উভয়ের উত্তেজনা বাড়িতে থাকে, তখন স্নায়বিক ও মানসিক সমস্ত যৌন-বোধ শরীরের বিশেষ-বিশেষ অঙ্গে আসিয়া সীমাবদ্ধ হয়। রতিক্রিয়ায় ইহাই ত্বকের বিশেষ সংস্রব। যৌনবোধ গোড়াতে মানসিক বলিয়াই. রতিক্রিয়ার আয়োজন শৃঙ্গারের দ্বারা করিতে হয়। উভয়ের মনকে রতিক্রিয়ায় নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের দেহকে উক্ত কার্য্যের উপযোগী করিবার প্রক্রিয়াকে শৃঙ্গার (physical courtship) বলা হয়। শৃঙ্গার রতিক্রিয়া-রূপী বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকামাত্র। এবিষয়ে পরবর্ত্তী কোনও এক অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

যৌনবোধের প্রকৃতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

রতিক্রিয়া যতক্ষণ স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাপারমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ উহাতে পৈশিক অঙ্গচালনা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু শৃঙ্গারাদি সমস্ত প্রাথমিক কার্য্য সাধিত হইলে পর রতিক্রিয়ার পৈশিক অধ্যায় আরম্ভ হয়। কিন্তু পৈশিক অঙ্গ চালনার অনেকখানির সহিত মানুষের ইচ্ছার কোনও সংস্রব নাই। রতিক্রিয়ার এই স্তরের অঙ্গচালনা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতঃ, এই স্তরের পৈশিক গতিভঙ্গি মানুষের ইচ্ছাশক্তির শাসন অমান্য করিয়াই চলিয়া থাকে।

রতিক্রিয়া প্রধানতঃ দুই প্রকারে দৈহিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত করিয়া থাকে। ইহার একটী রক্তসঞ্চালন-ঘটিত; অপরটি শ্বাস-প্রশ্বাস-ঘটিত।

রতিক্রিয়ার দৈহিক প্রতিক্রিয়া

রতিক্রিয়ায়, বিশেষ করিয়া উত্তেজনার চরম মুহূর্ত্তে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানব-দেহে রক্তের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিণ্ডের গতি অতিশয় দ্রুত হয়, শিরাসমূহ ফুলিয়া উঠে। দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়ভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসক্ষরণ হইতে থাকে।

নারী-অঙ্গেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে। জরায়ুর মুখ খানিকটা উন্মুক্ত হইয়া উহা বস্তি প্রদেশে খানিকদূর নামিয়া আসে। যোনিপ্রাচীরের বিভিন্ন রসগ্রন্থি হইতে ক্রমাগত রসক্ষরণ হইতে থাকে। ইহার পরই সুরতকদ্বয়ের দৈহিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রতিক্রিয়ার চরম অবস্থায় সুরতকের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হয় এবং রক্তের চাপ বর্দ্ধিত হয়। শুক্রক্ষরণের পর ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। পক্ষান্তরে রক্তের চাপ দ্রুত

গতিতে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়। হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি হঠাৎ স্বাভাবিকতার মাত্রা ডিঙ্গাইয়া অতিমাত্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

নারী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যেই এই বিপর্য্যয় অধিকতর সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যৌন-উত্তেজনা পুরুষের মধ্যে যেমন ঝড়ের বেগে আসিয়া থাকে, তেমনই ঝড়ের বেগে তিরোহিত হয়। ফলে পুরুষের স্নায়ুমণ্ডলে যৌন-উত্তেজনা যতখানি বিপ্লব সৃষ্টি করে, নারীর স্নায়ুমণ্ডলে ততখানি করে না।

ক্লান্তিনাশক নিদ্রা

যৌন-উত্তেজনার এই সমস্ত প্রাকৃতিক ও অবশ্যম্ভাবী দৈহিক শ্রান্তি, ক্লান্তি ও গ্লানি মোচন করিবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতিই এক সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা নিদ্রা। রতিক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে সুরতকদ্বয়ের উভয়ে এক দুর্নিবার অথচ সুখদায়ক সুষুপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। স্বাস্থ্য-ঘটিত কল্যাণের খাতিরে সুরতকদ্বয়ের উভয়ের বিশেষতঃ পুরুষের এই সুষুপ্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা অত্যাবশ্যক। কারণ সুরতক্রিয়ার পরবর্ত্তী এই নিদ্রা অবসাদ-নাশক মহৌষধি বিশেষ। এই নিদ্রা সুরতকদ্বয়ের সমস্ত দৈহিক ক্লান্তি ও গ্লানি নিশ্চিহ্নরূপে দূরীভূত করিয়া থাকে।

উপরে যৌনবোধ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহার দৈহিকতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। কিন্তু যৌনবোধের মানসিক রূপও উপেক্ষণীয় নহে। আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, মনের সহিত যৌনবোধের প্রতিক্রিয়া-গত সম্বন্ধ উহার দৈহিক সম্বন্ধের চেয়েও অধিকতর ঘনিষ্ট। এ সম্বন্ধে আমরা এখানে মনোবিজ্ঞানের কতিপয় তত্ত্বের আলোচনা করিতে চাই।

যৌনবোধের 'বোধ' শব্দটী হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহা প্রধানতঃ মানসিক ব্যাপার। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা সমূহ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে উহারা জ্ঞানে পরিণত হয়। যৌন-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও অবিকল উহাই সত্য। যৌন-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাও আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে আমরা পুলক অনুভব করিয়া থাকি। মস্তিষ্কই আমাদের মনের পীঠস্থান। সুতরাং আমাদের যৌনবোধ মূলতঃ মানসিক।

যৌনবোধের মানসিকতা

নিম্ন স্তরের প্রাণীজগতেও ইহা সত্য। যদিও উহাদের মধ্যে রতিক্রিয়ায় মন অপেক্ষা শরীরের কার্য্য অধিকতর সুস্পষ্ট ; তথাপি একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশুপক্ষীর মধ্যেও নারীর পশ্চাতে পুরুষকে যে ভাবে ঘুরিয়া ফিরিতে দেখা যায়, এবং একই নারীর জন্য একাধিক পুরুষকে যে ভাবে সংগ্রাম করিতে দেখা যায়, উহাকে কোনও মতেই নিছক দৈহিক ব্যাপার মাত্র বলা যাইতে পারে না।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, মানুষের যৌনবোধ যেমন দৈহিক তেমনই মানসিক। সুতরাং ইহার প্রত্যেকটী প্রতিক্রিয়াও দৈহিক এবং মানসিক হইয়া থাকে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারি যে, প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই আমাদের মনের উপর কোন না কোনও প্রকারের অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই অনুভূতির কতকগুলি আমাদের প্রিয় এবং কতকগুলি অপ্রিয় হইয়া থাকে। প্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদিগকে আনন্দ এবং অপ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বিরক্তি দান করিয়া থাকে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা শুধু ঘটনার সময়েই যে

আমাদিগকে আনন্দ ও বিরক্তি দান করিয়া থাকে, তাহা নহে; উহাদের স্মৃতিও আমাদিগকে আনন্দ ও বিরক্তি দান করিয়া থাকে। কারণ মানুষের মন স্মৃতিফলক বিশেষ। এই ফলকে ইন্দ্রিয়-গৃহিত সমস্ত অভিজ্ঞতা খোদিত থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আনন্দের অভিজ্ঞতা আমাদের অধিকতর প্রিয়। সেইজন্য আমাদের আনন্দের অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃ অধিকতর সুস্পষ্টভাবে আমাদের মনের স্মৃতিফলকে লিপিবদ্ধ থাকে।

যৌন-অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতার মধ্যে তীব্রতম। সুতরাং মনের উপর উহার ছাপও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট। এইভাবে আনন্দের স্মৃতি যেমন আমাদের মানসচক্ষের সম্মুখে আনন্দদায়ক ক্রিয়া সমূহ সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া তুলে, তেমনই আনন্দদায়ক ক্রিয়াবিশেষের চাক্ষুষ দর্শনও আমাদের পূর্ব্বলব্ধ আনন্দ-অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত রসের উদ্রেক করিয়া থাকে। এই রসবোধের জাগরণ আমাদিগকে সেই আনন্দদায়ক কার্য্য পুনঃ সম্পাদনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের আনন্দবোধ আমাদের ইন্দ্রিয়-গৃহিত অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমাদের আনন্দবোধ অতিশয় সীমাবদ্ধ হইত। মানুষের মন শুধু আনন্দ-ভোক্তা নয়, আনন্দ-স্রষ্টাও বটে। লব্ধ অভিজ্ঞতার তুলনা, সমালোচনা, সংযোজন ও বিয়োজন দ্বারা মানবমন কল্পনায় নিত্য-নূতন আনন্দচ্ছবি অঙ্কিত করিতে সক্ষম। এই সৃষ্টিনৈপুণ্যবলে মানবমন নিত্য-নূতন আনন্দপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করতঃ মানুষের ভোগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

যৌন-জীবনেও মনের এই সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ, যৌন-জীবন যদিও মানুষের ভোগ-জীবনের সবটুকু নহে, তথাপি

ইহা যে মানুষের ভোগ-জীবনের প্রধানতম অংশ, একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

যৌন-জীবনের ভোগ-প্রক্রিয়া সমূহের অনেকগুলিকে নীতিবাদীরা যৌন-বিকল্প বলিয়া নিন্দা করিলেও উহা যে মানুষের সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত প্রক্রিয়া মানবমনের এমনতর তীব্র বাসনার ফল যে, নানা প্রকার কঠোর ব্যবস্থা দ্বারাও ঐ সমস্ত বিকল্প দূর করা সম্ভব হয় নাই।

ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, মানুষের যৌনবোধ তীব্র মানসিক ব্যাপার এবং বহির্জ্জাগতিক প্রভাব বিস্তারের দ্বারা মনোজগতের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করা একরূপ অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই ধর্ম্মের চোখরাঙ্গানি, বিবেকের দোহাই, শাসনের ভীতি, কিছুই মানবমনের স্বাভাবিক সৃষ্টিনৈপুণ্যকে পঙ্গু করিতে পারে নাই। কিন্তু মনের শাসন ও মনের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে কেবল মনই। মানুষ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তাহার সমস্ত বৃত্তিকে সংযত ও সুপরিচালিত করিতে পারে। মানুষের যৌনবোধ তাহার মানসিক বৃত্তি; সুতরাং তাহার এই বৃত্তিকেও সংযত ও সুপরিচালিত করিতে হইবে তাহার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা—বাহ্য বা দৈহিক শাসনের দ্বারা নহে। শারীরিক বলপ্রয়োগে মানুষের অনেক মানসিক বৃত্তিকে আমরা শৃঙ্খলিত রাখিতে পারি একথা সত্য; কিন্তু শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা এক কথা, আর সুপরিচালিত করা সম্পূর্ণ আর এক কথা। আমরা শাসনের পক্ষপাতী নহি, আমরা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। আমরা বিশ্বাস করি, স্রষ্টা অনাবশ্যকরূপে মানুষের মধ্যে কোনও বৃত্তিই সৃষ্টি করেন নাই।

যৌন-বিজ্ঞান

আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় করিতে হইলেও আমাদের যৌন-বোধের মানসিকতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ যৌন-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, দম্পতির মনের উপর কি ভাবে ক্রিয়া করিবে, উভয়েরই সে জ্ঞান সম্যকভাবে থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

যৌন-ইন্দ্রিয়

যৌন-ইন্দ্রিয়—পুরুষের শিশ্ন—শিশ্নাগ্র—অণ্ডকোষ—বস্তিপ্রদেশ—প্রষ্টেট গ্রন্থি—শুক্রকোষ—কাউপার গ্রন্থি—নারীর যৌন-অঙ্গ—ভগপ্রদেশ—ভগাঙ্কুর—বৃহদোষ্ঠ—ক্ষুদ্রোষ্ঠ—যোনিপথ—জরায়ু—অণ্ডবাহী নল—অণ্ডাধার—সতীচ্ছদ—শুক্র—শুক্রকীট—ডিম্ব—স্তন।

প্রাণীজগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই পুরুষ ও নারী এই দুইটী যৌন শ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই দুই শ্রেণীর যৌনমিলনেই সৃষ্টিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। পুরুষ ও নারী বিচার করিবার উপায় প্রধানতঃ তাহাদের যৌন-ইন্দ্রিয়ের প্রভেদ। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষের মধ্যেও এই যৌন-ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানার্থিগণের পক্ষে যৌনজ্ঞান লাভের সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়ে যৌন-ইন্দ্রিয় সমূহের মোটামুটি পরিচয় প্রদান করিতেছি।

যৌন-ইন্দ্রিয়

পুরুষের যৌন-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষই প্রধান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের আবার শিশ্নাগ্র, প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি, শুক্রকোষ প্রভৃতি কতিপয় উপাঙ্গ আছে।

নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, ইহা নরদেহের জননেন্দ্রিয়-প্রধান অংশের লম্বমানভাবে ছেদিত অংশ। উহাতে পুরুষের যৌন-অঙ্গসমূহের পারস্পরিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইবে। নারীর যৌন-অঙ্গের আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালী হইতে পুরুষের যৌন-অঙ্গের আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালীর কত পার্থক্য, এই ছবির

—পুরুষের

সহিত পরবর্ত্তী নারী-যৌন-অঙ্গের ছেদিত আভ্যন্তরিক ছবির সহিত তুলনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

১নং চিত্র
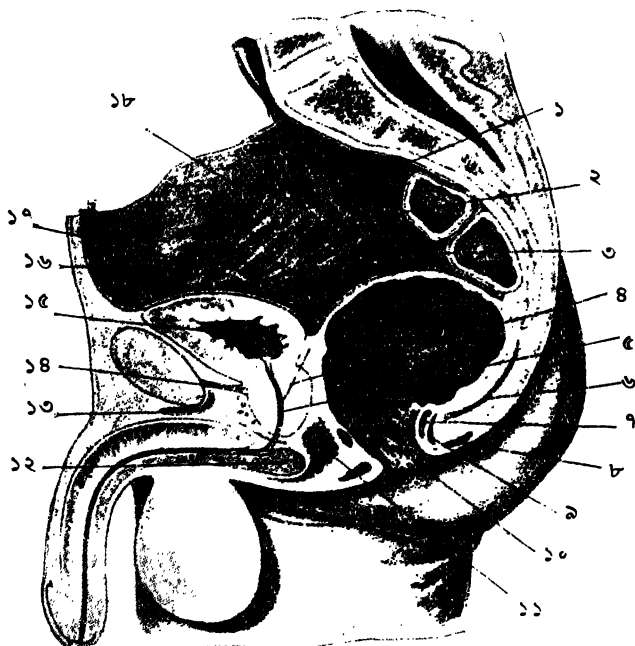
১। ঔদরিক ধমনী, ২। মূত্রবাহীনল, ৩। রোধক ধমনী, ৪। নির্গম নল, ৫। প্রষ্টেট মূত্রনালী, ৬। পেশী উত্তোলক মধ্যবর্ত্তী উপাদান, ৭। বাহ্যরোধক পেশী, ৮। আভ্যন্তরিক রোধক পেশী, ৯। শঙ্খাবর্ত্তাবরক পেশী, ১০। সরলান্ত্র, ১১। পেরি নিয়মের কেন্দ্র, ১২। মূত্রনালীর কপাট, ১৩। পৃষ্ঠাবলম্বী লিঙ্গ-শিরা, ১৪। প্রষ্টেট বন্ধনী, ১৫। মূত্রাধার, ১৬। নাভিরজ্জুর পার্শ্ববন্ধনী ১৭। বহির্মুখী নল, ১৮। বাহ্য বস্তি-শিরা।

তৃতীয় অধ্যায়

পুরুষের লিঙ্গ প্রস্রাব নির্গমনের পথ হইলেও ইহা প্রধানতঃ সঙ্গম-যন্ত্র। সঙ্গমযন্ত্রের উপযোগী করিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছেন। পুরুষের শিশ্ন উহার স্বাভাবিক অবস্থায় তিন হইতে চারি ইঞ্চি লম্বা এবং দুই হইতে আড়াই ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা শিথিল ভাবে ঝুলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও অস্থি বা পেশী না থাকায় ইহা অতিশয় কোমল। ইহা প্রধানতঃ শিরা, উপশিরা, তন্তু ও স্নায়ুর দ্বারা গঠিত। নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, উহা আড়া-আড়ি ভাবে ছেদিত লিঙ্গের ছবি। উহাতে দেখা যাইবে যে লিঙ্গ-আবরক চর্ম্মের অভ্যন্তরভাগ তিনটী কুঠরীতে বিভক্ত। এই তিনটী কুঠরীই রক্তবাহী উপাদান সমূহের সমষ্টি মাত্র। উপরিভাগে স্পঞ্জের ন্যায় যে দুইটী যুক্ত কুঠরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহারা প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য রক্তবাহী উপাদানের সমষ্টি মাত্র। উহারা সঙ্কোচন-সম্প্রসারনশীল কতকগুলি স্নায়বিক ও পৈশিক তন্তুদ্বারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। উহাঁদের নিম্নে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি স্পঞ্জসদৃশ যে কুঠরীটী দৃষ্ট হইতেছে, উহাও রক্তনালীর সমষ্টিমাত্র। উহার মধ্যস্থলে যে ছিদ্রটী দেখা যাইতেছে উহাই মূত্রনালী।

শিশ্ন

উত্তেজনার সময় লিঙ্গের এই সমস্ত অসংখ্য রক্তবাহী উপাদান সমূহে শোণিত-সঞ্চাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গের আয়তন ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। বিটপ নামীয় পেশী লিঙ্গের এই উত্থান ও দৃঢ়তা সংরক্ষিত করে। উত্থানাবস্থায় লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ছয় হইতে সাত ইঞ্চি এবং পরিধি আড়াই হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার আগাগোড়া আয়তন প্রায় সমান, তবে অগ্র ও পশ্চাৎভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত

মোটা ও দৃঢ় হইয়া থাকে। লিঙ্গ বাহির হইতে দেখিতে দৈর্ঘ্যে মাত্র তিন চারি অঙ্গুলি হইলেও, আসলে উহা অনেক বেশী লম্বা। উহা শিরাকারে পশ্চাদ্দিকে প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া গুহ্যদ্বারের সম্মুখ দিয়া মূত্রাধারে শেষ হইয়াছে।

২নং চিত্র
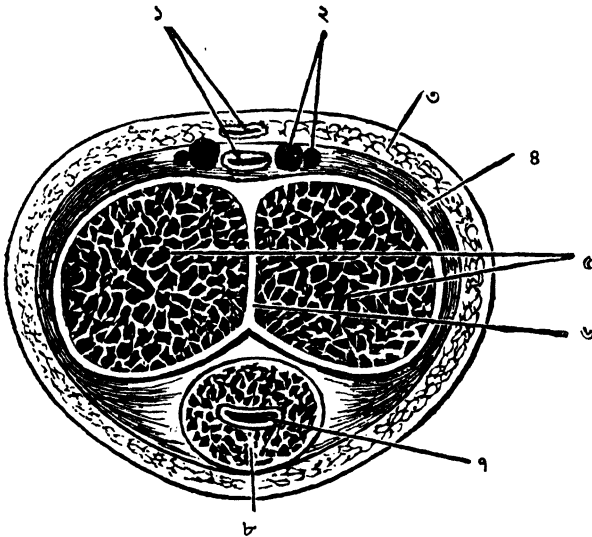
১। পৃষ্ঠাবলম্বী লিঙ্গশিরা ২। পৃষ্ঠাবলম্বী ধমনীও স্নায়ু ৩। চর্ম্ম, ৪। তান্তব আবরণ ৫। রক্তবাহী নলসমষ্টি ৬। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ৭। মূত্রনালী ৮। মূত্রনালী-বেষ্টক রক্তবাহী নলসমষ্টি।

লিঙ্গের অগ্রভাগকে শিশ্নাগ্র কহে। ইহা শৈশবে ত্বক দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছাদিত থাকে। বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ত্বক ক্রমে সঙ্কুচিত

হইয়া যায় এবং বর্দ্ধিত শিশ্নাগ্র আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না।

শিশ্নাগ্র

তখন শিশ্নাগ্র স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশতঃ এবং উত্তেজিত অবস্থায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। শিশ্নাগ্র-ভাগ অতিশয় স্পর্শশীল কোমল তন্তু-সমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় কোমল ও মসৃন ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত। ইহা ঈষৎ গোলাকার। সমস্ত শিশ্নাগ্রভাগটী একটী কোমল ও স্বচ্ছ ত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত।

শিশ্নাগ্রভাগের মস্তকের ছিদ্রটি মূত্র ও শুক্র নির্গমনের পথ। লিঙ্গ মুণ্ডের এক ইঞ্চি পশ্চাতে ঈষৎ সরু হইয়া লিঙ্গাবরক ত্বকের সহিত মিশিয়া আবার মোটা হইয়াছে। এই সরু অংশের নাম লিঙ্গ-গ্রীবা। গ্রীবার অগ্রভাগে লিঙ্গের মুণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিধিবিশিষ্ট এবং বর্ত্তুলাকার। সুতরাং লিঙ্গমণির গঠনপ্রণালী হইতে দেখা যাইতেছে, পুরুষের লিঙ্গ রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে।

লিঙ্গের মূলদেশের নিম্নে একটী চামড়ার থলি আছে। এই থলির মধ্যে দুইটী ঈষৎ গোলাকার মাংসগ্রন্থি আছে। এই মাংস-

অণ্ডকোষ

গ্রন্থিদ্বয়কে অণ্ডকোষ বলা হইয়া থাকে। অণ্ডকোষ-দ্বয়ের প্রত্যেকটী স্বভাবতঃ দুই ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি প্রশস্ত ও আড়াই ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডকোষ সাধারণতঃ সুস্থতার লক্ষণ নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় অণ্ডকোষদ্বয় থলির মধ্যে দুই হইতে আড়াই ইঞ্চি ঝুলিয়া থাকে। অত্যধিক শীত লাগিলে থলিটী সঙ্কুচিত হয় এবং উহারা লিঙ্গের উভয় পার্শ্বে বস্তিকোঠরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

স্থূলদৃষ্টিতে এই অণ্ডকোষদ্বয় মানুষের শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক

বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অণ্ডকোষদ্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। এই অণ্ডকোষদ্বয় অসংখ্য রক্তবাহী শিরা ও পর্দাকোষপূর্ণ নলিকা দ্বারা গঠিত। এই সমস্ত নলিকায় শুক্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অণ্ডকোষস্থ এই সমস্ত নলিকায় শুক্রকীট সৃষ্টি হইয়া অণ্ডকোষের উপরিস্থ দুইটী থলিতে চলিয়া আসে। এই থলিদ্বয়কে শুক্রকোষ বলা হইয়া থাকে। ফলতঃ অণ্ডকোষদ্বয়ই শুক্রোৎপাদনের উৎস। পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয়কে নারীর ডিম্বাধারদ্বয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অণ্ডকোষদ্বয় স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে তাহাতে পুরুষের মধ্যে শুক্রের, সুতরাং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার, অল্পতা ও হীনতা সূচিত হইবে।

বস্তিপ্রদেশ

নাভীর তলদেশে উরুদ্বয়ের সংযোগ স্থলে যেখানে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ সংলগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে বস্তিপ্রদেশ বলা হয়। যৌবনাগমে ঐ স্থানে কেশোদ্গম হইয়া থাকে।

শুক্রকোষ

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অণ্ডকোষে শুক্র উৎপাদিত হইয়া ঊর্দ্ধ-দেশে উত্থিত হয় এবং শুক্রকোষ নামক কোষদ্বয়ে আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই কোষদ্বয় মূত্রাধারের নিম্নে উহার গা ঘেঁসিয়া অবস্থিত। এই কোষদ্বয়ে শুক্র সঞ্চিত থাকা ব্যতীত এক প্রকার তরল রসও উৎপন্ন হয়। এই রস ঈষৎ পিচ্ছিল বলিয়া উহার সহিত শুক্র মিশ্রিত হইয়া শুক্রও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

প্রষ্টেট গ্রন্থি

মূত্রাধারের নিম্নে শুক্রকোষের সমান্তরালে মূত্রনালীর অপর পার্শ্বে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দেড় ইঞ্চি লম্বা আর একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থির নাম মূত্রশায়ী গ্রন্থি বা প্রষ্টেট গ্রন্থি। এই গ্রন্থি যে মানব-শরীরের কি কাজে লাগে, চিকিৎসাবিদ্‌গণ আজিও

তাহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে স্থির করিতে পারেন নাই। তবে মোটামুটি ইহা বুঝা গিয়াছে যে, ইহার অবস্থিতি শুক্র নির্গমন রোধ করে বলিয়া শুক্র-স্খালনে পুরুষ এতটা পুলকাবেগ অনুভব করে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থি হইতে এক প্রকার শ্বেত রস নিসৃত হইয়া থাকে। ঐ রস মূত্র-নালীকে পিচ্ছিল করিয়া দেয় বলিয়া শুক্র নির্গমনে পুরুষ কোনও প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করে না।

কাউপার গ্রন্থি

মূত্রনালীর নির্গম পথের সম্মুখে বাদামের মত ক্ষুদ্রাকৃতি যে দুইটী গ্রন্থি অবস্থিত আছে, উহাদিগকে কাউপার গ্রন্থি বলা হয়। এই গ্রন্থিদ্বয় হইতেও প্রষ্টেট রস ও শুক্রকোষ-নিস্রাবের ন্যায় এক প্রকার তরল স্রাব নির্গত হয়। এই স্রাবও শুক্র নির্গমনের সুবিধার জন্যই হইয়া থাকে।

নারী-যৌন-অঙ্গ

স্ত্রীলোকের যৌন-ইন্দ্রিয়কে নিম্ন লিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারেঃ ভগ, যোনি, জরায়ু, ডিম্ববাহী নল ও ডিম্বাধার। নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইল, উহা নারীর যৌন-প্রধান দেহাংশের লম্ববান ছেদিত অংশ। এই ছবি হইতে নারীদেহের যৌন-অঙ্গ সমূহের আভ্যন্তরিক অবস্থিতির পারস্পরিকতা বুঝা যাইবে।

কামাদ্রি

ভগদেশকে আবার নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারেঃ কামাদ্রি, ভগাঙ্কুর, বৃহদোষ্ঠ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ। তলপেটের নিম্নাংশে যেখানে বস্তিকোঠরের অস্থিদ্বয় সংযোজিত হইয়াছে, এবং যে স্থান জুড়িয়া যৌবনে কেশোদ্গম হইয়া থাকে, উহাকে কামাদ্রি বলিয়া থাকে। উহার নিম্নাংশে যোনির ফাটলের প্রারম্ভেই ক্ষুদ্রোষ্ঠের সংযোগস্থলে যে মাংসাঙ্কুর আছে, উহাকে

ভগাঙ্কুর

ভগাঙ্কুর বলা হইয়া থাকে। নারীর ভগদেশে যৌবনে যে কেশোদ্গম হইয়া থাকে, উহা পুরুষের যৌন-কেশের ন্যায় ঘন ও শক্ত নহে। স্ত্রীলোকের ভগাঙ্কুরের সহিত

৩নং চিত্র
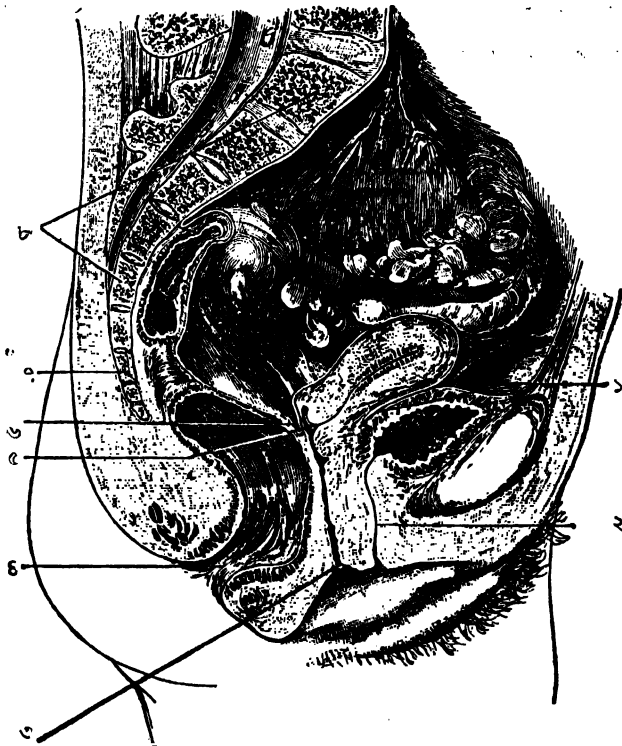
১। মুত্রাশয়, ২। মুত্রনালী, ৩। যোনিমুখ, ৪। গুহ্যদ্বার, ৫।৬ জরায়ুমুখ, ৭।৮ শয্যাবর্ত্ত।

পুরুষের লিঙ্গের অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভগাঙ্কুরের গঠন ও প্রকৃতি কতকটা পুরুষের শিশ্নাগ্রের মত। তবে স্নায়ুর আধিক্যহেতু এই স্থানটী পুরুষের লিঙ্গ অপেক্ষা অনেক বেশী স্পর্শ-ও-উত্তেজনা-শীল।

বৃহদোষ্ঠ স্ত্রীলোকের সমস্ত যোনি-পথটী ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বৃহদোষ্ঠের ভিতরে পুনরায় দুইটী ক্ষুদ্র ঠোঁট দ্বারা যোনি-মুখ আবৃত। এই দুইটী ঠোঁটকেই ক্ষুদ্রোষ্ঠ বলা হয়। বৃহদোষ্ঠের জন্যই স্ত্রীলোক স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াইলে তাহার যোনিপথ দৃষ্টিগোচর হয় না।

বৃহদোষ্ঠ ও ক্ষুদ্রোষ্ঠ

ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিলে স্ত্রীলোকের যোনিমুখ দৃষ্ট হয়। যোনিমুখ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট যে একটী নল আছে এই নলটীকেই যোনিপথ বলা হইয়া থাকে। এই নলটী সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল পেশীসমূহ দ্বারা এমন ভাবে গঠিত যে, ইহাকে চাপ দিয়া অনেক খানি বড় করা যাইতে পারে। সন্তান প্রসবের সময় ইহা পরিধিতে প্রায় ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত হইতে পারে। যোনিপথ জরায়ুতে গিয়া শেষ হইয়াছে। কারণ যোনিপথের প্রয়োজনীয়তাই হইতেছে পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে বহন করা।

যোনিপথ

জরায়ু বস্তিকোঠরে ঝুলায়মান একটী থলে। ইহার আকার দেখিতে ঠিক পেঁপের মত। ইহার গলা সরু এবং পেট মোটা। ইহার মুখ নিম্ন দিকে যোনিপথের সহিত মিশিয়াছে। ইহা পেটের দিকে প্রায় ৪ ইঞ্চি মোটা। ইহা এমন সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল তন্তুদ্বারা গঠিত যে, গর্ভাবস্থায় ইহা বাড়িয়া স্বাভাবিক অবস্থার

জরায়ু

ছয় হইতে আট গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রসবের পরে ৪০ দিনের মধ্যে ইহা আবার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। তবে সম্পূর্ণভাবে প্রসবের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। জরায়ুর ভিতরভাগের গাত্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত।

জরায়ুর উভয় পার্শ্বে ঈষৎ উচ্চে দুইটী গ্রন্থি আছে। ইহাদের আকার দুইটী বৃহৎ বাদামের মত, দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চির বেশী হইবে না। ইহাদিগকে

ডিম্বাধার

ডিম্বাধার বলা হয়। এই ডিম্বাধারদ্বয়ের অনতিদূরে দুইটী নল দুইদিক হইতে জরায়ুতে মিলিত হইয়াছে। ডিম্বাধারের নিকট ইহাদের মুখ ফুটা ফুলের মুখের মত শাখা

ডিম্ববাহী নল

বিশিষ্ট এবং ইহারা দৈর্ঘ্যে চারি ইঞ্চির অধিক হইবে না। ইহাদিগকে ডিম্ববাহীনল বা ফ্যালুপিয়ান টিউব বলা হয়। (৫নং ছবি দ্রষ্টব্য)

যোনিমুখের সামান্য পশ্চাতে ঝিল্লীর পাতলা একটী পর্দ্দাদ্বারা যোনি-মুখ আবৃত থাকে। যৌবনাগমে প্রথম সঙ্গমের দ্বারা কিম্বা অন্য কারণে

সতীচ্ছদ

ইহা ছিঁড়িয়া যায়। ইহাকে সতীচ্ছদ বলা হয়। ইহার নাম সতীচ্ছদ দিবার কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বকালে এই পর্দ্দাকে সতীত্বের নিদর্শন মনে করা হইত। এই পর্দ্দা যোনিমুখ সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে, তবে রক্তস্রাব বাহির হইবার জন্য সামান্য একটী ছিদ্র থাকে। এই আবরণ ছিন্ন না করিয়া পুরুষের লিঙ্গ কিছুতেই নারীর যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং কোনও নারীর সতীচ্ছদ ছেঁড়া থাকিলে সে পুরুষের সঙ্গম করিয়াছে এমন মনে করা একেবারে অন্যায় নহে। কিন্তু কথা এই যে, পুরুষের লিঙ্গ প্রবেশ

ব্যতীত অন্য কারণেও সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে পারে এবং প্রায়শঃই হইয়া থাকে। যাহাদের সতীচ্ছদ খুব পাতলা, বাল্যের লম্ফন কুর্দ্দনেই তাহাদের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া যায়। লম্ফন-কুর্দ্দনে যাহাদের সতীচ্ছদ না ছিঁড়ে, অন্য কারণে তাহাদের সতীচ্ছদ ছিঁড়িতে পারে। শৈশবে অজ্ঞাতসারে যোনি চুলকাইতে চুলকাইতে কিম্বা হস্তমৈথুনে বালিকাদের সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে পারে। সতীচ্ছদের অবিদ্যমানতা নারীর অসতীত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। কোনও কোনও নারীর সতীচ্ছদ এত পুরু ও শক্ত যে, পুরুষের লিঙ্গ ঘর্ষণেও তাহা কিছুতেই ছিন্ন হয় না। উহাদের পক্ষে সঙ্গম করাও সম্ভব নহে। সেজন্য অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা তাহাদের সতীচ্ছদ ছিন্ন করিয়া লিঙ্গ প্রবেশের পথ করিয়া লইতে হয়।

শুক্র।

শুক্র শ্বেতবর্ণ, ঘন, আঁঠালো রস বিশেষ। শুক্র সম্বন্ধে বৈদিক মত এই যে, ইহা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের ষষ্ঠ রূপ, অর্থাৎ আমাদের খাদ্যকে শুক্রে রূপান্তরিত হইতে মধ্য পথে পাঁচবার পরিপাক হইতে হয়। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, খাদ্য-দ্রব্যের দ্বিতীয় রূপ রস, তৃতীয় রূপ চর্ব্বি, চতুর্থ রূপ অস্থি, পঞ্চম রূপ মজ্জা এবং ষষ্ঠ রূপ শুক্র। সুতরাং, শুক্র যে আমাদের দেহের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় পদার্থ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রে শুক্র মানুষের জীবন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শরীরের সমস্ত উপাদানের মধ্যে শুক্রই যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় বিভিন্ন চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোনও মতভেদ নাই। আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী শাস্ত্র এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, খাদ্যদ্রব্য চতুর্থ বার পরিপাক

হইয়া মস্তিষ্কের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে এবং মেরুদণ্ডের উপরিভাগ হইতে মেরুদণ্ড বাহিয়া মুত্রাশয়ের এবং তথা হইতে শিরার সাহায্যে অণ্ডদ্বয়ে প্রবেশ করিয়া পঞ্চম পাকে শ্বেতবর্ণ শুক্রে পরিণত হয়। শুক্র লিঙ্গপথে বাহির হইবার পূর্ব্বে লিঙ্গ-নালীর মুখশায়ী গ্রন্থি-রসের দ্বারা সিক্ত হয় বলিয়া শুক্রের পথ অতি সহজ হয়। মুখশায়ী গ্রন্থি মুত্রাধারের সন্নিকটে মুত্রনালীর দুই পাশ হইতে মুত্রনালীকে চাপিয়া রাখিয়াছে। শুক্র বাহির হইবার সময় এই গ্রন্থিদ্বয়ের চাপ ঠেলিয়া আসে বলিয়াই শুক্র নির্গমনে এমন পুলক অনুভব করা সম্ভব হয়। মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে যে রস শুক্রের পূর্ব্বে বহির্গত হইয়া মুত্রনালীকে সিক্ত ও পিচ্ছিল করে, ঐ রসের ইউনানী নাম "মজি"। "মজি" অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। শুক্র অতিশয় রুক্ষ পদার্থ এবং ইহা অতিশয় উষ্ণও বটে। সুতরাং শুক্র নির্গমনের পূর্ব্বে মুখশায়ী গ্রন্থিরস বা "মজি" লিঙ্গনালী সিক্ত করিয়া না দিলে শুক্র নির্গমনে আমরা পুলক বোধ করিতাম না বরং মুত্রনালীতে জ্বালা বোধ করিতাম। ইহাই হইল শুক্র সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের অভিমত।

এ সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত এই যে, শুক্র অণ্ডকোষ, শুক্রকোষ, প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি এবং অন্যান্য কয়েকটী গ্রন্থি-নিস্থত রসের সমষ্টি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু শুক্র বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বিদ্যমান। দৈর্ঘ্যে ইহার এক একটি কীট ১/৫০০০০ হইতে ১/৬০০০০ মিলিমিটার। এই সমস্ত অসংখ্য কীট-দেহ, মস্তক, মধ্যভাগ ও লেজ, এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহারা যতক্ষণ

অণ্ডকোষ বা এপিডাইডেমিসে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ উহাদের কোনও জীবনী-শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যখনই উহারা অণ্ডকোষ ও এপিডাইডেমিস্ হইতে বহির্গত হইয়া শুক্র-কোষের দিকে ধাবিত হয়, তখনই উহাদের জীবনী-শক্তি ও গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তখনই উহারা পরিপক্ক হয়। উহারা লেজের সাহায্যে চলিয়া থাকে (৪নং চিত্র)। পুরুষের

শুক্র-কীট

৪নং চিত্র
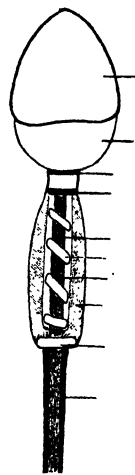
(ক) সম্মুখ দৃশ্য (খ) পার্শ্ব দৃশ্য (গ) বহুগুণ বর্দ্ধিত আকারের দৃশ্য
১। মস্তকাবরক অনুসমষ্টি ২। গ্রীবা ৩। মধ্যভাগ ৪। লেজ ৫। শেষাংশ

এক-একবারের স্খালনে গড়ে প্রায় তিন ঘন সেণ্টিমিটার পরিমাণ শুক্র বহির্গত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক শুক্রস্খালনে মোটামুটি ২৬ কোটী শুক্রকীট বহির্গত হইয়া থাকে। শুক্রকীটের অবস্থিতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্‌গণ ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না। শুক্রকীটের আবিষ্কারের ইতিহাস আমরা প্রজনন অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি।

অনেকেরই ধারণা এইরূপ ছিল যে রতিক্রিয়ার সামর্থ্য থাকিলেই মানুষ সন্তান জন্মাইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য নহে! যাহাদের শুক্রে সবল শুক্রকীট বিদ্যমান নাই, তাহাদের শুক্র হইতে কদাচ সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশে বিবাহের ফলে সন্তান না হইলেই যত দোষ নন্দ ঘোষ—বেচারী স্ত্রীর ঘাড়ে। তাহাকে বিনা-বিচারে সকলে বন্ধ্যা আখ্যা দিয়া থাকে। কিন্তু স্বামীর শুক্রে সবল এবং সুস্থ শুক্রকীট না থাকাতেই যে অনেক বিবাহ নিস্ফল হইয়া থাকে, একথা অতি সত্য।

পুরুষের শুক্র কিন্তু একা সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না; স্ত্রীর ডিম্বের সহিত তাহাকে মিশ্রিত হইতে হয়। স্ত্রীলোকের ডিম্বাধারদ্বয় হইতে দুইটী নল আসিয়া জরায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ডিম্বাধারে ডিম্ব সৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ প্রতি সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা অন্তর দুইটী ডিম্বাধারের যে-কোনও-একটীতে এক একটী ডিম্ব পরিপক্ক হইয়া ডিম্বকোষ ফাটিয়া যায়। ডিম্বাধারের অনতিদূরে ফ্যালোপিয়ান নলের মুখ জালের আকারে মুখব্যাদান করিয়া আছে। ডিম্বকোষ ফাটিয়া গেলে

৫নং চিত্র
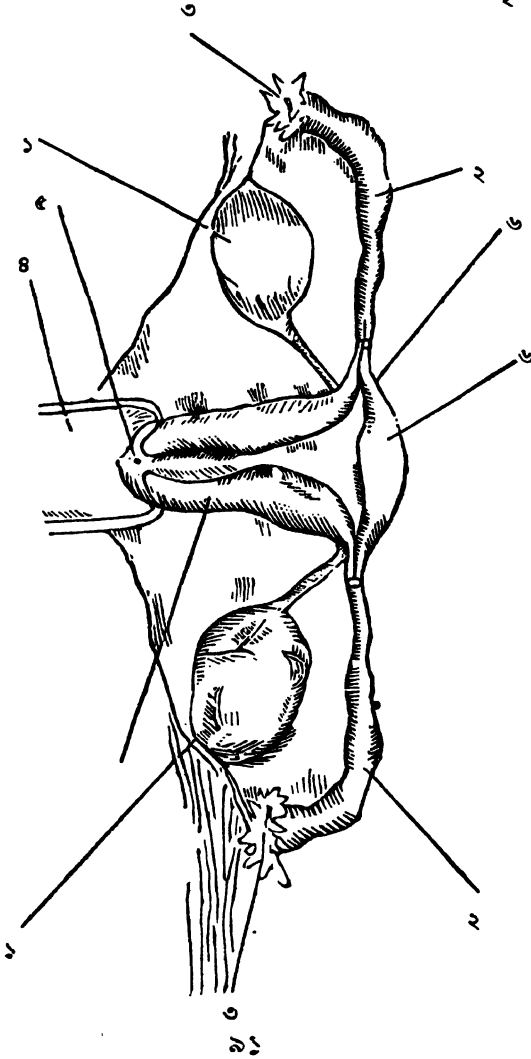
১। ডিম্বাধার (ovary) ২। ডিম্ববাহী-নল (Fallopian Tube)
৩। ডিম্ববাহী নলের মুখ ৪। যোনি-নালী ৫। জরায়ু-মুখ ৬। জরায়ু-দেহ

ডিম্ব উক্ত নলের মুখে ধরা পড়ে। ডিম্বকোষ ফাটিবার কালে উহা হইতে যে রস নিসৃত হয়, সেই রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ডিম্ব ফ্যালোপিয়ান টিউব বাহিয়া জরায়ুতে আসিয়া পতিত হয়। ডিম্বকোষ ফাটিবার সময় নারীর সমস্ত যৌনযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন রক্তবাহী নল হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। এই রক্ত জরায়ু ও যোনিপথ বাহিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহার নাম ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাব সম্বন্ধে প্রজনন অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।

রতিক্রিয়ার সহিত স্ত্রীলোকের স্তন প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও এত ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, স্ত্রীলোকের স্তনকে যৌন-অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। যৌবনাগমের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের ও পুরুষের স্তনের মধ্যে আকারগত কোনও পার্থক্য থাকে না। যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার, দৃঢ় অথচ কোমল-স্পর্শ দুইটি মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়। গর্ভাবস্থায় এই স্তন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও বৃহৎ হয়। এই সময়ে স্তনে দুগ্ধ জন্মে এবং স্তনের বোঁটার চারি পাশে বৃত্তাকারে কাল দাগ পড়ে। সাধারণতঃ সন্তানের জননী হইবার পর স্তনের স্নায়ুসমূহ দুর্ব্বল হইয়া স্তন শিথিল হইয়া হেলিয়া পড়ে।

স্তন

স্তনদ্বয় বক্ষের উভয় পার্শ্বের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থি আবৃত করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে। ইহাদের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসারক গ্রন্থি বিদ্যমান আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

যৌনবোধের প্রকৃতি

নারী-পুরুষের প্রকৃতিভেদ—শ্রেষ্ঠ কে ?—স্বাভাবিক পার্থক্য—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক—পুরুষের স্বার্থপরতা—দখলী স্বার্থ বনাম সত্যানুরাগ—ইতিহাসের সাক্ষ্য—নারী-পুরুষের যৌনবোধের পার্থক্য—পুরুষ সকর্ম্মক—যৌনমিলনে পুরুষের প্রাধান্য—শুক্র সঞ্চয় ও শুক্রস্খালন—নর-নারীর যৌনবোধের প্রকারভেদ—পুরুষের বহু-ভোগ-বাসনা—সৃষ্টি-বাসনা—নারী অকর্ম্মক—পার্থক্যের দৈহিক কারণ—নারীর যৌনবাসনার বৈচিত্র্য—কৃত্রিম অনিচ্ছা—ধর্ষিতা হওয়ার বাসনা—নারীর দায়িত্ব—নারী সংস্কার ও অভ্যাসের দাস—সৃষ্টিবাসনা—পারস্পরিক দৈহিক আকর্ষণ—নারী নিষ্ঠাবতী—নারী সমমৈথুনক—পুরুষের যৌন-দ্বৈত ভাব—দেশভেদে যৌনবোধের পার্থক্য—ভারতীয় পণ্ডিতগণের বর্ণনা—প্রাদেশিক যৌন-মনোবৃত্তি—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত—অধ্যাপক মিচেল্স্—ক্রাফ্ট্ এবিং ও হ্যাভ্‌লক এলিস্—যৌনবোধে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—আবহাওয়ার প্রভাব—কারণ কি ?—জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব—সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাপনপ্রণালীর প্রভাব—পিতামাতার প্রভাব—বহির্জ্জাগতিক প্রেরণা—ব্যতিক্রম—যৌন-অঙ্গের আকৃতি-ভেদে যৌনবোধের পার্থক্য—অসম অঙ্গে মিলনের অসুবিধা—বয়সভেদে নারী-পুরুষের রতি-প্রকৃতি—শৈশবে যৌনবোধের স্ফুরণ—হস্তমৈথুন—সহমৈথুন—কৈশোরে যৌনবোধ—নারী-পুরুষের দৈহিক বিবর্ত্তন—যৌবনে পদক্ষেপ—রতিক্রিয়ার প্রশস্ত বয়স—প্রৌঢ়ত্বে নারী-সৌন্দর্য্য—প্রৌঢ়ত্বে নারীর যৌনবোধ—নিষ্কাম প্রেমের স্ফুরণ—বার্দ্ধক্য—বার্দ্ধক্যে পুরুষের রতিশক্তি—বার্দ্ধক্যে পুরুষের রতিবাসনা—ব্যক্তিভেদে রতি-প্রকৃতির পার্থক্য—ভারতীয় শ্রেণী বিভাগের বৈশিষ্ট্য—চারি প্রকার পুরুষ—শশক—মৃগ—বৃষ—অশ্ব—সূক্ষ্মতার আতিশয্য—চারি প্রকার নারী—পদ্মিনী—চিত্রানী—শঙ্খিনী—হস্তিনী—শ্রেণী-বিভাগে দোষ—মিডারের শ্রেণীবিভাগ—জরায়ু-প্রধান নারী—ভগাঙ্কুর-প্রধান নারী—গিওনের শ্রেণী-বিভাগ—শিরা-প্রধান পুরুষ—লিঙ্গ-প্রধান পুরুষ—স্থূলতার আতিশয্য—নারীর যৌনবোধে চন্দ্রের প্রভাব—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ঐক্য মত—চন্দ্রের উত্থান-পতনের সহিত নারীর যৌনবোধের উত্থানপতন—ষ্টোপ্‌সের থিওরী।

পুরুষ ও নারীর দৈহিক বিভিন্নতা হইতে মানসিক ও প্রাকৃতিক

বিভিন্নতার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের একটা সার্ব্বজনীন বিশেষত্ব। প্রাচীন কালের সভ্য ও অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই এই মতবাদ দৃষ্ট হয় যে, পুরুষ সকল দিক দিয়াই নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নারীর উপর দৈহিক প্রাধান্য করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালের মস্তিষ্কতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যেও অনেকের মত এই যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অনেক কম। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নারী-পুরুষের প্রকৃতির তুলনামূলক অনেক গবেষণা হইয়াছে। প্রাগৈস্‌লামিক যুগে নারীর আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা হইত না। ইসলাম নারী-জাতিকে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছে।

নারী ও পুরুষের প্রকৃতি-ভেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের সমসময়ে সমগ্র ইউরোপে নারী সম্বন্ধে নূতন চেতনার সঞ্চার হয়। এই সময়ের ভাববাদিগণ স্ত্রী জাতির প্রতি দয়াশীল হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, নারী-পুরুষে জন্মগত কোনও পার্থক্য নাই ; পারিপার্শ্বিকতাই পরবর্ত্তী জীবনে শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা আনয়ন করিয়া থাকে। নারী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পুরুষের সমান সুবিধা-সুযোগ পাইলে সকল কাজে, জীবনের সকল স্তরে, পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারিত। রাস্‌কিন (Ruskin) সাহেব বলিয়াছেন—"সমবয়স্ক একটী বালক ও একটী বালিকা যতদিন ধূলা খেলা করে, ততদিন তাহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। হঠাৎ একদিন একজনকে ধরিয়া শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষেত্রের উজ্জ্বল আলোকময় রাজপথে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং অপরটীকে ধূলাখেলারই নামান্তর রান্নাঘরের অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ করা হয়। এই অবস্থায় তাহাদের জ্ঞান-

কে শ্রেষ্ঠ ?

বুদ্ধিতে যে পার্থক্য স্পষ্ট ও দৃষ্ট হয়, তাহা যে প্রকৃতিগত বা জন্মগত, তাহা ন্যায়তঃ কিরূপে বলা যাইতে পারে ?"

আধুনিক পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতিভার দিক হইতে বিচার করিলে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যকে শুধু সুযোগ-সুবিধার অভাব বলা যাইতে পারে না। ডাঃ কোরা ক্যাস্‌ল্‌ (**Cora Castle**) একজন মহিলা। তিনি নারী জাতির প্রতিভার গবেষণা করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, যতদূর জানিতে পারা যায়, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৮৬৩ জন মহিলা পুরুষের সমকক্ষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিভা স্বভাবজাত। ইহা সুযোগ-সুবিধার তত ধার ধারে না। বরঞ্চ প্রতিভার ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে ধর্ম্মনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক যত মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই সুযোগ-সুবিধা ত পানই নাই—উপরন্তু সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি ও শক্তি দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছেন। সুতরাং নারী জাতির মধ্যে অসাধারণ মনীষা থাকিলে তাহাও সুযোগের অপেক্ষা রাখিত না, সমস্ত বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। বর্ত্তমানে নারী জাতি সকল ব্যাপারে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষারও প্রচলন হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার আমলে, গ্রীক সভ্যতার আমলে, রোমীয় সভ্যতার আমলে, আরবীয় সভ্যতার আমলে, ভারতীয় মোগল সভ্যতার আমলে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার আমলেও নারীকে অতটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তবু ঐ ঐ সময়ে যে সংখ্যক নারী মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া-

স্বাভাবিক পার্থক্য

ছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার চেয়ে অধিক সংখ্যক নারী মনীষী জন্মগ্রহণ করেন নাই ; বরঞ্চ নারী যেন দিন দিন অধিক মাত্রায় খেলার পুতুলে পরিণত হইতেছে। মিঃ এইচ্ জি, ওয়েল্‌স্ তাঁহার The Work, Wealth and Happiness of Mankind নামক পুস্তকে অধ্যাপক মেশ্‌নিকফ্‌কে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে নারী-পুরুষে প্রকৃতি- ও প্রতিভাগত বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে।

কিন্তু আমেরিকা ও জার্ম্মানীর গবেষকগণের সকলে এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষের চেয়ে অনেক কম বয়সে নারীর জ্ঞান বিকশিত হয়। ডাঃ হেম্যান্‌স্ (Dr. Heymans) প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, নারী জাতি স্মৃতিশক্তি ও ভাবপ্রবণতায় পুরুষের চেয়ে অনেকখানি শ্রেষ্ঠ।

এই সমস্ত গবেষণার ফলে বর্ত্তমানে নারী-পুরুষের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের স্পৃহা কতকটা লোপ পাইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে 'নারী শ্রেষ্ঠ' কি 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ'—এই দুইটী মতবাদের একটী যুক্তিসঙ্গত মধ্য পথ বাছিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের মত এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে। কিন্তু উহাকে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠতা বলা অন্যায় হইবে। স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে উভয়ই শ্রেষ্ঠ। নারী পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক, একজন ব্যতীত অন্য জন পূর্ণ নয়। সেইজন্য আমাদের ভাষায় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে। ডাঃ কিশ্‌ এ বিষয়ে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন নারীকে পুরুষ-নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন করিতে চায়, তাহা

নর ও নারী পরস্পরের পরিপূরক

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; এ আন্দোলনের প্রবক্তারা নারীকে তাহার প্রকৃতি-দত্ত দায়িত্ব বহনে অস্বীকৃত হইতে শিক্ষা দেন। কিন্তু নারী মাতৃত্ব, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও নিঃস্বার্থপরতা এড়াইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে কিছুতেই স্বীয় নারীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। জীবনযাপনে নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক বলিয়াই উভয়ে মনীষাসম্পন্ন না হইলে মানুষ মোটের উপর ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না।

একে অন্যের ব্যতিরেকে নারী পুরুষ কেহই পূর্ণাঙ্গ নহে—ইহাই প্রকৃতির বিধান। শুধু মানুষের মধ্যেই এই প্রাকৃতিক বিধান সীমাবদ্ধ নহে, সমস্ত জীবজগতেই এই নিয়ম বিদ্যমান। স্রষ্টা নর-নারীকে পরস্পর-নির্ভরশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে তাহাদের কর্ম্ম-কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। পুরুষ যে-কোনও কারণেই হউক এযাবৎ শক্তি ও অধিকার পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। ফলে, সে স্বাধিকার-প্রমত্ততায় নারীহৃদয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মীয় ও নৈতিক আইন, কানুন, ব্যবস্থা, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সমস্তই একদেশদর্শী ও পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে নিজের অনুকূলে গঠন করিয়া লইয়াছে।

পুরুষের স্বার্থপরতা

প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এই লইয়া তর্ক করা কাঁচির দুই ফলার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তর্ক করার মতই নিস্ফল ও হাস্যকর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজ নিজ কর্ম্ম-কেন্দ্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সে শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের

পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করে না, এবং করে না বলিয়াই এক শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করিবার কোনও অধিকার অপর শ্রেণীর নাই। বিপুল প্রকৃতির আর কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের এই পার্থক্য বিদ্যমান নাই, এবং আর কোথাও নারীর উপর পুরুষের এই অন্যায় এবং অনিষ্টকারী প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

দখলী-স্বার্থ বনাম সত্যপরায়ণতা

যুগ-যুগান্তরের দখলী-স্বার্থের মোহে পুরুষ হয়ত অনায়াসে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, নারীর অধিকার দাবীর আন্দোলনকে সে হয়ত সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারিবে না। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু পুরুষ যদি নিজকে স্ত্রীলোকের অবস্থায় কল্পনা করিয়া একবার ধীর-ভাবে বিষয়টা পর্য্যালোচনা করিতে পারে, আমাদের মনে হয়, তবেই অধিকারের মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া তাহার অন্তর সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আমরা জানি, ভুক্তিত অধিকারের মোহ সহজে ঘুচে না। আমরা ইহাও জানি, অন্যায় অধিকারভোগীর ভোগস্পৃহা বাহ্যতঃ সুদৃশ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম, নীতি ও সভ্যতার নামে যুগে-যুগে কত শাসক

ইতিহাসের সাক্ষ্য

কোটী কোটী আদম-সন্তানের উপর অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের ভোগলালসায় ইন্ধন যোগাইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। আধুনিক যুগেও দেশ, বর্ণ ও আবহাওয়ার নিতান্ত প্রাকৃতিক বিভিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক জাতি অপর জাতির উপর অন্যায় প্রাধান্য করিতেছে। অধিকারের এই মোহ, আভিজাত্যের এই অভিমান, বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের এই অহমিকা,

সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, বড় বড় সত্যানুরাগী সাধক পণ্ডিতেরও সত্য-দৃষ্টিকে কতটা মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উদাহরণ ডাঃ ফোরেল। অন্যান্য বহু বিষয়ে সত্যানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাচ্য-জাতি সমূহের, বিশেষতঃ চীনা ও কাফ্রীদের, জন্মের হার দর্শনে ইউরোপীয় সভ্যতার কাল্পনিক বিপদে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইউরোপের সোনার মাটিতে জন্মগ্রহণ করিবার প্রশংসা যেমন ডাঃ ফোরেলের প্রাপ্য নহে, তেমনি প্রাচ্যের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করিবার দুর্ভাগ্যের জন্য চীনা বা কাফ্রী দায়ী নহে। ফলতঃ, জন্ম, বর্ণ, শ্রেণী বা জলবহাওয়ার জন্য নিন্দা বা প্রশংসার অধিকারী মানুষ নহে—স্বয়ং স্রষ্টা। সুতরাং, মানবতা ও সভ্যতায় সকলের অধিকার সমান। এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় আমরা যে সত্যানুরাগ ও মুক্ত বুদ্ধির কথা বলিয়াছি, সেই দুইটী গুণ ব্যতীত আমরা এ-বিষয়ে সত্যোপলব্ধি করিতে পারিব না। আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের বুদ্ধি মুক্ত ও দৃষ্টি প্রসারিত হউক।

নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা যৌনব্যাপারেও প্রযোজ্য কি না তাহা লইয়াও পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে। যৌন-বাসনায় নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা ধীরগামী, ইহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই অনুচ্ছেদে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। পুরুষের মধ্যে দৈহিক কষ্টসহিষ্ণুতা যত বেশী, মানসিক স্থৈর্য্য ততটা নাই; আবার নারীর মধ্যে মানসিক স্থৈর্য্য যত বেশী, কায়িক স্থৈর্য্য ততটা নাই। মূলতঃ, এই বিভিন্নতার দ্বারাই তাহাদের যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।

নারী-পুরুষের যৌন-বোধের পার্থক্য

শারীরিক গঠন-পার্থক্য ও রতিক্রিয়ার কর্ত্তব্যের ইতর-বিশেষ-হেতু নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন-বোধের পার্থক্য বিদ্যমান আছে, একথা প্রায় সমস্ত যৌন-বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ ফোরেল এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের অংশ সকর্ম্মক। সেজন্য রতিক্রিয়ার গোড়াতে পুরুষের রতি-বাসনা খুব তীব্র। পুরুষের এই বাসনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং জন্মদাতা হিসাবে ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যৌন-বোধ নারী-জীবনে যতটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, পুরুষ-জীবনে ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তবু রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের এই সকর্ম্মকতা তাহার মনের উপর বিপুল ক্রিয়া করিয়া থাকে।

পুরুষ, সকর্ম্মক

সকর্ম্মকতাই পুরুষের যৌন-বোধকে নারীর যৌন-বোধ হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক করিয়াছে। রতি-ক্রিয়া নারী অপেক্ষা পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে অনেক বেশী। যৌন-মিলনে পুরুষের ইচ্ছা ও শক্তিরই প্রয়োজন, নারীর ইচ্ছা বা শক্তির কোনও প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ, যৌনবোধ যৌন-ক্ষমতার উপরই অনেকখানি নির্ভর করে। অবশ্য খুব শক্তিশালী পুরুষেরও রতি-বাসনার তীব্রতা না থাকিতে পারে এবং ধ্বজভঙ্গ রোগীরও তীব্র রতি-বাসনা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা সাধারণ অবস্থা নহে। রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের এই সকর্ম্মকতা তাহার রতি-কামনাকে খুব তীব্র করে বটে, কিন্তু শুক্রস্খালন প্রভৃতি দৈহিক ঘটনা দ্বারা তাহার রতি-শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া পুরুষের রতি-বাসনা যেমন ঝড়ের বেগে জাগ্রত হয়, তেমনই ঝড়ের বেগেই তিরোহিত হয়।

যৌনমিলনে পুরুষের প্রাধান্য

কারণ পুরুষের রতি-বাসনার দৈহিক প্রকাশের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। পুরুষের শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হইলে তাহার রতি বাসনা তীব্র হয় এবং শুক্রস্খালন হইবামাত্রই তাঁহার রতি-বাসনা অন্তর্হিত হয়। অবশ্য শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হইবা-মাত্রই পুরুষের রতি-উত্তেজনা হয় না, সেজন্য নারীর স্পর্শ বা অনুরূপ কামোদ্রেককারী কোনও ঘটনার প্রয়োজন। তথাপি পুরুষের রতি-বাসনা যে একদিকে শুক্রকোষে শুক্রসঞ্চয় ও অপর দিকে শুক্রস্খালন দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুক্রসঞ্চয় ও শুক্রস্খালন

পুরুষের যৌন-বাসনার দ্বিতীয় বিশেষত্ব ইহার প্রকাশ-ভঙ্গি। মুখমণ্ডলের পৈশিক ভঙ্গি হইতে আমরা তাহা সুস্পষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। তাহার অন্তরের তীব্র বাসনা স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্য দিয়া গতিবাহী স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সমস্ত দেহে বিক্ষিপ্ত হয়, তবে জননেন্দ্রিয়মণ্ডলেই উহার প্রতি-ক্রিয়া হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বস্তুতঃ, পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তনই নারী ও পুরুষের যৌন-বোধ প্রকাশের সুস্পষ্ট পার্থক্য। বলা বাহুল্য, পুরুষের লিঙ্গোত্থানের ন্যায় এমন সুস্পষ্ট দৈহিক পরিবর্ত্তন নারীর মধ্যে হয় না।

নর-নারীর যৌন-বোধের প্রকাশভেদ

পুরুষের যৌন-বাসনার তৃতীয় বিশেষত্ব তাহার একে-অতৃপ্তি। রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের কোনও দৈহিক দায়িত্ব নাই—তাহাকে সন্তান ধারণ করিতে হয় না—বলিয়া পুরুষের বহু-নারী-ভোগের প্রাকৃতিক সুবিধা আছে। এই সুবিধা-বোধ হইতে তাহার বহু-নারী-ভোগের বাসনা স্ফুরিত হইয়াছে। রতিক্রিয়ায়

পুরুষের বহু-ভোগ-বাসনা

সকর্ম্মকত্ব তাহাকে নারীর উপর যে প্রাধান্য দান করিয়াছে, সেই প্রাধান্য-বোধ ও নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রতি মানব-মনের স্বাভাবিক অবজ্ঞা—এই দুইটী মনোবৃত্তি পুরুষকে নিত্য নূতন নারীভোগে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। পুরুষের এই নিত্য নূতন ভোগস্পৃহা বহুপত্নীত্ব ও বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি বহু সামাজিক অকল্যাণের মূলীভূত কারণ। এই দিক হইতে নারী-মনোবৃত্তি পুরুষ-মনোবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ, নারী স্বভাবতঃ এক পতিতেই তৃপ্ত। পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি প্রকৃতি-দত্ত কোমলবৃত্তি পুরুষের এই বহু-ভোগের বাসনাকে কতকটা সংযত রাখে। আত্মসংযম সাধনার দ্বারাও পুরুষ তাহার এই বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

রতিক্রিয়ায় নারীর অংশ অল্প-বিস্তর অকর্ম্মক। নারীর রতিক্রিয়া শুক্রসঞ্চয় বা শুক্রস্খালন দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে বলিয়া তাহার যৌন-বোধ

নারী অকর্ম্মক

পুরুষের যৌন-বোধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তীব্র, নহে। উহা বিস্তৃত ও ব্যাপক। পুরুষের যৌন-বোধ যেমন তাহার যৌন-অঙ্গে সীমাবদ্ধ, নারীর যৌন-বোধ তেমন নহে। সত্য বটে, পুরুষের লিঙ্গের ন্যায় নারীর ভগাঙ্কুর রতি-বাসনায় উত্তেজিত হয়, সত্য বটে, নারীর স্তনাগ্র তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাম-কেন্দ্র, তবু নারীর কাম-বাসনাকে পুরুষের কাম-বাসনার ন্যায় বিশেষাঙ্গিক বলা যাইতে পারে না।

পুরুষের যৌন-বাসনা হইতে নারীর যৌন-বাসনার এই পার্থক্যের কতকগুলি দৈহিক কারণ আছে। নারীর শুক্র বা শুক্রকোষ নাই। শুক্রসঞ্চয়-

পার্থক্যের দৈহিক কারণ

জাত যে উত্তেজনা পুরুষে বিদ্যমান আছে, নারীতে তাহা নাই। এইজন্য নারীর কাম-বাসনা অত্যন্ত ধীরে-ধীরে জাগ্রত হয়। শুক্র না থাকায় কোনও

বিশেষ মুহূর্ত্তে পুরুষের শুক্রস্খালনের ন্যায় নারীর কোনও পুলকপ্রদ রসক্ষরণ হয় না, সুতরাং নারীর উত্তেজিত রতি-বাসনা অন্তর্হিত হয়ও খুব ধীরে-ধীরে। সেইজন্য রতিক্রিয়ার গোড়াতে নারীকে সাধারণতঃ যেমন অনুত্তেজিত, উদাসীন, এমন কি অনিচ্ছুক বোধ হয়, রতিক্রিয়ার উপসংহারে তাহাকে তেমনি অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট দেখা গিয়া থাকে। পুরুষ সংযম ও আত্মস্থতা সাধন করিয়া অতি সহজেই এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে পারে, যথাস্থানে আমরা তাহা বর্ণনা করিব।

নারীর যৌন-বাসনার বৈচিত্র্য

রতিক্রিয়ায় নারীর এই অকর্ম্মকতাহেতু তাহার যৌন-বাসনা একটু বিচিত্র। রতিক্রিয়ায় দৃশ্যতঃ তাহাকে অনিচ্ছুক অথবা উদাসীন দেখা গেলেও এ-কার্য্যে পুরুষের নিকট সে খানিকটা জবরদস্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অধ্যাপক রবার্ট মিচেল্‌স্‌ নারীর এই যৌন-ভাবকে দ্বৈত মনোভাব নাম দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারীর যৌন-বাসনার এই দ্বৈত ভাব কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ের আকর। অকল্যাণের হেতু এইজন্য যে, রতিক্রিয়ায় নারী বাহ্যতঃ এমন দৃঢ় অসম্মতি প্রদর্শন করিয়া থাকে যে, সুবিবেচক প্রেমিক পুরুষ ঐ অসম্মতি উপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রতিক্রিয়াকে সে পাশবিকতা বলিয়া মনে করে। অথচ, নারীর ঐ কৃত্রিম অনিচ্ছা ঠেলিয়া স্বামী যদি তাহার সঙ্গে রতিক্রিয়া না করে, তবে স্ত্রী তাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই অসন্তোষের পরিণাম এতটা ভয়াবহ যে হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস্‌ এবিষয়ে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ জ্যানেট্‌ একদা তাঁহার এক রোগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি আপনার

কৃত্রিম অনিচ্ছা।

স্বামীকে পসন্দ করেন না কেন ?" তালাককামী স্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন—"পসন্দ করিব কি, তিনি বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ করিতে জানেন না।" রতিক্রিয়ায় নারী জাতি যে খানিকটা কৃত্রিম অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে একথা জানিয়াও নিস্তার নাই। অনেক সময় স্ত্রী হয়ত সত্য-সত্যই রতিক্রিয়ায় অক্ষমতাহেতু অনিচ্ছুক হইতে পারে। বিবেচক প্রেমিক স্বামী কৃত্রিম ও অকৃত্রিম অনিচ্ছার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় বিপদে পতিত হয় এবং তদ্দরুণ অনেক সময় দাম্পত্য-অপ্রীতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ধর্ষিতা হওয়ার বাসনা

কিন্তু নারীর এই কৃত্রিম অনিচ্ছা পুরুষের যৌন-বাসনার কল্যাণও করিয়া থাকে। নারীর এই কৃত্রিম অনিচ্ছা—যাহাকে সাধারণ ভাষায় ছিনালী বলা হইয়া থাকে—শৃঙ্গার কার্য্যের বিশেষ আবশ্যক অংশ। পরিণামে ধরা দিবার জন্যই এই পলায়ন। পুরুষের আগ্রহবৃদ্ধির জন্যই এই অসম্মতি। ইহা নারীর যৌন-জীবনের একটা উপাদেয় বিশেষত্ব। নারীর এই গুণই পুরুষের প্রাণে যৌন-আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নারীর নিজের দিক হইতেও তাহার যৌন-জীবনে ইহা একটা বিরাট সত্য। নারী স্বভাবতঃই পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হইতে চায়। অধ্যাপক মিচেল্‌স্ একজন সুশিক্ষিত অভিজাত বংশের মহিলার কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে উক্ত মহিলা তাঁহার নিকট বলিয়াছেন—"যে-পুরুষকে ভালবাসি তাহার দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার ন্যায় আনন্দ আর কিছুতেই নাই।" বস্তুতঃ ইহাই নারীর যৌন-বোধের গূঢ় কথা। অধ্যাপক মিচেল্‌স্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, ধর্ষণেই নারীর রতি-তন্ময়তা অধিক হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

গর্ভধারণ, সন্তানপালন, স্তন্যদান ইত্যাদি দৈহিক কারণেই নারীর যৌন-বাসনা কোনও বিশেষ অঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। গর্ভধারণের ন্যায় এমন পরিণামের ভীতিতেও নারীর রতি-বাসনা অনেকটা সংযত হইয়া থাকে।

নারীর দায়িত্ব

যৌন-ব্যাপারে নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সংস্কার ও অভ্যাসের দাস। অতীতের ন্যায় আজিও নারীজাতি বীরত্ব, সাহসিকতা ও গোয়ার্ত্তুমি পসন্দ করিয়া থাকে, এবং ভীরুতা, কাপুরুষতা ও অতি-বিবেচকতাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি নারীর সংস্কার-প্রিয়তার পরিচায়ক। নারী যে কতটা অভ্যাসের দাস, তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ এই যে, যে-নারী স্বভাবতঃই এক স্বামীতে সন্তুষ্ট, যে-নারীর যৌন-লজ্জা তাহার একটা বিশেষ আভরণ, সেই নারীই বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অল্পদিনের অভ্যাসে চরম নির্লজ্জতা আয়ত্ত করিতে পারে।

নারী সংস্কার ও অভ্যাসের দাস

নারীর যৌন-বোধে সৃষ্টি-বাসনা পুরুষের সৃষ্টি-বাসনা অপেক্ষা তীব্র। কিন্তু পুরুষের সৃষ্টি-বাসনা ও নারীর সৃষ্টি-বাসনার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। পুরুষের সৃষ্টি-বাসনা দেহ-নিরপেক্ষ আত্মবিস্তারের অন্ধ ক্ষুধা মাত্র; কিন্তু নারীর সৃষ্টি-কামনায় ঘনিষ্টতর দৈহিক সম্পর্কহেতু সৃষ্টিতে নারীর মমত্ববোধ আছে।

সৃষ্টি-বাসনা

নারী ও পুরুষের যৌন-বোধে এই সমস্ত বড় বড় পার্থক্য ছাড়াও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পার্থক্য আছে। অতি সংক্ষেপে আমরা তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। নারীদেহ, বিশেষতঃ সুগঠিত যৌবন-দীপ্ত নারীদেহ,

পারস্পরিক দৈহিক আকর্ষণ

দর্শনে যেমন পুরুষের কাম উদ্দীপ্ত হয়, পুরুষের ঐরূপ দেহদর্শনে নারীর ততটা কাম উদ্দীপ্ত হয় না। নারী সংস্কারবশে পুরুষকে ভোক্তা ও নিজেকে ভুক্ত মনে করিয়া থাকে বলিয়া পুরুষের দৈহিক রূপ তাহার বড় একটা বিবেচনার বিষয় নহে।

দাম্পত্য-জীবনে নারী সাধারণতঃ নিষ্ঠাবতী। সে নিরুদ্বেগে অনায়াসে এক স্বামী লইয়া ঘর করিতে পারে। জননীত্ব তাহার যৌন-জীবনের প্রধান পরিচালক-বৃত্তি বলিয়া সে একাধিক পুরুষের প্রয়োজনই বোধ করে না। অথচ পুরুষ এ-বিষয়ে নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ডাঃ ফোরেলের মতে 'সাধারণ মানুষ প্রত্যহ যতজন অ-কুশ্রী ও অ-বৃদ্ধা নারী দর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিতই তাহার রতিকার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়।'

নারী নিষ্ঠাবতী

নারী ও পুরুষ উভয়েই খানিকটা সমমৈথুনক বটে; কিন্তু নারীর সমমৈথুন স্বাভাবিক ও পুরুষের সমমৈথুন যৌন-বিকল্প। কারণ, পুরুষের সমমৈথুন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বয়সের একটা বৃত্তি এবং স্বাভাবিক রতিক্রিয়ার নিতান্ত দীন স্থলবর্ত্তী মাত্র। কিন্তু নারীর সমমৈথুন সার্ব্বজনীন,—বিশেষ বয়সের ক্রিয়া নহে; স্বাভাবিক রতিক্রিয়ার স্থলবর্ত্তীও নহে; কারণ ইহার দৈহিক কোনও পরিণতি নাই। দুইটী যুবতী নারী একত্রে শয়ন করিয়া পরস্পরকে চুম্বন করিয়া এবং মা সন্তানকে কোলে জড়াইয়া যে আনন্দ পাইবে, ঐ আনন্দ যৌন-বোধ-জাত; কিন্তু নারীর পক্ষে উহা যৌন-বিকল্প নহে; কারণ এ-বোধ মূলতঃ শারীরিক নহে—মানসিক।

নারী সমমৈথুনক

আমরা নারীর যৌন-বোধের দ্বৈতভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু পুরুষেরও এক প্রকার যৌন দ্বৈতভাব আছে, যাহা নারীর চক্ষে নিতান্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সে দ্বৈতভাব এই যে, পুরুষ তাহার স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা সত্ত্বেও এবং স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়ায় পরম তৃপ্তিলাভ করা সত্ত্বেও অনায়াসে এবং স্ত্রীর প্রতি অবিচার করিতেছে ইহা অনুভব না করিয়াও সে পরস্ত্রী কিম্বা বেশ্যাগমন করিতে পারে। নারীর পক্ষে সাধারণতঃ ইহা সম্ভব নহে। নারী যাহাকে ভালবাসে না, তাহার সহিত স্বেচ্ছায় সে রতিক্রিয়া করিতে পারে না। অবশ্য বেশ্যাদের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা অর্থের জন্য দেহদান করিয়া থাকে—রতি-কামনা পূর্ণ করিবার জন্য নহে।

পুরুষের যৌন দ্বৈতভাব

মানুষের শরীর ও মনের উপর আবহাওয়ার প্রভাবও সকল দেশের সকল যুগের যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে-প্রভাব মানুষের যৌন-প্রবৃত্তিকে কতটা প্রভাবান্বিত করিয়াছে, সে সম্বন্ধে যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণ একমত নহেন। আবার এই আবহাওয়ার প্রভাব নারী-পুরুষ-ভেদে কতটা বিভিন্ন, সে সম্বন্ধে কোনও বিশেষ মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া আজও নিরাপদ নহে বলিয়াই মনে হয়। এবিষয়ে ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রকারগণ একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। ঋষি বাৎস্যায়ন ও কোকা পণ্ডিত তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নারীগণের যৌন-বাসনার তীব্রতার একটা পরিমাপ করিয়াছেন। ইহাদের মতে—পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং চেনাব প্রদেশের নারীগণের কামেচ্ছা অতি প্রবল এবং তাহারা রতিক্রীড়ারূপে চিম্‌টী কাটা,

দেশভেদে যৌনবোধের পার্থক্য

ভারতীয় পণ্ডিতগণ

আলিঙ্গন, পুরুষের কোলে উঠা অতিশয় ভালবাসে। ইহারা সাধারণতঃ কোমলাঙ্গী হইয়া থাকে এবং সঙ্গমে পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। দেওগড়ের নারী অতিশয় কোমলাঙ্গী হইয়া থাকে। ইহারা রতিবিষয়ক বহু কৌশল জানে। বদাউন প্রভৃতি অঞ্চলের নারীরা চতুরা, বাকৃপটু, মিষ্টভাষিনী ও কৌশলপরায়ণা হইয়া থাকে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত অঞ্চলের নারীরা প্রত্যহ অভিনব উপায়ে সঙ্গম করিতে ভালবাসে এবং নিজেরা প্রত্যহ নূতন কৌশল আবিষ্কার করে। কিন্তু তাহারা চিম্‌টী কাটা ও দংশন পসন্দ করেন না। উহারা নিজেদের স্তনকে উন্নত ও সুগোল রাখিবার জন্য সযত্নে চেষ্টা করিয়া থাকে। গুজরাটের নারীরা অতিশয় কৌতুক-প্রিয় রমণ-বিলাসী হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র প্রদেশের নারীরা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণে, বিশেষতঃ রতিক্রিয়ার সময়ে ঐ সমস্ত বাক্য উচ্চারণে, বিশেষ পটু। পুরুষও তাহাদিগকে অশ্লীল গাল দিক ইহা তাহারা খুব পসন্দ করে। পাটলীপুত্রের নারীগণ অশ্লীল কথা খুব ভালবাসে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের নারীগণের ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে অশ্লীল কথা বলিতে পারে না, কেবলমাত্র রতিকার্য্যের সময় মুখরা হইয়া থাকে। দ্রাবিড় অঞ্চলের নারীগণকে সঙ্গমে পরিতুষ্ট করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। বাঁশাবল্লী অঞ্চলের নারীরা মোটেই কামাতুরা নহে, কিন্তু পুরুষ রতিকার্য্য করিতে চাহিলে উহাতে বাধা দেয় না। তাহারা রতিক্রিয়ায় অতিমাত্রায় লজ্জাশীলা বলিয়া সকর্ম্মক অংশ গ্রহণ করে না। অবন্তী প্রদেশের নারীরা রতিক্রিয়ার বহু কৌশল জানে; কিন্তু চুম্বন ও চিম্‌টী কাটা একদম পসন্দ করে না। মালওয়া প্রদেশের নারীরা আলিঙ্গন ও চুম্বন

প্রাদেশিক যৌন মনোবৃত্তি

খুব বেশী পসন্দ করে। অযোধ্যা প্রদেশের নারীরা অতিশয় কামাতুরা। অন্ধ্র প্রদেশের নারীরা অতিশয় কোমলাঙ্গী ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরে নারীর যে প্রাদেশিক রতি-প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইল, উহা বহুদিন পূর্ব্বের কথা বলিয়া উহার ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত আর কোনও মূল্য নাই। ঐতিহাসিক মূল্যই যে উহার কতটুকু, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কারণ সুবর্ণলতা প্রভৃতি যে-সমস্ত প্রাচীন পণ্ডিতের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বাৎস্যায়ন ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান-প্রণালী কতদূর নির্ভরযোগ্য ছিল, এত যুগ পরে তাহা নির্দ্ধারণ করা এক প্রকার অসম্ভব।

ইউরোপীয় যৌন-বৈজ্ঞানিকগণের অনেকে দেশভেদে নারী-পুরুষের যৌন-প্রকৃতি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, বিভিন্ন দেশের নারী-পুরুষ, বিশেষতঃ নারীরা, বিভিন্ন উপায়ে রতিক্রিয়া করিতে ভালবাসে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ

রতিক্রিয়া-প্রণালী মূলতঃ অভিন্ন হইলেও এক এক দেশের নারীর যৌন-প্রকৃতি সূক্ষ্মতায় এক এক দিকে বিকাশ লাভ করে। অধ্যাপক রবার্ট মিচেল্‌স্ তদীয় "সেক্‌শুয়াল এথিক্‌স্" নামক পুস্তকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নারী-পুরুষের, বিশেষ করিয়া নারীর, যৌন-জীবনের গবেষণার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক মিচেল্‌স্ ঐ সমস্ত দেশের নারী-জাতির যৌন-প্রকৃতি অধ্যয়নে ঐ ঐ দেশের বেশ্যাদের যৌন-প্রকৃতিকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। গৃহস্থ নারীর যৌন-প্রকৃতির পরিমাপ করিবার জন্য বেশ্যাদের যৌন-প্রবৃত্তি খুব নিরাপদ ভিত্তি না হইলেও, উহা দ্বারা

অধ্যাপক মিচেল্‌স্

যে বিভিন্ন দেশের নারীর যৌন-প্রকৃতি বুঝিতে কোনই অসুবিধা হয় না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ডাঃ এবিং ও এলিস্

ডাঃ ক্রাফ্‌ট্ এবিং ও হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ তাঁহাদের দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে নারী-জীবনের যে সমস্ত বিচিত্র যৌন-বিকল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের নারী বিভিন্ন উপায়ে স্ব স্ব যৌন-ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা কুকুর, বিড়াল, শূকর, রাজহাঁস, এমন কি সাপ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই সমস্তই যে নারী-প্রকৃতিতে কাম-প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্যের নিদর্শন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত বিশিষ্ট প্রণালীকে জাতিগত বা আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়া উহাদিগকে দেশবিশেষের নারীজাতির সাধারণ বা সার্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না।

যৌন-বোধে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

এই সমস্ত গবেষণায় একটা সত্য আমাদের চক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। তাহা নারী-পুরুষের, বিশেষ করিয়া নারীর, যৌন-জীবনের উপর পারিপার্শ্বিকতার, বিশেষতঃ আবহাওয়ার, প্রভাব। অধিকাংশ পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত যে,

(১) যৌন-জীবনের উপর আবহাওয়ার প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নারীর ঋতুস্রাব শীত-প্রধান দেশের নারীর অপেক্ষা অনেক অল্প বয়সে হইয়া থাকে,

(২) বংশ ও কায়িক-গঠন-প্রণালী দ্বারাও যৌন-জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়,

(৩) জীবন-যাপন-প্রণালী, আবাসস্থল, সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা যৌন-জীবনের উপর বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে, এবং

(৪) যৌন-জীবনের উপর পিতামাতার প্রভাবও খানিকটা বিদ্যমান আছে।

যৌন-বৃত্তির উপর আবহাওয়ার প্রভাব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে গড়ে বালিকাদের ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ১৩ হইতে ১৬ এবং শীত-প্রধান দেশে ১৫ হইতে ১৮ বৎসরে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে দেশের আবহাওয়া যত উষ্ণ, সেই দেশের নারীরা তত অল্পবয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্লস্ সাহেব এ-বিষয়ে বিভিন্ন দেশের নারীজাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাতে দেখা যায়:

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মধ্যে

আলজিরিয়ায়	...	...	৯—১০
প্যালেষ্টাইনে	...	...	১০
সিরিয়ায়	...	...	১২
তুরস্কে	...	...	১০
পারস্যে	...	...	১০—১৪
ভারতবর্ষে	...	...	১২—১৩
কলিকাতায়	...	...	১২½
জাপানে	...	...	১৩—১৪

শীত-প্রধান দেশের মধ্যে

ইংলণ্ডে	...	...	১৫
ফ্রান্সে	...	...	১৬
জার্ম্মানীতে	...	...	১৫
ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডে	...	...	১৮
কোপেন্‌হেগেনে	...	...	১৬

বৎসর বয়সে বালিকাদের ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া থাকে। অনেক পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন, দেশের আবহাওয়ার উষ্ণতাহেতু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অধিবাসীদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তিসমূহ অকালে পরিপক্ক হইয়া যায়। সেইজন্যই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে দেহের পরিপক্কতাহেতু যৌন-বোধ অতি অল্প বয়সেই জাগ্রত হয়। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত এদেশের বালক-বালিকার বাল্য-বিবাহ সমর্থন করিয়া থাকেন।

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের বালক-বালিকার মধ্যে একটু সকাল-সকাল যে যৌন-বোধ জাগ্রত হয়, উপরোল্লিখিত তালিকায় বালিকাদের রজোদর্শনের বয়স হইতে তাহাই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু দৈহিক গঠনের অকাল-পক্কতাই ইহার কারণ, কি অন্য কোনও কারণ আছে, সে-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ একমত নহেন। ডাঃ কিশ্‌ আবহাওয়ার উষ্ণতাহেতু দেহের পরিপক্কতাকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ফোরেল্‌ বলেন, দৈহিক পক্কতা ইহার কারণ নহে; আসল কারণ শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে জীবন-ধারণের জন্য যতটা কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের

কারণ কি ?

লোককে ততটা পরিশ্রম করিতে হয় না; সেজন্য গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অধিবাসিগণের অবসর, সুতরাং বাজে চিন্তা করিবার সময়, যথেষ্ট। এই কারণেই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের মধ্যে সকাল-সকাল যৌনবোধ পরিস্ফুট হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টী ঠিক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও আমাদের মনে হয়, ডাঃ কিশের মত অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

নর-নারীর যৌন-বোধ স্ফুরণে জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ কিশের মতে সেমিটিক নারীর আর্য্য নারীর অপেক্ষা অনেক অল্প বয়সেই ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। অবশ্য এই জাতিগত বৈশিষ্ট্য দৈহিক গঠনের পার্থক্যের উপরই নির্ভর করে। যে জাতির নারীরা বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, সেই জাতিতেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, স্বাস্থ্যবতী, সুগঠিত, ঘন-কৃষ্ণকেশ, স্থূল-চৰ্ম্ম, কৃষ্ণ-চক্ষু শ্যামাঙ্গিনীর যত সহজে ঋতুস্রাব হয়, স্বাস্থ্যহীনা, অপূর্ণ-দেহ, পিঙ্গল-কেশ, কোমল-চৰ্ম্ম, নীলচক্ষুবিশিষ্ট গৌরাঙ্গীর তত সকালে ঋতুস্রাব হয় না।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

যৌন-বোধের উপর সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবন-যাপন-প্রণালীর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। প্রচুর অবসরভোগী, বিলাসী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যত অল্পবয়সে ঋতুস্রাব হয়, কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তত সকালে ঋতুস্রাব হয় না। ঠিক এই কারণেই বড় বড় নগরীতে যত অল্পবয়সে নারী রজোদর্শন করিয়া থাকে, ক্ষুদ্র শহরে ও পল্লী-গ্রামে তত অল্পবয়সে হয় না। বড় লোকদের মধ্যে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে, কিম্বা ডাঃ ফোরেলের

সামাজিক অবস্থা ও জীবন-যাপন-প্রণালীর প্রভাব

মতে, বড় লোকদের যৌন-চিন্তা করিবার প্রচুর অবসর থাকার দরুণই এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

যৌন-বোধের উপর পিতামাতার প্রভাবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে মাতা সকালে যৌবন-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কন্যাগণও সাধারণতঃ সকালেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়, ইহাও সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু যৌন-বোধের উপর একটা সহজাত প্রভাব বিদ্যমান আছে, ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পিতামাতার প্রভাব

উপরোক্ত কারণসমূহে বালক-বালিকাগণের মনে একটা অস্পষ্ট প্রেরণা জাগ্রত হইতে পারে বটে, কিন্তু বাহির হইতে কোনও উত্তেজক প্রেরণা না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা চাপা থাকে। সংসর্গ, জীব-জন্তুর মৈথুন দর্শন, বায়স্কোপ, থিয়েটার প্রভৃতি বহির্জ্জাগতিক ঘটনাসমূহ বালক-বালিকাগণকে রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দান করিয়া ঐ কার্য্যে অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে।

বহির্জ্জাগতিক প্রেরণা

ইহার ব্যতিক্রম যে হয় না, তাহা নহে। মার্ক (Merk), রবী (Robie) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত শীত-প্রধান দেশেও ৩৪ বৎসর বয়সে হস্তমৈথুন করিতে দেখা গিয়াছে। ডাঃ হ্যামিল্টন (Hamilton) বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত শীতপ্রধান দেশেও শতকরা ১৪ জন বালিকা ও ২০ জন বালক ছয় বৎসর বয়ক্রম হইতে নানাপ্রকার যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ক্যাথারিন ডেভিস্ নাম্নী মহিলা গবেষকও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ব্যতিক্রম

ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে নারী-পুরুষের যৌন-অঙ্গের আকৃতির সহিত তাহাদের কামেচ্ছার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোকা পণ্ডিতের অভিমত এই যে স্ত্রী অঙ্গ সাধারণতঃ তিন আকারের হইয়া থাকে—বার আঙ্গুল, নয় আঙ্গুল এবং ছয় আঙ্গুল লম্বা। 'লজ্জতন্নেসা'তে ও যোনিকে এই তিন পরিমাপে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। পুরুষের লিঙ্গকেও উক্ত পণ্ডিতগণ উপরোক্ত তিন পরিমাপে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে নারী বা পুরুষের যোনি বা লিঙ্গ যত লম্বা তাহার কামভাবও সেই পরিমাণে অধিক বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

যৌন-অঙ্গের আকৃতি-ভেদে যৌন-বোধের পার্থক্য

এই ছয়-নয়-বার আঙ্গুলের মতবাদকে সম্পূর্ণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া না মানিলেও যৌন-অঙ্গকে হ্রস্ব, মধ্যম ও দীর্ঘ—এই তিন শ্রেণীতে বিনা-দ্বিধায় ভাগ করা যাইতে পারে। যাহার অঙ্গ যত দীর্ঘ ও বৃহৎ হইবে, তাহার যৌন-স্পৃহা তত বেশী হইবে ইহা অস্বাভাবিক না হইলেও এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, সকলক্ষেত্রে সত্য হইবে বলিয়া মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। পুরুষের লিঙ্গ হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র হইলে, বিশেষতঃ ঐ হ্রস্বতা বা ক্ষুদ্রতা হস্তমৈথুন ইত্যাদির কুফল-জনিত হইলে, উহার কাম-প্রবৃত্তি বা রতি-শক্তি কম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নারীর জন্য একথা সত্য নহে। যোনি খুব ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও নারী অতীব কাম-প্রবণা হইতে পারে।

তবে একথা সত্য যে, বৃহৎ-যোনিদেশ-বিশিষ্ট নারীকে যদি হ্রস্ব-লিঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গ করিতে হয়, তবে সে মিলনে নারীর সম্যক তৃপ্তি

অসম-অঙ্গে মিলনে অসুবিধা

হইতে পারে না এবং সে ক্ষেত্রে নারীকে অত্যন্ত অধিক কামাতুর বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে দীর্ঘ-লিঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষকে যদি হ্রস্ব-যোনি-বিশিষ্ট নারীর সঙ্গে সহবাস করিতে হয়, তবে তদবস্থায় উক্ত পুরুষকে বিশেষ কামাতুর বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত, লিঙ্গ ও যোনির হ্রস্ব-দীর্ঘতার সহিত কাম-ভাবের হ্রাস-বৃদ্ধির যে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকের অভিমত এই যে, নারীর জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ভগাঙ্কুরই তাহার রতি-বাসনার পরিমাপক। যে নারীর ভগাঙ্কুর যত বড় হইবে, সে নারী তত কামাতুর হইবে। কিন্তু বাৎস্যায়ন, কোকা পণ্ডিত প্রভৃতি ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রকারগণ লিঙ্গের আকৃতি-ভেদে পুরুষকে শশক, বৃষ ও অশ্ব, এবং যোনির আকৃতি-ভেদে নারীকে মৃগী, অশ্বিনী ও হস্তিনী, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শশক জাতীয় পুরুষের লিঙ্গ ক্ষুদ্র এবং সে অল্প রতিতে সন্তুষ্ট। বৃষ জাতীয় পুরুষের লিঙ্গ মধ্যম এবং রতি-প্রবৃত্তিও তাহার মধ্যম। অশ্ব জাতীয় পুরুষের লিঙ্গ বৃহৎ, তাহার রতি-প্রবৃত্তিও তেমনি অত্যধিক। নারীকেও এইরূপে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বয়স-ভেদে নারী-পুরুষের রতিপ্রকৃতি

ব্যক্তি-স্থান-ও আবহাওয়া-ভেদে যেমন নারী-পুরুষের রতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে, তেমনই একই ব্যক্তির বয়স-ভেদে তার রতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে। বয়স-ভেদে সমস্ত দেশ ও সমস্ত সাহিত্যই মানুষকে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। মানব-জীবনের এই পাঁচ অধ্যায়ে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন রূপ বিকাশ

হইয়া থাকে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় যৌন-বৃত্তিও যে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন-পরিমাণে বিকশিত হইয়া থাকে ইহা বলাই বাহুল্য। তবে যৌন-বৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে সমস্ত বিশেষজ্ঞ একমত নহেন বলিয়া এই বিষয়ে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করিব। আমরা তর্কিত বিষয়ে অধিক সময়ক্ষেপ না করিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতদের গৃহীত মতই এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

প্রসিদ্ধ যৌন-বিজ্ঞানবিৎ হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ বলেন যে, শৈশবে মানুষের যৌন-বোধ সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। সেইজন্য এই সময়ে যৌন-বোধ নিশ্চিতরূপে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ হয় না। ডাঃ ম্যাকস্ ডেসার বলেন যে, চৌদ্দ পনর বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদের যৌন-বোধের প্রকৃতি-গত কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ডাঃ ফ্রয়েড, উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিত-গণেরও মোটামুটি এই মত। ইঁহারা বলেন যে শৈশবে ও কৈশোরে মানুষের যৌন-বোধ সাধারণতঃ সম-লৈঙ্গিক হইয়া থাকে। ডাঃ হিপের অভিমত এই যে, কোনও প্রাণীই নিভাজ ও অবিমিশ্র স্ত্রী বা পুরুষ নহে। সকল স্ত্রীর মধ্যেই কিছুটা পুরুষ-প্রকৃতি এবং সকল পুরুষের মধ্যেই কিছুটা স্ত্রী-প্রকৃতি বিদ্যমান আছে। সেইজন্য, বাল্যে পুরুষের মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রী-প্রকৃতিবিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া না উঠা পর্য্যন্ত উক্ত উভয় প্রকৃতি সমানভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে।

শৈশবে

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন যে পণ্ডিতগণ বলিতেন মানুষের মধ্যে শৈশবে কোন যৌন-বোধ থাকে না, তাঁহাদের মত অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শিশুদের লিঙ্গোত্থান সচরাচরই হইয়া থাকে। কিন্তু উহা শুধু দৈহিক, না উহাতে যৌন-বোধ-রূপ মানসিক চৈতন্য বিদ্যমান আছে, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কারণ শৈশবের ঐ অবস্থার সময়কার মনোভাব স্মরণ রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যতদিনের চৈতন্য মানুষের স্মৃতি-পথে জাগ্রত আছে, ততদিনকার স্মৃতি হাতড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, শৈশবের লিঙ্গোদ্রেকের সহিত একটা অব্যক্ত পুলকের অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সকল মানুষের মধ্যেই শৈশবে অল্প-বিস্তর যৌন-বোধ বিরাজমান থাকে।

যৌনবোধের স্ফুরণ

এই যৌন-বোধের কতটা সহজাত, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। তবে পণ্ডিতদের মত এই যে, সুস্থ ও সবল পিতামাতার সন্তান শিক্ষিত ও কৃষ্টি-সম্পন্ন সমাজে প্রতিপালিত হইলে স্বভাবতঃই তাহার মধ্যে একটু বিলম্বে যৌন-বোধ জাগ্রত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শৈশবে যৌন-বোধ অনেকখানি বিক্ষিপ্ত থাকে। দৈহিক দিকে, শিশুর যৌন-অঙ্গ তখনও পরিপুষ্ট হয় নাই; আর মানসিক দিকে, শিশুর মনের দৃষ্টি তখনও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি নিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই এই বয়সে শিশুর যৌন-বোধের স্পষ্টতম বহিঃপ্রকাশ হয় হস্ত-মৈথুনে। এই হস্ত-মৈথুন শৈশবে আরব্ধ হইলেও, ইহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে বাল্যে, যৌবনে, এমন কি প্রৌঢ়ত্বেও অনেকে এই কু-অভ্যাসের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু উহা

হস্তমৈথুন

সাধারণ অবস্থা নহে। সাধারণতঃ এই অভ্যাস শৈশবে আরব্ধ হইয়া বিবাহের, কিম্বা অন্য উপায়ে বিরুদ্ধ-লিঙ্গ-সহবাসের সুযোগ পাওয়ার, সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। হস্তের সাহায্যে যৌন-বৃত্তিকে জাগ্রত ও তৃপ্ত করার নাম হস্ত-মৈথুন। এই সম্বন্ধে অন্য অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই অধ্যায়ে আমাদের এইটুকুই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, শৈশবে মানুষের যৌন-বোধ সর্ব্বপ্রথম আত্মবিকাশ করিয়া থাকে হস্তমৈথুনে।

দ্বিতীয়তঃ, শৈশবের যৌন-বোধ সম-মৈথুনেও বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। সম-লিঙ্গ দুই ব্যক্তির আঙ্গিক ঘর্ষণ ও মর্দ্দনে যৌন-বোধ জাগ্রত ও তৃপ্ত করার নাম সম-মৈথুন। এ সম্বন্ধেও আমরা অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব বলিয়া এখানে উহার উল্লেখমাত্র করিলাম। হস্ত-মৈথুনের ন্যায় সম-মৈথুনের অভ্যাসও শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে গড়াইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ, বিপরীত-লিঙ্গ-সহবাসের অভিজ্ঞতা লাভের পর এই সমস্ত অভ্যাস থাকে না।

সম-মৈথুন

শৈশবের পর কৈশোর। এই বয়সে নারী-পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত যৌন-ভাব জাগ্রত হয়। এই বয়সে তাহারা নিজেদের যৌন-অঙ্গসমূহের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য ধরিতে শিখে এবং তাহাদের ও বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তিগণের ঐ সমস্ত অঙ্গের মধ্যেকার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। এই পার্থক্য-চেতনা হইতে তাহাদের প্রাণে বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তিগণের যৌন-প্রদেশসমূহ দর্শন ও স্পর্শনের জন্য একটা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা

কৈশোরে যৌনবোধ

জন্মে। যে সমস্ত সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের প্রথা আছে, সেই সমস্ত সমাজের কিশোর-কিশোরীরা এই সময়ে যৌন-অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইতে পারে। এই বয়সে যৌন-অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হইলেও এই বয়সে অস্থি, মজ্জা, শুক্র প্রভৃতি দৈহিক উপাদান পরিপক্ক না হওয়ায় এ সময়কার যৌন-অভিজ্ঞতা স্বাস্থ্যের পক্ষে, সুতরাং ভবিষ্যৎ যৌন-জীবনের পক্ষে, বিশেষ অকল্যাণকর।

নারী-পুরুষের দৈহিক বিবর্ত্তন

কৈশোরে পদার্পণ করিতেই নারী-পুরুষের কতকগুলি দৈহিক পরিবর্ত্তন হয়। এই সময়ে বালকের কণ্ঠস্বরে একটা নিতান্ত অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন এই হয় যে, তাহার কণ্ঠস্বর মোটা হইয়া যায়। তাহার গলদেশে কণ্ঠের অস্থি ঈষৎ বাহির হইয়া পড়ে। স্তনদ্বয়ের বোঁটা উন্নত হয়। মুখে দাঁড়ী-গোঁফ গজাইতে আরম্ভ করে। সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ মুখে, একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখা দেয়। সমস্ত অঙ্গ, বিশেষতঃ নিতম্ব, একটু স্থূল হইয়া পড়ে। বালিকার শরীরেও অবিকল অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। তাহার কণ্ঠস্বরে কোনও পরিবর্ত্তন আসে না বটে, কিন্তু তাহার শরীরে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের জোয়ার আসে, তাহা অধিকতর সুস্পষ্ট। তাহার স্তনমূল শক্ত হইয়া উহা সুডৌল মাংসপিণ্ডের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার নিতম্ব-যুগল উন্নত ও প্রশস্ত হয়। সমস্ত শরীরের ত্বকে একটা চমৎকার আভা দৃষ্ট হয়। তাহার চক্ষে লজ্জা আসে এবং তাহা হরিণীর চক্ষুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে। বালক ও বালিকার এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্ত্তনের সমস্তগুলিই

বাহির হইতে দেখা যায়। দৃষ্টির অগোচরে উভয়ের অঙ্গের আরও পরিবর্ত্তন আসে। উভয়ের কামাদ্রিতে ও বগলে কেশ গজাইতে থাকে। উভয়ে নিজ নিজ যৌন-প্রদেশে দৈহিক ও চৈতনিক বিপুল পরিবর্ত্তনের জোয়ার দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং নিজ নিজ যৌন-প্রদেশে একটা অভাবনীয় অনুভূতি অনুভব করিয়া থাকে।

এইভাবে তাহারা যৌবনে পদক্ষেপ করে, এবং এই সময়ে দৈহিক অন্যান্য পরিবর্ত্তন ব্যতীত একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকে।

যৌবনে পদক্ষেপ

সেটী হইতেছে তার মাসিক ঋতুস্রাব। যে সমস্ত বালিকা ইতিপূর্ব্বে যৌন-জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা ঋতুস্রাবের সময় হইতে নিজেদের যৌন-অঙ্গের সংখ্যা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

যুবক-যুবতীর এই সমস্ত বাহ্য দৈহিক পরিবর্ত্তন পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরস্পরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে যুবকদের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্য্য থাকিলেও এই সময়ে তাহারা রতি-ক্রিয়ায় ততটা সক্ষম হয় না, যতটা হয় যৌবনের শেষ দিকে। বস্তুতঃ যৌবনের প্রাচুর্য্য হেতুই হউক, আর অনভ্যাসের দরুণই হউক, যৌবনের প্রারম্ভে যুবকেরা অতি-ব্যস্ততা-বশে প্রায়ই রতিক্রিয়ায় বিশেষ কৃতকার্য্য হয় না। যৌবনের চাঞ্চল্যের অবসানে যৌবনের শেষ দিকে যখন তাহাদের সকল কার্য্যে স্থৈর্য্য আসে, তখনই তাহারা রতি-ক্রিয়ায় সম্যকরূপে সক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু এই সময় শক্তির প্রাচুর্য্য-হেতু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বা আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা যৌন-বোধের তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শারীরিক পরিপুষ্টির

সহায়তা করাই সকল যুবক-যুবতীর কর্ত্তব্য। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের, শান্তি-অশান্তির অনেকখানি এই সময়কার সদাচার-অনাচারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

যুবক সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, যুবতী সম্বন্ধে তাহা অধিকতর প্রযুজ্য। নারী-দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্যহেতু যৌবনের প্রারম্ভে যুবতীরা রতিকার্য্যে তেমন পটু হইতে পারে না। নারীর প্রকৃত রতি-জীবন আরম্ভ হয় দুই-একটী সন্তান প্রসব করিবার পর হইতে। অনেক অনভিজ্ঞ পুরুষের ধারণা যে সন্তান প্রসবের দ্বারা নারীর যোনি-নালী প্রশস্ত হইয়া যাওয়ার ফলে সে তৃপ্তিদায়ক রতিক্রিয়ার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। এ ধারণা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রমাত্মক। নারীর যোনি-নালী এমন সঙ্কোচন-প্রসারণশীল তন্তু দ্বারা গঠিত যে প্রসবের পর দেড়মাসের মধ্যে উহা সম্পূর্ণ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সন্তান প্রসবের দ্বারা ঐ সমস্ত তন্তুর সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা বৃদ্ধি পাইয়া রতিক্রিয়ার অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে।

রতিক্রিয়ার প্রকৃত সময়

অনেকের বিশ্বাস, প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলে নারীর যৌন-বোধ ও রতি-ক্রিয়া-শক্তি কমিয়া যায় একথা সত্য নহে। ব্যক্তি-ভেদে নারীর সৌন্দর্য্যের ধারণাও পৃথক বটে, কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞের দৃঢ় অভিমত এই যে, নারী-দেহকে স্বাভাবিক প্রসাধনের সাহায্যে একটু গোছালো রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, নারীর সৌন্দর্য্য যৌবনের অবসানে প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সময় নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ায় তাহার দেহ একটা বিপুল ক্ষয়ের হাত হইতে

প্রৌঢ়ত্বে নারীর সৌন্দর্য্য

রক্ষা পায়। দ্বিতীয়তঃ, এই ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ায় নারীকে এই সময় সন্তান-ধারণের ও প্রসবের ন্যায় একটা বিরাট ঝুঁকি সহ্য করিতে হয় না। কাজেই নারীদেহ এই সময় সকল দিক দিয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রৌঢ়া নারীকে কি সে নিজে, কি তাহার স্বামী, কেহই যত্নের উপযুক্ত মনে করে না বলিয়াই কতকটা অযত্নে, কতকটা সজ্জার অভাবে, প্রৌঢ় নারী-দেহ সবলে বার্দ্ধক্যের কোঠায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হ্যাভ্‌লক্ এলিস্, ডাঃ ফিল্ডিং, ডাঃ হফ্‌ষ্টেটর প্রভৃতির অভিমত এই যে, প্রৌঢ়ত্বে নারী-দেহ যৌবন অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও লোভনীয় হইয়া থাকে।

ইহা ত গেল দেহের দিককার কথা। মন ও যৌন-বোধের দিক দিয়াও এই কথাই সত্য। প্রৌঢ়ত্বে নারী-দেহের সৌন্দর্য্য যদি বাড়ে, তবে সে পুরুষের যৌন-বোধ নিশ্চয়ই জাগ্রত করিতে পারে। সে নিজেও এই সময় যৌবনাপেক্ষা তীব্রভাবে রতি-বাসনা অনুভব করিয়া থাকে।

প্রৌঢ়ত্বে নারীর যৌন-বোধ

প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে ঋতুস্রাব না থাকায় সন্তান ধারণের ভীতিও তাহার থাকে না। এই নিরাপদ ভীতিহীনতা তাহাকে রতি-ক্রিয়ায় অধিকতর উৎসাহী ও শক্তিশালিনী করিয়া থাকে। এই কারণেই ৪০ হইতে ৫০ বৎসরের অনেক ইউরোপীয় বিধবাকে পুনর্ব্বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইতে এবং তদভাবে অনিয়মিত জীবন যাপন করিতে দেখা যায়।

ইহার বিপরীতও যে হয় না, তাহা নহে। বরঞ্চ অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রীর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার এবং স্বামীর রতি-শক্তি হ্রাস হওয়ার পর সত্যিকার স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় উভয়ের সম্বন্ধের মধ্যে কামভাবের প্রাধান্য না থাকায়

নিষ্কাম প্রেমের স্ফুরণ

সে সম্বন্ধ পবিত্র, নির্ম্মল ও নিষ্কাম প্রেমে পরিণত হয়। এই সময়েই আমাদের ভারতীয় পবিত্র আদর্শে স্ত্রী স্বামীর সত্যিকার সহধর্ম্মিণী হইয়া থাকে। এই সময়ে ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাধনায় এবং লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিবার অবসর পায়। পুরুষের দিক হইতে যাহাই হউক না কেন, নারীর দিক হইতে একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যে-সমস্ত নারী ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে বা লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইতিহাস-খ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াই তাহা করিয়াছেন।

প্রৌঢ়ত্বের পরেই বার্দ্ধক্য আসে। বার্দ্ধক্যের আগমনে নারী-দেহে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এতৎসঙ্গে যে মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা আরও আকস্মিক। হঠাৎ নারী একদিন নিজেকে সমস্ত দৈহিক ভোগের অযোগ্য অবস্থায় দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে নারীর মনে শেষ বারের মত যৌন-ক্ষুধা প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। বহু অবিবাহিতা, চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী ও মঠবাসিনী নারীকে বৃদ্ধ বয়সে পদ-স্খলিত হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে বা সাধারণতঃ যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। কারণ বহু বৃদ্ধা নারী নিজের বার্দ্ধক্যকে প্রকৃতির দুর্ণিবার বিধান বলিয়া প্রশান্ত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অতীত যৌবনের ক্রটী, বিচ্যুতি ও পদস্খলনের জন্য ধীরভাবে মানসিক প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হয়।

বার্দ্ধক্যে

রতি-শক্তির দিক হইতে বিচার করিলে পুরুষকে প্রৌঢ় অবস্থাতেই বৃদ্ধ

বলা যাইতে পারে। সত্য বটে, পুরুষ অধিকাংশ স্থলে শেষ বয়স পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদনের উপযুক্ত থাকে। কিন্তু সন্তানোৎ-পাদনের ক্ষমতা এক কথা, আর রতিশক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। শুক্র-কীট অধিকাংশ স্থলে অতি বৃদ্ধের শুক্রেও বিদ্যমান থাকে। এই শুক্র-কীট কোন প্রকারে উৎপাদিকা-শক্তি-সম্পন্ন নারীর জরায়ু-মুখে প্রবেশ করিলেই সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা হয়। তজ্জন্য বিশেষ রতি-শক্তি থাকিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কোনও বৃদ্ধের শুক্রে সন্তানোৎপাদন হইলেই মনে করা উচিত নয় যে, সে রতিশক্তিতে বিশেষ সমর্থ। ফলতঃ পুরুষ প্রৌঢ়ত্বের মধ্যসীমা অতিক্রম করিবার পর সাধারণতঃ রতি-শক্তিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অনেক শরীর-বিজ্ঞানবিদের মতানুসারে পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে পুরুষের এই অবস্থা দৃষ্ট হয়। অনেকের আবার মত এই যে, উহার অনেক পূর্ব্বে চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পুরুষের রতি-শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ করে।

বার্দ্ধক্যে পুরুষের রতিশক্তি

বার্দ্ধক্যে পুরুষ তাহার রতি-শক্তি হারাইয়া ফেলে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহার বাসনার হ্রাস হয় না। বরং রতি-শক্তিহীনতা তাহার প্রাণে বাসনার তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সমস্ত পুরুষ যৌবনে যথেষ্ট পরিমাণে নারী ভোগ করিয়াছে, তাহারাই যে কেবল বার্দ্ধক্যে রতি-উন্মত্ত হইয়া উঠে তাহা নহে; এমনও দেখা গিয়াছে যে, যৌবনে সংযমী, চিরকুমার পুরুষ হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে অত্যধিক মাত্রায় কামোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাভ্‌লক্ এলিসের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সমস্ত

বার্দ্ধক্যে পুরুষের রতি-বাসনা

পুরুষ পর-স্ত্রীর উপর যৌন-বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৃদ্ধ—এমন কি, রতি-শক্তির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরুষ এই বয়সে রতি-শক্তি হারাইয়া ফেলে। তাহাদের লিঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তাহাদের বর্দ্ধিত বাসনায় তাহারা কিরূপে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে? হ্যাভ্‌লক্ এলিস্, লেপ্‌ম্যান্ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা এই যে, বৃদ্ধেরা এই সময় দর্শন, প্রদর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা নিজেদের বর্দ্ধিত যৌন-বোধের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে।

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ক্রাফট্ এবিংএর মত এই যে, বার্দ্ধক্যে এই বর্দ্ধিত যৌন-স্পৃহা অস্বাভাবিক নহে এবং বৃদ্ধদের উপরোল্লিখিত কার্য্যাবলীও অস্বাভাবিকত্বের নিদর্শন নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ সমস্তই বার্দ্ধক্যের অস্বাভাবিক অবস্থা এবং কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে মানুষের মধ্যে যৌন-স্পৃহা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও সুস্থ দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় পুরুষ সে-স্পৃহাকে সাফল্যের সহিত সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। অন্ততঃ আমাদের দেশে ঐরূপ যৌন-কেলেঙ্কারী সচরাচর ঘটিতে দেখা বা শোনা যায় না।

ডাঃ কিশ্‌ মধ্য-ইউরোপের নারী-জীবনে যৌন-চেতনার ক্রমবিকাশ ও হ্রাস-বৃদ্ধির একটি সুন্দর গ্রাফ্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতদের গবেষণায় জার্ম্মানী ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের নারীদের দৈহিক পরিণতি ও অবনতির গড় যেভাবে দাঁড়াইয়াছে ঐ গ্রাফে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত চিত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইবে যে বালিকাদের সাবালকত্বের পর হইতে তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও যৌন-চেতনা দ্রুত বেগে বৃদ্ধি

৬নং চিত্র
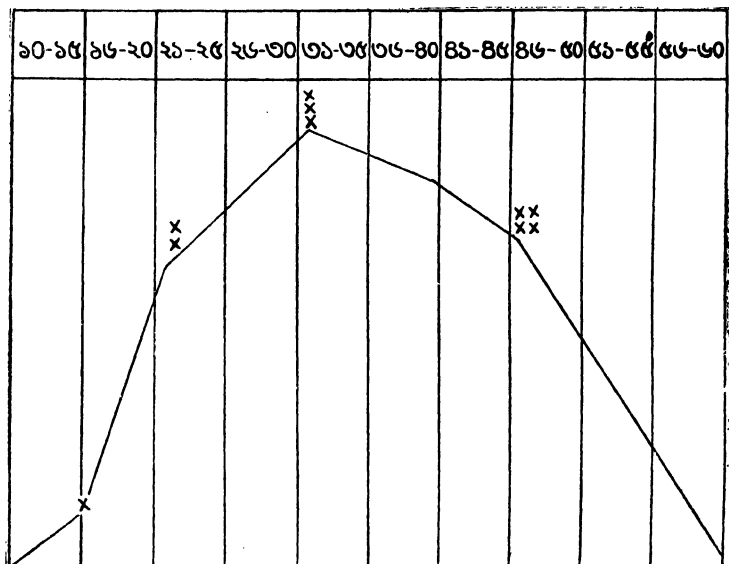
× প্রথম ঋতু-দর্শন—১৫।১৬ বৎসর।

× ×
বিবাহ—২১।২২ বৎসর।

× × ×
যৌন-জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তর—৩১।৩২ বৎসর।

× × × ×
ঋতু বন্ধ হওয়া—৪৬।৪৭ বৎসর।

প্রাপ্ত হইতে থাকে। বিবাহের পরে এত দ্রুত না হইলেও অনুরূপ পরিণতি হইতে হইতে প্রায় ৩১।৩২ বৎসর বয়সে উহারা যৌন-জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে তাহাদের যৌন-জীবনের ক্রম অবনতি প্রকাশ পাইতে থাকে। ৪৬।৪৭ বৎসর বয়স হইতে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যৌন-চেতনা এবং দৈহিক সৌন্দর্য্য অতি দ্রুত বেগে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই স্তর হইতেই নারীর বার্দ্ধক্য আরম্ভ হয়।

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত এইরূপ কোন গবেষণা হয় নাই। কারণ এখানে নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব বা সূত্র পাওয়া যায় না। আমাদের মতে ঐরূপ বর্ণনা দিতে হইলে উক্ত চিহ্নগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যথা :—

× —১২।১৩ বৎসরে প্রথম ঋতু-দর্শন।

×
× —১২।১৬ বৎসরে বিবাহ।

×
× —২৬।২৭ বৎসরে যৌন-জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তর।
×

× ×
× × —৪২।৪৬ বৎসরে ঋতু বন্ধ হওয়া।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সারদা আইন প্রচলিত হওয়ায় বিবাহ-বয়সের গড় এখন ক্রমে বাড়িতে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। বাল্যবিবাহই আমাদের দেশে অকাল-বার্দ্ধক্যের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দেশ-গত, জাতি-গত ও আবহাওয়া-গতভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে রতি-প্রকৃতির যে পার্থক্য আছে, ব্যক্তিগতভাবে রতি-প্রকৃতির পার্থক্য

তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও তীব্র। পৃথিবীর অধিকাংশ যৌন-বৈজ্ঞানিক একথা স্বীকার করিয়াছেন। তদুপরি ডাঃ ফোরেল আরও বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে রতি-প্রকৃতির পার্থক্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে অনেক বেশী।

ব্যক্তি-ভেদে রতি-প্রকৃতির পার্থক্য

ভারতীয় ও আরবীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইউনানীয় যৌন-বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মিডার এ বিষয়ে গবেষণার সূচনা করেন। ইহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ নারী-পুরুষের অঙ্গের আকৃতি ভেদে পুরুষকে শশক, বৃষ ও অশ্ব এবং নারীকে মৃগী, অশ্বিনী ও হস্তিনী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, একথা আমরা পূর্ব্ব-অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি। রতি-প্রকৃতি অনুসারেও তাহারা নারী-পুরুষকে অনুরূপভাবে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী বিভাগ তাঁহাদের সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতির জন্য আমাদের নিকট অবৈজ্ঞানিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের একটা সত্যানুরাগ ও অনুসন্ধান-স্পৃহা দেখিতে পাই। শাস্ত্র-পীড়িত যে প্রাচীন ভারতে মানুষের সমস্ত দোষ গুণকে বর্ণও শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা হইত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যে প্রাচীন ভারতে একেবারে ছিল না বলিয়া অনেক বৈদেশিকের ধারণা, সেই প্রাচীন ভারতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কতটা স্বীকৃত হইয়াছিল এই শ্রেণী-বিভাগ তাহার প্রমাণ। শ্রেণী, সমাজ ও বর্ণের ঊর্দ্ধেও যে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে বহু গুণাগুণের অধিকারী হইতে পারে—এই শ্রেণী-

ভারতীয় শ্রেণী বিভাগের বৈশিষ্ট্য

বিভাগে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য কোনও কারণে না হইলেও শুধু এই কারণে এই শ্রেণীবিভাগ ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ রতি-প্রকৃতি অনুসারে পুরুষকে শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব এই চারি শ্রেণীতে এবং নারীকে পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত চারি শ্রেণীর পুরুষ ও চারি শ্রেণীর নারীর দৈহিক ও মানসিক বিবরণও তাঁহারা দিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ যদি সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তবু এক শ্রেণীর সমস্ত গুণ এক ব্যক্তিতে দেখা যায় না বলিয়া উহাদের কার্য্যকরী গুণ বা প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী নহে। তথাপি আমরা ঐ সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে চাই এইজন্য যে, এক শ্রেণীর সমস্ত গুণ আজকাল একই ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না, শুধুমাত্র এই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতবাদকে উপেক্ষা করা অন্যায় হইবে। তাহা ছাড়া ঐ সমস্ত গুণের অধিকাংশ, অন্ততঃ কতকগুলি, ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে দৃষ্ট হইলেও, তদ্দ্বারা নারী বা পুরুষ বিশেষের চরিত্র বিচারের একটা সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শশক ঃ—শশকের কামপ্রবৃত্তি খুব কম বলিয়া অনুরূপ পুরুষকে শশক নাম দেওয়া হইয়াছে। রতিক্রিয়ায় শশক এত দুর্ব্বল যে, ঐ কর্ম্মের পর শশক ভূপতিত হয়। সেইরূপ শশকজাতীয় পুরুষ রতিক্রিয়ায় খুব অপটু এবং ঐ ক্রিয়াকে বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য বলিয়া ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। শশকজাতীয় পুরুষের লিঙ্গ যে ক্ষুদ্র সেকথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুরুষ মধ্যমাকৃতি, তাহারা

চারি প্রকার পুরুষ

শশক

দেখিতে সুশ্রী, ভগবানে ও গুরুজনে ভক্তিপরায়ণ, দয়ার্দ্রচিত্ত এবং মিষ্টভাষী হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে কালযাপন করিয়া থাকে এবং অতিশয় অল্পভোজী হয়।

মৃগ ঃ—মৃগ খুব দ্রুতগামী ও কর্ম্মঠ জীব বটে, কিন্তু সঙ্গমে সে ততদূর পটু নহে। সেইজন্য অনুরূপ গুণবিশিষ্ট পুরুষকে মৃগ বলা হইয়া থাকে।

মৃগ

এই শ্রেণীর পুরুষের দেহ দীর্ঘায়ত, সুগঠিত হইয়া থাকে। সে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হাটিয়া থাকে। সর্ব্বদা হাসি মুখে থাকে। ভগবদ্ভক্তি-সূচক গান গাইতে ভালবাসে। খুব বেশী খাইতে পারে।

বৃষ ঃ—এই শ্রেণীর লোক ষাঁড়ের মত যৌন-ক্ষুধার্ত্ত। ষাঁড় যেমন রতি-বাসনা পূরণের জন্য গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু মাইল অতিক্রম করিতে

বৃষ

কুণ্ঠিত নহে, সেইরূপ বৃষজাতীয় পুরুষ তাহার অভিলষিত নারীর জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে। এই জাতীয় পুরুষ বেঁটে, মোটাসোটা। তাহার বক্ষ প্রশস্ত, বাহু পেশী-বহুল ও মাথা খুব বড় হয়। তাহার গায়ের চামড়া অতিশয় পুরু। তাহার প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও মেজাজ কড়া। তাহার জিহ্বা খুব লম্বা। সে খাইতে পারে খুব বেশী। সে কেবলই মেয়েদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

অশ্ব ঃ—এই জাতীয় পুরুষ রতিক্রিয়ায় অশ্বের মত শক্তিশালী বলিয়া ইহাদিগকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের লিঙ্গ অস্বাভাবিক

অশ্ব

রূপে দীর্ঘ। ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ কৃষ্ণ হয়। ইহাদের কর্ণ দীর্ঘ, শরীর দীর্ঘ ও মোটা, বুক প্রশস্ত,

বাহু অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের ঘুম খুব কম হয়। মিথ্যা বলা ইহাদের অভ্যাস। পর নিন্দাতে ইহারা খুব পটু। রতিক্রিয়ায় ইহারা রুচিশীল নহে। যে কোনও প্রকার নারী হইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। ইহারা সাধারণতঃ উচ্চৈস্বরে কথা বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক শ্রেণীর সমস্ত গুণ একই ব্যক্তির মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। একই ব্যক্তির মধ্যে আমরা সচরাচর হয়ত মৃগের এক গুণ, শশকের আর এক গুণ, বৃষের অপর গুণ এবং অশ্বের একগুণ দেখিয়া থাকি। কিম্বা একজনের মধ্যে কতক মৃগের, কতক বৃষের, এইরূপে এক শ্রেণীর বেশী এক শ্রেণীর কম গুণাবলী দেখিয়া থাকি। তবে ইহা সত্য যে, যে ব্যক্তির মধ্যে যে শ্রেণীর গুণ বেশী দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই শ্রেণীভুক্ত করিলে খুব বেশী ভুল হইবে না।

সূক্ষ্মতার আতিশয্য

চারি প্রকার নারী

রতি-প্রকৃতি অনুসারে নারীকে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

পদ্মিনী

পদ্মিনী ঃ—পদ্মিনী নারী দেখিতে খুব সুন্দরী। তাহার দেহ সুগঠিত, দীর্ঘ। তাহার চক্ষু পদ্মের ন্যায় প্রশস্ত ও দীর্ঘায়ত। তাহার শরীর সর্ষপ-কুসুমের ন্যায় কোমল। পদ্মিনী নারীর চর্ম্ম কখনও কৃষ্ণবর্ণ হইবে না। তাহার স্তন সুঠাম, সুগঠিত, উন্নত। তাহার নাসিকা সুগঠিত ও ঋজু, গলা মধ্যমাকৃতি, যোনি পদ্মের পাপড়ি-সদৃশ ও সুগন্ধি। তাহার গমন-ভঙ্গী মরাল-সদৃশ, তাহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। সে খুব অল্পাহারী। তাহার ঘুম খুব পাতলা। সে খুব বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা। সে সর্ব্বদা সুরুচিসম্মত মূল্যবান সাদা পোষাক পরিতে ভালবাসে।

চিত্রানী ঃ—চিত্রানা নারী মধ্যমাকৃতি ; ক্ষীণাঙ্গী, দেখিতে অতিশয় সুশ্রী। তাহার গ্রীবা গোলাকার ও সুগঠিত শঙ্খের মত। তাহার ওষ্ঠ সুগঠিত ও ঈষৎ উন্নত। তাহার চক্ষু মৃগচক্ষুর ন্যায় চঞ্চল। তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীব্র। তাহার গতি-ভঙ্গী হস্তীর ন্যায় ম্যাজেষ্টিক। তাহার পয়োধর পিনোন্নত ও সুগঠিত, নিতম্ব ও উরু অতিশয় সুদৃশ্য, কিন্তু পদদ্বয় সরু। তাহার যৌবনকেশ অতিশয় পাতলা। তাহার কামাদ্রি ও ভগদেশ মাংসল, গোলাকার। সে স্বভাবতঃ নৃত্য-গীত-প্রিয়, সে চুম্বন, আলিঙ্গন মর্দ্দনাদি শৃঙ্গার-ক্রিয়ায় অত্যন্ত আসক্ত। বাদ্যযন্ত্র, চিত্র, সুন্দর সুন্দর পোষাক ও সুগন্ধি বিলাস দ্রব্য তাহার অতিশয় প্রিয় জিনিষ। সে রতিক্রিয়ায় অতিশয় আসক্ত নহে।

চিত্রানী

শঙ্খিনী ঃ—শঙ্খিনী নারী তন্বী, তাহার শিরে বিপুল কেশরাজি, ললাট প্রশস্ত ও উন্নত। তাহার হস্তদ্বয় দীর্ঘ ও নিতম্ব বৃহদাকার। তাহার স্তনদ্বয় শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত মানান-সই নহে—হয় খুব বড় নয় অতিশয় ছোট। তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় উচ্চ, কর্কশ ও ভগ্ন। তাহার নাসিকা অতিশয় লম্বা। সে লাল ফুল ও লাল পোষাক অতিশয় ভালবাসে। তাহার কামাদ্রি ও ভগদেশ ঈষৎ নিম্নাভিমুখে ঝুলায়মান ও ঘন ও মোটা কেশে আবৃত। সে অতিশয় কামুকা এবং রতিক্রিয়ার সময় পুরুষকে দংশন করিয়া বা অন্য উপায়ে জখম করিয়া থাকে।

শঙ্খিনী

হস্তিনী ঃ—হস্তিনী নারী অতিশয় মোটা ও বেঁটে। তাহার ঘাড় অতিশয় মোটা। পদাঙ্গুলি ঈষৎ বক্রাকৃতি। তাহার নিতম্ব ও উরু

অতিশয় বৃহৎ ও মাংসল। তাহার চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহা হইতে কামভাব ও লোভ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। তাহার ঠোঁট মোটা ও কম্পমান, তাহার মাথার কেশ পিঙ্গলবর্ণ। সে স্বভাবতঃ নির্লজ্জ; শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখা ব্যাপারে সে ইচ্ছা করিয়াই আলস্যবতী। তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও উচ্চ। সে ঝাল ও টক খাইতে ভালবাসে। তাহার যোনি অতিশয় প্রশস্ত ও গভীর। তাহার কামাদ্রি সমুন্নত ও ভগপ্রদেশ বিস্তৃত।

হস্তিনী

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে মোটামুটি বহুদর্শনের ও সূক্ষ্মবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে একটা অবৈজ্ঞানিক দোষ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৌনবোধের স্বল্পতা-আতিশয্যের সঙ্গে চরিত্রগত অন্যান্য দোষ-গুণকে মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রকারগণ যেন এই পূর্ব্ব-সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন যে, যৌনবোধ বা রতিশক্তি যে পুরুষ বা নারীর মধ্যে বেশী থাকিবে, তাহার মধ্যে অন্য সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। যৌনবোধের স্বল্পতা ও আতিশয্য দ্বারা মানুষের নৈতিক চরিত্র পরিমাপ করা উচিত হইবে না। বস্তুতঃ রতিশক্তি কম থাকিলেই মানুষ ধার্ম্মিক হইবে, আর উহা বেশী থাকিলেই অধার্ম্মিক হইবে, ইহা কোনও কাজেরই কথা নহে।

শ্রেণীবিভাগের দোষ

রতি-প্রকৃতিভেদে ভারতীয় পণ্ডিতগণের অনুসৃত অনুরূপ নীতিতে নারী জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার চেষ্টা ইউরোপেও হইয়াছে। যৌন-বৈজ্ঞানিক মিডার মনোবিশ্লেষক নীতিতে নারীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে নারী

মিডারের শ্রেণী বিভাগ

জাতি মোটামুটি দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণী সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মভীরু, পতিপরায়ণা, ও অল্পে তুষ্ট ; ইহারা রতিকার্য্যে বিশেষ পটু নহে ; স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং সন্তানোৎপাদনের জন্যই ইহারা রতিকার্য্য করিয়া থাকে, এই দুই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও কারণে রতিকার্য্যে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শন করাকে ইহারা নারীর পক্ষে অশোভন বেহায়াপনা মনে করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর নারীকে মিডার জরায়ু-প্রধান নারী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর নারী আছে, যাহারা বিলাসিনী, রতিসম্ভোগ-প্রিয়া। ইহারা সর্ব্বদা রতিকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসে। নিজেকে পুরুষের চক্ষে মনোহারিনী করিবার জন্য ইহারা সাজ-সজ্জার বিশেষ পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর নারীকে মিডার ভগাঙ্কুর-প্রধান নারী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। মিডারের এই শ্রেণী বিভাগ বহু মনোবিশ্লেষক যৌন-বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ফরাসী যৌন-বৈজ্ঞানিক লমোনিয়ের (Laumonier) এবং রেনে গাইওঁ (Rene Guyon) মিডারের মতবাদকে রীতিমত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। তবে গাইওঁ উক্ত শ্রেণীবিভাগকে নারীজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া পুরুষের উপর প্রয়োগের সমর্থন করিয়াছেন।

জরায়ু-প্রধান নারী

ভগাঙ্কুর-প্রধান নারী

মিডারের এই শ্রেণী বিভাগ ভারতীয় পণ্ডিতগণের শ্রেণী বিভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম না হইলেও, মনোবিশ্লেষক নীতির ন্যায় বৈজ্ঞানিক মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

রেনে গাইওঁ মিডারের শ্রেণী বিভাগের অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া পুরুষকেও রতিপ্রকৃতি অনুসারে যে দুই শ্রেণীতে ভাগ

গাইওঁএর শ্রেণী বিভাগ

করিয়াছেন, উহা আজিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন না করিলেও এবং সকল শ্রেণীর যৌন-বৈজ্ঞানিক-কর্ত্তৃক গৃহীত না হইলেও, এ স্থলে উহার উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। গাইওঁ পুরুষকে শিরা-প্রধান ও লিঙ্গ-প্রধান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শিরা-প্রধান

শিরা-প্রধান পুরুষ

পুরুষ জরায়ু-প্রধান নারীর ন্যায় অল্পে তুষ্ট। সে রতিক্রিয়ার প্রতি খুব বেশী আসক্ত নহে। মাঝে মাঝে কোন প্রকারে শুক্রস্খালন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। সে নিষ্ঠাবান স্বামী, স্নেহময় পিতা, ঘোর সংসারী। আর লিঙ্গ-প্রধান

লিঙ্গ-প্রধান পুরুষ

পুরুষ ভগাঙ্কুর-প্রধান নারীর ন্যায় অতিশয় রতিকামী, সে এক নারীতে তৃপ্ত নয়, সর্ব্বদা শৃঙ্গার ও রতিচিন্তায় মগ্ন।

বলা বাহুল্য ভারতীয় পণ্ডিতগণের শ্রেণীবিভাগে যেমন অনাবশ্যক

স্থূলতার আতিশয্য

সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয়, তেমনই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শ্রেণী বিভাগে অতিরিক্ত মাত্রায় স্থূলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নারীর ঋতুস্রাবের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ মোটামুটি এক মত। মাসিক ঋতুস্রাব নারীর রতি-বাসনার নিয়ামক বলিয়া নারীর যৌনবোধের সহিতও চন্দ্রের

নারীর যৌনবোধে চন্দ্রের প্রভাব

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একরূপ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যৌন-বিজ্ঞান-বিৎ হেক্রফ্‌ট্, জুলিয়াস নেল্‌সন্, ভন্ রোমার হইতে আরম্ভ করিয়া ডাঃ মন্‌রো ফক্স্ ও হাভ্‌লক্ এলিস্ পর্য্যন্ত সকলে গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন

যে, নারীর রতি-বাসনা চন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা জোরের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্‌। তিনি নানা প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নারীর যৌনবোধের উপর চন্দ্রের গতিবিধির অসাধারণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু ঐ সমস্ত পণ্ডিতগণ আরবীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত এ বিষয়ে কোনও বিস্তৃত বিবরণে প্রবেশ করেন নাই। বাৎসায়ন, কোকা পণ্ডিত, কল্যাণমল প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতগণ এবং বহু আরবীয় পণ্ডিত নারীর রতি-বাসনার উপর চন্দ্রের প্রভাবের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বিস্তৃত আলোচনা গবেষণার ফল, অথবা ঐ সমস্ত পণ্ডিতের অনুমান মাত্র, তাহা নির্ভুলরূপে বলা শক্ত। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ঐ সকল উক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে যদিও আমাদের আপত্তি আছে, তথাপি রতিশাস্ত্র-বিষয়ক পুরাকালের ধারণা ও মতামত হিসাবে ঐ সমস্ত বিবরণ আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করিতে পারে। সেজন্য নিম্নে আমরা নারীর রতি-বাসনার জোয়ার ভাটার কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

ভারতীয় ও আরবীয় যৌন-বিজ্ঞানবিৎদের অভিমত এই যে, চন্দ্রের উত্থান পতনের সঙ্গে নারীর যৌনবোধ তাহার শরীরে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত উঠা নামা করে। চান্দ্রমাস দুইভাগে বিভক্ত। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। প্রথম যে পনর দিনে চন্দ্র বাড়িতে থাকে তাহাকে শুক্ল ও শেষের যে পনর দিনে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে।

চন্দ্রের গতির সহিত নারীর রতিবোধের উত্থান পতন

শুক্লপক্ষে স্ত্রীলোকের রতিবাসনা শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কৃষ্ণপক্ষে

বামপার্শ্বে বিদ্যমান থাকে। চন্দ্রের প্রথম তিথিতে স্ত্রীলোকের রতিবাসনা তাহার দক্ষিণ পা হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া উত্থিত হইয়া ক্রমে পায়ের পাতা, থোড়, উরু, জঙ্ঘা, কটি, কোমর, নাভি, স্তন, ঘাড়, চিবুক, গাল, ঠোঁট, চক্ষু ও কপাল ভ্রমণ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে মস্তকোপরি আরোহণ করিয়া কৃষ্ণপক্ষে ঠিক ঐরূপে বামপার্শ্ব দিয়া আবার পায়ে অবতরণ করিয়া থাকে। 'লজ্জতন্নেসা' নামক বিশ্ববিখ্যাত যৌন-শাস্ত্রের মতে নারীর রতি-বাসনা চান্দ্রমাসের ১ম দিনে ডান কাণে, ২য় দিনে বগলে, ৩য় দিনে বাহুতে, ৪র্থ দিনে পৃষ্ঠে, ৫ম দিনে স্তনে, ৬ষ্ঠ দিনে নাভিতে, ৭ম দিনে বাম কাণে, ৮ম দিনে গলায়, ৯ম দিনে ডান উরুতে, ১০ম দিনে দক্ষিণ জানুতে, ১১শ দিবসে চিবুকে, ১২শ দিবসে বাম কাঁধে, ১৩শ দিবসে ডান কাঁধে, ১৪শ দিবসে কোমরে, ১৫শ দিবসে পায়ের পাতায় অবস্থিত থাকে। উভয় মতের পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট তারিখে বর্ণিত স্থানে চুম্বন, মর্দ্দন, ঘর্ষণ ও লেহন করিলে নারীর কামেচ্ছা উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত মতবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত অত সূক্ষ্মভাবে রতি-বাসনার স্থানীয় ব্যাখ্যা না করিলেও, ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ যে চন্দ্রের সহিত নারীর রতি-বাসনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন, সে কথা আমি এই অনুচ্ছেদের গোড়াতেই বলিয়াছি।

অবশ্য মেরী ষ্টোপ্‌সের পূর্ব্বেও মার্শাল, সেল্‌হিম, ভন্ ওট্, হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ প্রভৃতি অনেক যৌন-তাত্ত্বিক চন্দ্রের সহিত নারীর রতি-বাসনার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে চিরপ্রচলিত মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ ষ্টোপ্‌সের থিওরী

তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুস্রাবের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে ঋতুস্রাবের দিন পর্য্যন্ত এবং ঋতুস্রাবের পরে কয়েক দিন নারীর রতি-বাসনা তীব্র হয়। ইহাদের মধ্যে মার্শাল আবার তাঁহার Physiology of Reproduction পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"The period of most acute sexual feeling is generally just after the close of the menstrual period", অর্থাৎ ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পরের কয়েক দিনই নারীর মধ্যে রতি-বাসনা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র হয়। এলিস্ ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরের কয়েক দিনের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই এই একটী বিষয়ে একমত যে, নারীর রতি-বাসনা তাহার ঋতুস্রাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটী অব মেডিসিন ১৯১৬ সালের কার্য্যবিবরণীতেও এই মতবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ নারীর ঋতুস্রাবের সহিত তাহার রতি-বাসনার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দাবী এই যে, তিনি এ বিষয়ে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নারীর রতি-বাসনার সহিত তাহার ঋতুস্রাবের কোনও সংশ্রব নাই। তাঁহার গবেষণার ফল এই যে, সমস্ত প্রাণী-জগতেই বৎসরের ঋতু বিশেষে যে গর্ভাধান ও জন্মদান কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার অর্থ এই যে, ঐ সময় সমস্ত প্রাণীর স্ত্রীজাতির মধ্যে রতি-বাসনা তীব্র হয়। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে বৎসরের ঋতু বিশেষে যেমন রতি-বাসনা তীব্র হয়, মানবের মধ্যেও তেমনি চান্দ্রমাসের সময় বিশেষে রতি-বাসনা তীব্র হয়। বিভিন্ন নারীতে এই রতি-বাসনা চান্দ্রমাসের বিভিন্ন সময়ে জাগ্রত হইতে

পারে, কিন্তু মাসে মাসে নিয়মিতভাবে উহা জাগ্রত হইবেই। ডাঃ ষ্টোপ্‌সের মতে প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর নারীর এই রতি-বাসনা জাগ্রত হয়। ফলে ২৮ দিনের প্রত্যেক চান্দ্রমাসে প্রত্যেক নারী দুইবার রতি-বাসনার তীব্রতা অনুভব করে। শারীরিক ক্লেশ, মানসিক বিপ্লব, বর্ত্তমান সভ্যতা-প্রসূত নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্য, যৌন-উত্তেজক আধুনিক বস্তু ও বিষয় সমূহ নানাপ্রকারে নারী-পুরুষের যৌন-বাসনার স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে স্বাভাবিক রতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার অসুবিধার কথা মেরী ষ্টোপ্‌স্‌ও স্বীকার করিয়াছেন। তবু একথা তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, নারীর রতি-বাসনা মোটামুটি চান্দ্রমাসের পাক্ষিক চক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

চান্দ্রমাসের এই পাক্ষিক গতির সহিত ঋতুস্রাবের কোনও সংশ্রব নাই বলিয়া ডাঃ ষ্টোপ্‌স্‌ খুব জোর গলায় বলিলেও, তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত রতি-তরঙ্গ ঋতুস্রাবের দুই তিন দিন পূর্ব্বে একবার এবং ঋতুস্রাবের আট নয় দিন পরে একবার সর্ব্বোচ্চ রেখায় উত্থিত হয়। ইহাতে কিন্তু নারীর রতি-বাসনা সম্পূর্ণ ঋতুস্রাব-নিরপেক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যৌন-বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ

বিবাহ—বিবাহের ইতিহাস—বিবাহের প্রয়োজনীয়তা—যৌন-নিবৃত্তির অপকারিতা—বিশেষজ্ঞের অভিমত—যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব—মানুষের ঈর্ষা-তৎপরতা—বিভিন্ন বিবাহ-প্রথা—এক-পত্নীক বিবাহ—বহু-পত্নীক বিবাহ—বহু-পতিক বিবাহ—দলগত বিবাহ—বিবাহের বিভিন্ন প্রণালী—প্রাচীন ভারতের আট প্রকার বিবাহ-প্রণালী—বিবাহের স্থায়িত্ব—সতী-দাহ-প্রথা—বিবাহের উদ্দেশ্য—সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সাত রূপ—বিবাহের উপকারিতা—বংশ-বৃদ্ধি—কামেচ্ছা নিবৃত্তি—মৈত্রী—সাহচর্য্য—মানব-মনের বিস্তৃতি সাধন—বিবাহের দোষ—একঘেয়েমী—আত্মিক সাধনায় বিঘ্ন—অর্থ-নৈতিক দায়িত্ব—নারীর পক্ষে বিবাহে অসুবিধা—বিবাহের পাত্র-পাত্রী বিচার—রক্ত-সম্বন্ধ বিচার—নিকট আত্মীয় বিবাহ—মধ্যপন্থা—বিবাহে বিবেচ্য বিষয়—রূপ-রুচির বিভিন্নতা—গুণ—বংশ—আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা—বয়স—বাল্য-বিবাহ বনাম যৌবন-বিবাহ—আদর্শ-বিবাহ—ঐকিক-বিবাহ—দাম্পত্য-জীবনে সুখ—প্রধান সূত্র—দৈহিক সামঞ্জস্য—যৌন-উপযোগিতা—যৌন-জ্ঞান—মানসিক সামঞ্জস্য—আমাদের কথা—প্রাচীন পণ্ডিতগণের অভিমত—দম্পতির রতি-ক্রিয়ার তিন দিক—ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে স্ত্রীর গুণ—বরের গুণ বিচার—দৈহিক-বৈশিষ্ট্য দর্শনে চরিত্র-নির্ণয়ের প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাচীন পদ্ধতির নির্ভর যোগ্যতা—আসঙ্গ বিবাহ—

ধর্ম্ম, সমাজ অথবা আইনের স্বীকৃত-রূপে দুইটী বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির স্থায়ী অথবা স্থায়িত্বের আশাযুক্ত যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের নামই বিবাহ। উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, বিবাহের মধ্যে তিনটী মূল-সূত্র বিদ্যমান আছে :

বিবাহ

(১) বিপরীত লিঙ্গের দুই জন লোকের প্রয়োজন। বিবাহ প্রধানতঃ যৌন-সম্পর্ক স্থাপন বলিয়াই বিপরীত লিঙ্গ হওয়া প্রয়োজন।

(২) যৌন-সম্পর্ক স্থায়ী হইবে, এই আশা থাকা চাই।

(৩) ঐ সম্পর্ক ধর্ম্ম, সমাজ অথবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই।

এই তিনটী গুণের সব-কয়টীর সমাবেশ না হইলে তাহাকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না।

বিবাহের ইতিহাস

আদি মানব-সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। মানুষ তখন পশু-পক্ষীর মত ইচ্ছা মত যাহার-তাহার সঙ্গে যখন-তখন মৈথুন করিতে পারিত। বিবাহ-প্রথার দ্বারা মানুষের মৈথুন-ক্রিয়াকে সংযত ও নিয়মাধীন করা হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বিবাহ-প্রথা যৌন-মিলনের সুবিধার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, অসুবিধার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। অন্যান্য সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মত বিবাহ একটা অনুষ্ঠান মাত্র। মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র যৌন-বৃত্তির এমন কঠোর নিয়মের বল্গা পরাইয়া দিল কেন ?

লাবক, মর্গান্, ব্যাকোফ্যান্, ম্যাক্‌লেশান্, ব্যাষ্টিয়ান্ ও উইলক্যান্স্ প্রভৃতি সমাজ বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, মানুষ যখন সভ্যতার দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া সমাজ-বদ্ধ হইল, তখন হইতে বিবাহ প্রথার প্রচলন হইল। কারণ এই সময়ে মানুষ দলবদ্ধভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। একদল আরএক দলের প্রতি বিশেষ শত্রু-ভাবাপন্ন ছিল। এই দল-গত শত্রুতার জন্য প্রত্যেক দলই আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দিকে সর্ব্বদা তৎপর থাকিত। দ্বিতীয়তঃ লোক-বল বৃদ্ধির জন্যও প্রত্যেক দলই বিশেষ চেষ্টা করিত। আভ্যন্তরীন শক্তি ও লোক-বল বৃদ্ধি এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যের জন্যই বিবাহ-প্রথা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিবাহ প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, অন্যথায় নারী-রূপ সম্পত্তির অধিকার ও ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ হইত। ইহাতে দলের লোকদের ঐক্য, প্রীতি ও সংহতি নষ্ট হইত। সেজন্য দলের কর্ত্তা নিজের ইচ্ছা মত যৌন-মিলনের ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিত। ইহাই ক্রমে বিবাহের অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। লোক-বল-বৃদ্ধির জন্য বিবাহের প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, অভিজ্ঞতার দ্বারা দলের কর্ত্তারা বুঝিয়াছিল, যৌন-মিলন দুই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে অর্থাৎ এক নারী একই পুরুষের শুক্র ধারণ করিলে সে যত শীঘ্র-শীঘ্র গর্ভবতী হয়, বহু পুরুষের শুক্র ধারণ করিলে তত শীঘ্র-শীঘ্র গর্ভবতী হয় না। এই ভূয়োদর্শন হইতে দলের নেতারা বেপরোয়া যৌন-মিলন নিষিদ্ধ করিয়া রতি-ক্রিয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইহাও ক্রমে বিবাহ-প্রথারূপে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

মানব-সভ্যতার ঐ স্তরে নারী পুরুষের রতি-বাসনা পূরণের পাত্র ও মানুষ তৈয়ারীর যন্ত্ররূপেই গণ্য হইত। সেই জন্য দল-গত যুদ্ধ-বিগ্রহে গরু, ঘোড়া, উট প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নারী দখল করিবারও চেষ্টা করিত। যুদ্ধে পরাজিত দলের পুরুষগুলিকে হত্যা করিয়া নারীদিগকে বন্দিনীরূপে আনয়ন করা হইত এবং বিজয়ী দলের পুরুষদের মধ্যে উহাদিগকে বণ্টন করা হইত। এইভাবে বিজয়ী দলের এক-এক পুরুষের দখলে বহু নারী থাকিত। ইহাদের দ্বারা তাহারা সন্তানোৎপাদন করিয়া নিজেদের দলের লোক-বল বৃদ্ধি করিত।

সভ্যতার পরবর্ত্তী ধাপে পদার্পণ করিয়া পুরুষ নারীকে আরও একটু

অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্তানোৎপাদনের পর সন্তান পালনের বেলা নারীর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া এবং গৃহ-কার্য্যে নারীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া পুরুষ ক্রমে-ক্রমে নারীর হাতে গৃহ-কর্ম্মের অনেকখানি দায়িত্ব তুলিয়া দিল। এইভাবে নারী দাসীত্ব হইতে গৃহকর্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হইল।

ইহার পরবর্ত্তী ধাপে নারী পুরুষের সহধর্ম্মিনীরূপে গৃহীতা হইল। এই সময় হইতে বিবাহ একটা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে উন্নীত হইল এবং বিবাহে শাস্ত্র-মন্ত্র আবৃত্তি, জাগ-যজ্ঞ, যপ-তপ ইত্যাদি ধর্ম্মীয় আচরণের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এই ত গেল পিতৃ-প্রধান পরিবারের মোটামুটি ইতিবৃত্ত। ইহা ব্যতীত মাতৃ-প্রধান পরিবারেরও প্রচলন ছিল। এই শ্রেণীর পরিবারে মাতাই ছিল পরিবারের মূল এবং সন্তানের অভিভাবক। নারী নিজের ইচ্ছা-মত ভিন্ন পুরুষের দ্বারা স্বীয় গর্ভে সন্তান ধারণ করিত এবং সে সন্তান মাতার পরিচয়ে পরিচিত হইত।

আজকাল অসভ্য জাতিদের মধ্যে মাতৃ-প্রধান পরিবারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে গারো পাহাড়ের পাদদেশে যে সমস্ত গারো বাস করে, তাহাদের রীতি-নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ "সাংসারিক" বলে। ইহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছেলেরা হয় না—মেয়েরাই হইয়া থাকে। মেয়েরা সম্পত্তি অধিকার করিয়া বাড়ীতেই থাকে। অন্য পরিবারের উপযুক্ত ছেলেদিগকে ধরিয়া আনিয়া বা উহাদের সম্মতিক্রমে মেয়েদের সহিত বিবাহ দিয়া সংসার-ভুক্ত করা হয়। বর ও কন্যা দুইজনকে বসাইয়া সমাজের নেতা বা পুরোহিত এক সঙ্গে তাহাদের

গাত্রস্পর্শ করে। দুইটী মোরগও বর-কন্যাকে ছোঁয়াইয়া মারা হয়। তালাকের প্রথাও প্রচলিত আছে কিন্তু তালাকের পর স্ত্রীর সম্পত্তি স্ত্রীরই থাকিয়া যায়। বিধবারা পুনঃ বিবাহ করে।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে নারী সহধর্ম্মিনীর স্তর হইতে সহকর্ম্মিনীর স্তরে আরোহণ করিয়াছে। এখন নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে, যুদ্ধ-বিগ্রহে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় সর্ব্বত্র নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইতেছে। নিজের জীবিকার জন্য সে আর পুরুষের গলগ্রহ থাকিতে প্রস্তুত নহে। এই স্তরের বিবাহে নারীকে তাহার যৌন-সহযোগী নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ ইহাই বিবাহের ইতিহাস। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিবাহ-প্রথা বহুলাংশে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই, মানব-সভ্যতার আদিম যুগে যাহার প্রয়োজন ছিল, আজও তাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে, না মানুষ কেবল জন্মগত সংস্কারবশে পিতা-পিতামহের প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে?

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

একথার যুক্তি-যুক্ত উত্তর দিতে গেলে আমাদিগকে বিবাহের বিপরীত অবস্থাটার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দিলে আমরা মাত্র দুইটী অবস্থা কল্পনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, রতি-দমন বা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিতীয়তঃ যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব।

ব্রহ্মচর্য্যের ধর্ম্মীয় ব্যাখ্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই এ-সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর-বিরোধী মতের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

এক দলের অভিমত এই যে, যৌন-নিবৃত্তি মানব-দেহের পক্ষে অতীব উপকারী এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। পক্ষান্তরে, অপর দলের মত এই যে, যৌন-নিবৃত্তি উন্মাদ, মস্তিষ্ক-বিকার প্রভৃতি স্নায়বিক রোগের প্রধান হেতু। এই দুই মতেই বিশেষ অতিশয়োক্তি আছে। যৌন-সংযমেই মানুষ বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পড়ে একথাও যেমন বলা অন্যায়, যৌন-নিবৃত্তিতে দেহের কোনই অনিষ্ট হয় না, একথা বলাও তেমনই অসঙ্গত।

ফলতঃ যৌন-নিবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নহে বলিয়াই উহা দূষণীয়; কোনও-কোনও লোকের তাহাতে যদি দৃশ্যমান কোনও অনিষ্ট নাও হয়, তবু উহা দূষণীয়। কারণ দুই একজন লোকের দেহ ও মনের মাপকাঠিতে সমস্ত লোকের দেহ-মনের বিচার করা চলে না। ফ্রয়েড বলিয়াছেন—

যৌন-নিবৃত্তির অপকারিতা

"সাধারণ সামাজিক মানুষ যৌন-নিবৃত্তির উপযুক্ত নহে; সুতরাং জোর করিয়া এই কঠোর কর্ত্তব্য মানুষের ঘাড়ে চাপাইলে তাহার উপর অত্যাচার করা হইবে।"

মানুষের আত্মার সাধারণ ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, সমস্ত বৃত্তির সুসংযত বিকাশের নামই জীবন। কোনও বৃত্তিকে সুষ্ঠু বিকাশের সুবিধা না দিয়া উহাকে নিরুদ্ধ করাও যেমন অন্যায়, ঠিক সেইরূপ কোনও ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার না করিয়া উহাকে দমন করিয়া রাখাও অন্যায়। কারণ, তাহা হইলে স্রষ্টার জ্ঞানের পূর্ণতা-কেই অস্বীকার করা হয়।

রতি-দমনের দ্বারা মানব-দেহের দৃশ্যমান কোনও বিরাট অনিষ্ট না হইলেও সুস্থ ও সবল মানুষের যে উহাতে স্বাস্থ্যহানি হয়, এ-বিষয়ে

বর্ত্তমানে চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নাই। ডাঃ নাফের স্থির-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম-বিচারী মানুষ বলিয়া নাম আছে। তিনিও মন্তব্য করিয়াছেন—"যৌন-নিবৃত্তি স্বাস্থ্যহানিকর, এ-বিষয়ে আর মত-ভেদ থাকা উচিত নহে।"

ডাঃ ফ্রয়েড ও অন্যান্য বহু বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, যৌন-নিবৃত্তির দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যহানি হয় বটে, কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা নারীর অনেক বেশী অনিষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, পুরুষ হস্ত-মৈথুন বা স্বপ্নদোষের দ্বারা শুধু যে বাসনার তীব্রতার হাত হইতে রক্ষা পায় তাহা নহে, ঐ কার্য্যে সে খানিকটা আনন্দও পাইয়া থাকে। কারণ, যেভাবেই শুক্রপাত হউক না কেন, পুরুষ শুক্রপাতে একটা পুলক বোধ করিবেই। কিন্তু নারী সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। নারীর শুক্রপাত নামক কোনও চরম মুহূর্ত্ত না থাকায় হস্ত-মৈথুনে সে পুরুষের মত আনন্দ পায় না, এবং স্বপ্নমৈথুনও তাহার কাছে পুরুষের ন্যায় পুলক-প্রদ নহে।

বিশেষজ্ঞের অভিমত

ডাঃ ক্যাথারিন্ ডেভিস্ এ-বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি সুনির্ব্বাচিত এক হাজার মহিলার নিকট পত্রের দ্বারা এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—"আপনি কি মনে করেন যে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রতি-ক্রিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে এক হাজার মহিলার মধ্যে ৩৯৪ জন মহিলা উত্তর দিয়াছিলেন 'হাঁ'। অবশিষ্ট যাঁহারা সোজাসোজি 'হাঁ' বলেন নাই, তাঁহারাও "অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে বটে তবে স্বাভাবিক", "প্রয়োজন না হইলেও উচিত" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া রতি-ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

কলোনের ডাঃ মিরস্কী ৮৬ জন চিকিৎসক সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, উক্ত ৮৬ জনের মধ্যে মাত্র একজন বিবাহের পূর্ব্বে নারী-সম্ভোগ করেন নাই। মিঃ এলিস্ ডাঃ মিরস্কীর গবেষণা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে কলোন অপেক্ষা অনেক বেশী লোক প্রাক্-বৈবাহিক যৌন-পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাহারা বিবাহেতর নারী-সম্ভোগ করে না, তাহারা সকলেই হস্ত-মৈথুনে লিপ্ত থাকে।

বিখ্যাত বহুদর্শী চিকিৎসক ডাঃ রোহেলডার বলিয়াছেন যে, সত্যিকারের যৌন-সংযম বলিয়া কোনও জিনিষ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। যাহারা নারী-সম্ভোগ করে না, তাহারা হয় হস্ত-মৈথুন বা অন্য কোনওরূপ স্বয়ং-মৈথুন করিয়া থাকে, অথবা নিয়মিত স্বপ্ন-মৈথুন দ্বারা তাহাদের যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্ত থাকে। এই দুইটার একটাও না হইলে বুঝিতে হইবে, তাহারা রতি-শক্তি হীন।

যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ব্যায়ামাদিতে এবং নিরামিষ ভোজনে খুব স্বাস্থ্যবান লোকেরও যৌন-ক্ষুধার সাম্য সাধিত হয়, মিঃ এলিস ও ডাঃ হার্সফেল্ড্ তাঁহাদেরও মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, নিয়মিত ব্যায়ামে যৌন-ক্ষুধা কমে ত না-ই, বরঞ্চ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তবে একথা ঠিক যে অতিরিক্ত ব্যায়ামে যখন শরীরের উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হইতে থাকে, তখন যৌন-ক্ষুধাও তাহাতে প্রশমিত হয়। আর নিরামিষ আহার সম্বন্ধে তাঁহাদের মত এই যে, মাংসাশী সিংহ-ব্যাঘ্র অপেক্ষা নিরামিষাশী গরু-ঘোড়া-ছাগল অনেক বেশী রতি-প্রিয়।

মানুষের রতি-শক্তিকে নারী-সম্ভোগে ব্যয় না করিয়া অন্য কোনও

মহত্তর কার্য্যে যে নিয়োজিত করা যায় না, তাহা নহে। কিন্তু নারী-সম্ভোগে বিরত হইয়া মানুষ যে বীর্য্য রক্ষা করিবে, তাহার সবটুকু সে মহত্তর কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিবে না ; কতকটা—বেশীর ভাগই—অপব্যয়িত হইতে বাধ্য। ডাঃ ফ্রয়েড একটী চমৎকার উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইঞ্জিন-চালনায় বাষ্পের চারি আনা মাত্র কাজে লাগে ; বার আনাই চিমনী দিয়া বা অন্য উপায়ে বাহির হইয়া যায়। ঠিক সেইরূপ, মানুষের বীর্য্য কোনও উচ্চতর আত্মিক যোগ-সাধনার জন্য সঞ্চয় করিলেও বীর্য্যের বার আনা অংশই নষ্ট হইয়া বিভিন্ন দ্বার-পথে বাহির হইয়া যাইবে, চারি আনা অংশ মাত্র উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর শক্তিতে পরিণত হইয়া যোগ-সাধনার সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু ইহাকে কিছুতেই বীর্য্যের সদ্ব্যবহার বলা যাইতে পারে না।

এই সঙ্গে আর একটী বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলে যৌন-মিলন ব্যতীত তাহা হইতে পারে না।

সুতরাং সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলে এবং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে যৌন-মিলন মানিয়া লইতেই হইবে।

এই যৌন-মিলন সংঘটন করিবার জন্য যদি আমরা কোনও আকারের বিবাহ-প্রথা মানিয়া না লই, তবে আমাদিগকে যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব মানিয়া লইতে হয়।

সম্বন্ধ বিচার না করিয়া যাহার-তাহার সঙ্গে রতি-ক্রিয়ার নাম যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব (promiscuty)। ইহার অন্যান্য বিশেষত্ব এই যে, এখানে সম্বন্ধের

যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব

স্থায়িত্ব, সন্তানের দায়িত্ব, নারীর দায়িত্ব প্রভৃতি কোনও দায়িত্ব নাই। যৌন-সম্বন্ধ এখানে নিতান্তই সাময়িক।

এখন আমাদের বিচার্য্য এই যে, মানব-কল্যাণের দৃষ্টি-কোণ্ হইতে বিবাহ ও যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের কোন্‌টী আমাদের গ্রহণযোগ্য।

পারিবারিক জীবন যাপন করিতে হইলে কোনও-না-কোনও রীতির বিবাহ প্রচলিত রাখিতেই হইবে, এ সম্বন্ধে অধিক যুক্তির অবতারণা বাহুল্য মাত্র। পারিবারিক জীবন উঠাইয়া দিয়া রাষ্ট্রের স্কন্ধে সন্তান পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে বলিয়া আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, ডাঃ মেইন্ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের দ্বারা নারী-পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব মানব-জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা? মানুষের স্বাভাবিক ঈর্ষা-পরতন্ত্রতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে কিনা? ইহার বিচার করিতে গেলে আমাদের দেখা উচিত, বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে মানব-সমাজে সত্যিকার যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব ছিল কি না, এবং থাকিলে তাহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল?

লাবক, বাকোফেন্, ম্যাকলেনান্, বাষ্টিয়ান, উইলকেন্‌স্ প্রভৃতি অধিকাংশ সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত এই যে, আদিকালে মানব-জাতি যৌন-নির্ব্বিশেষ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইঁহাদের পুস্তক

পাঠে দেখা যায়, ইঁহারা যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার একটীও যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব নহে—বিভিন্ন রীতির বিবাহ-প্রথা মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঐ সমস্ত সমাজ-বৈজ্ঞানিক বহু-স্ত্রী বা বহু-স্বামী গ্রহণকেই যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব বলিয়াছেন। আমরা উপরে বিবাহের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, সেই সংজ্ঞানুসারে বহু-স্ত্রী বা বহু-স্বামী গ্রহণকেও বিবাহ বলা যাইতে পারে।

ডাঃ ফোরেলের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব মোটেই প্রচলিত ছিল না ও নাই। কারণ অসভ্য জাতিসমূহই এবিষয়ে অত্যধিক ঈর্ষা-পরতন্ত্র। ডাঃ ফোরেল ও ডাঃ ওয়েষ্টারমার্ক এ-বিষয়ে এক-মত যে, মানুষের মধ্যে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যৌন-নিষ্ঠা-বোধ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব প্রসার লাভ করিয়াছে। কারণ, বেশ্যা-প্রথাই যৌন-নির্ব্বি-শেষত্বের একমাত্র দৃষ্টান্ত এবং এই প্রথা সভ্যতার সৃষ্ট। ডাঃ ফোরেলের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতজাতিসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনব্যপদেশে ঐ সমস্ত জাতির মধ্যে মদ্যপান ও বেশ্যা-বৃত্তির প্রচলন করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, শ্বেতজাতিসমূহের গমনের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত অসভ্য জাতি যৌন-নিষ্ঠায় অতীব দৃঢ় ও নীতিবান ছিল এবং ঔপনিবেশিকদের আগমনের পর উহারা মদ্যপান ও অন্যান্য দুর্নীতি-আসক্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের ঈর্ষাতৎপরতা

ডাঃ ওয়েষ্টারমার্কের অভিমত এই যে, ইউরোপীয় সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে জারজ সন্তানের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যেও আবার শহর অঞ্চলে জারজ সন্তানের

সংখ্যা পল্লী অঞ্চলের দ্বিগুণ। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব সভ্যতারই বিষময় ফল।

বেশ্যা-বৃত্তিকেও কিন্তু ঠিক যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব বলা যায় না। কারণ বেশ্যারা শুধু তাহাদিগকেই দেহদান করিয়া থাকে, যাহারা বিনিময়ে তাহাদিগকে অর্থদান করে। রতি-বাসনা পূরণের জন্যই যে যৌন-ক্রিয়া সাধিত হয়, কেবল তাহাকেই যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে কেবলমাত্র নিউইয়র্কের ওনিডাস উপনিবেশেই যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব প্রচলিত আছে বলা যাইতে পারে। এই উপনিবেশের অধিবাসিগণ পরস্পরের জ্ঞান ও সম্মতিক্রমেই কাল-পাত্র-ও সম্বন্ধ-নির্ব্বিশেষে রতি-ক্রিয়া করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে রোম, ভারতবর্ষ, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশসমূহে কোনও-না-কোনও প্রকারে যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডে অল্পদিন পূর্ব্বেও পাণি-গ্রহণ (hand-fasting) প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রথানুসারে যে-কোনও যুবক যে-কোনও যুবতীর হস্তধারণপূর্ব্বক তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সহিত রতি-ক্রিয়া করিতে পারিত। রোম ও ভারতবর্ষের দেবদাসী প্রথা, গৃহস্বামীর নিজের কন্যা বা স্ত্রীকে অতিথির সহিত রাত্রিযাপন করিতে দিয়া অতিথি-সেবা করিবার প্রথা ইত্যাদি সভ্যতা-সঞ্জাত যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দলপতি, রাজা, কুল-পুরোহিত, গুরুদেব, প্রভৃতিকে দেহদান না করিয়া কোনও স্ত্রীলোকের স্বামী-সহবাস করিতে না পারিবার প্রথাও পৃথিবীর বহু সভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে এই প্রথাকেও ঠিক যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে না।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সত্যিকার যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব সম্ভবও নহে, মানবজাতির কল্যাণের জন্য উচিতও নহে। কাজেই কোনও-না-কোনও প্রকারের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকা মানব-কল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এখন প্রশ্ন এই যে, কোন্ প্রকারের বিবাহ-নীতি আমাদের গ্রহণীয়। এ-প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে আমাদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের বিবাহ-প্রথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে।

বিভিন্ন বিবাহ-প্রথা

বিবাহ-প্রথাকে মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা, (১) এক-স্ত্রী বিবাহ, (২) বহু-স্ত্রী বিবাহ (৩) বহু-স্বামী বিবাহ (৪) দলগত বিবাহ।

অন্ততঃ বাহ্যতঃ এক-স্ত্রী বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত বিবাহ প্রথা। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-ব্যবস্থার সাম্য বিধানের জন্য এক-স্ত্রী বিবাহ একরূপ সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। কারণ পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান।

এক-পত্নীত্ব

কিন্তু এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা পুরুষের সাধারণ স্বভাব না হওয়ায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য থাকায় এবং পুরুষ নারী অপেক্ষা দৈহিক বলশালী হওয়ায় পুরুষ বহু-স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, একই সময়ে এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করার নামই বহু-বিবাহ। এক স্ত্রীর তালাকের বা মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলে এবং এইরূপে পর-পর শতাধিক স্ত্রী বিবাহ করিলেও তাহাকে বহু-বিবাহ বলা

বহু-পত্নীক বিবাহ

যাইবে না। পক্ষান্তরে, এক নারীকে বিবাহ করিয়া বিবাহেতর সহস্র রমণীর সংসর্গ করিলেও তাহাকে বহু-বিবাহ বলা যাইবে না। এখানে আমরা বহু-বিবাহ অর্থে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, আইন ও সমাজের চক্ষে গৃহীত নীতিতে এক সঙ্গে একাধিক নারীর সহিত যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের নামই বহু-বিবাহ। এই হিসাবে ইহুদীদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মেক্সিকো, পেরু, জাপান ও চীন দেশের অধিবাসীরা বাহ্যতঃ এক-পত্নীক বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা বহু-পত্নীক। কারণ আইন-গ্রাহ্য বিবাহিত পত্নী ব্যতীত তাহারা বহু-সংখ্যক উপপত্নী রাখিয়া থাকে এবং উহাদের গর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে সেই সমস্ত সন্তানকে উহারা নিজেরা এবং উহাদের দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র বিবাহ-জ সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। খৃষ্টান ইউরোপেও বহু বিবাহের প্রচলন ছিল; সেণ্ট-অগাষ্ট্ ও লুথার প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী সমাজ সংস্কারকগণও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধতা করেন নাই। মর্ম্মন নামীয় আমেরিকার খৃষ্টান সম্প্রদায় বহু-বিবাহকে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইহাদের মধ্যে সংস্কার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও উহাদের অধিকাংশের ধর্ম্মীয় সংস্কার ঘুচে নাই। নিগ্রোরাজ লোয়াঙ্গোর সাত হাজার মহিষীর কথা শুনা যায়। ফিজী দ্বীপের নৃপতিগণ সাধারণতঃ এক শতের বেশী রাণী রাখেন না। প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই প্রথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণ এত অধিক বিবাহ করিত যে, তাহাদের অনেকেরই পক্ষে সমস্ত স্ত্রীর সহিত জীবনে পরিচিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না।

উপরে যে-সমস্ত বহু-বিবাহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, উহাতে ইহাই নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, যে-সমস্ত জাতির মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যেও উহা বড়লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বহু-বিবাহটা বরাবর রাজা-বাদশাহের একটা বিলাসিতার উপকরণ মাত্র ছিল। জন-সাধারণের মধ্যে উহা অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে খুব বেশী প্রসার-লাভ করিতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে চারিজন পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ডাঃ ফোরেলের গবেষণানুসারে ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জন ও পারস্যের মুসলমানদের শতকরা ৯৮ জন এক-পত্নীক। ডাঃ ফোরেল আরও গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যাহাদের একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহারাও সাধারণতঃ এক স্ত্রীকেই মাত্র প্রাধান্য দিয়া থাকে। ইহাতেই মানুষের এক-পত্নীক চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এমনও অনেক বহু-পত্নীক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সুনির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে দিনের পর দিন এক-এক স্ত্রীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু আবার অনেক বহু-পত্নীকেরই অবস্থা এই যে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট এক বা একাধিক স্ত্রীর সহিত সাধারণতঃ সহবাস করিয়া থাকে; অবশিষ্ট সকলে শুধু অবস্থা-বিশেষে এবং সুযোগ-সুবিধা-মত স্বামী সঙ্গলাভ করে।

এক তিব্বত ব্যতীত অন্য কোনও দেশে বহু-স্বামী বিবাহের তেমন প্রচলন নাই। পৌরাণিক ভারতে যে বহু-স্বামী-বিবাহ প্রচলিত ছিল দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী তাহার প্রমাণ। ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে সিংহলেও বহু-স্বামী-বিবাহের প্রচলন ছিল।

বহু-পতিক বিবাহ

দক্ষিণ-ভারতের কোনও-কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা অল্প-বিস্তর প্রচলিত ছিল। বহু-পত্নীত্বে যেমন সকল স্ত্রী স্বামীর সমান ভালবাসা পায় না; বহু-স্বামীত্বেও তেমনই সকল স্বামী স্ত্রীর সমান ভালবাসা পায় না।

বাকোফেনের মতে লিসীয়ানস্, এট্রাস্কান্স, ক্রেটানস্, এথেনিয়ানস্ লেসবিয়ানস্ এবং মিশরীয় প্রভৃতি সমস্ত জাতির মধ্যে দল-গত-বিবাহ প্রচলিত ছিল। টোগা সম্প্রদায়ের মধ্যে আজিও দল-গত-বিবাহ প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে বড় ভাই বিবাহ করিলেই সকল ভ্রাতার বিবাহ করা হইল। উহার সঙ্গে সকলেই রতি-ক্রিয়া করিতে পারিবে। তদুপরি উক্ত স্ত্রীর সমস্ত ভগিনীগণই ভ্রাতৃগণের সকলের ভোগ্যা। টোগা সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোনও দেশে বা জাতির মধ্যে এরূপ দল-গত বিবাহ-প্রথা দৃষ্টিগোচর হয় না।

দল-গত বিবাহ

উপরে বিভিন্ন বিবাহ-প্রথার বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এক-পত্নীক বিবাহই সাধারণ ও বহুল-প্রচলিত বিবাহ-প্রথা।

অবশ্য পুরুষ-মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে আমরা এক-পত্নীকত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকি। নারীর যৌন-ক্ষুধা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পুরুষে তৃপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষের বেলা তাহা নহে। তাহার যৌন-ক্ষুধা সাধারণতঃ এক-নারী-সম্ভোগে তৃপ্ত হয় না। ক্রমাগত কিছুদিন এক নারী ভোগ করিলেই পুরুষের মন তৎপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। পুরুষের এই পরিবর্ত্তনশীল ও চঞ্চল যৌন-বৃত্তি জগতে ঐকিক বিবাহ প্রতিষ্ঠার বিষম প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। অবশ্য অনেক নারীও পুরুষের বহু-স্ত্রী-গ্রহণ পসন্দ করিয়া থাকে। ডাঃ লিভিংষ্টোন

বলিয়াছেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ম্যাফোলোলো নামক স্থানের মেয়েরা এক-পত্নীক পুরুষকে কৃপণ ও কাপুরুষ বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে নারীর সাধারণ মনোবৃত্তি বলা যাইতে পারে না। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিণ্টন ইউরোপীয় ঐকিক বিবাহের ভণ্ডামীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রচুর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় জাতি-সমূহ বাহ্যতঃ এক-বিবাহ-বাদী হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা যৌন-নিষ্ঠা দ্বারা এক-বিবাহের মর্য্যাদা রক্ষা করে না। পক্ষান্তরে, প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে আইন-গত বাধা না থাকিলেও তাহারাই প্রকৃতপক্ষে যৌন-নিষ্ঠাবান এক-পত্নীক।

দেশ-গত ও কাল-গত চরিত্র-ভেদে যৌন-নিষ্ঠার ব্যতিক্রম স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে, ঐকিক বিবাহই সকল দিক দিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের উপযোগী। অবশ্য সময়-বিশেষে মানুষ যে ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না, এমন ধরা-বাঁধা নিয়ম থাকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যুদ্ধ-বিগ্রহে কোনও দেশ বা জাতির বহু-সংখ্যক পুরুষের প্রাণত্যাগের ফলে নারী-পুরুষের সংখ্যার আনুপাতিক প্রভেদ সংঘটিত হইলে তেমন অবস্থায়ও এক-পত্নীক বিবাহ-প্রথার উপর অযথা জোর দিয়া বহু-সংখ্যক নারীকে যৌন-সম্ভোগ এবং সন্তানোৎপাদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গতও হইবে না, রাষ্ট্রের স্বার্থের দিক হইতেও বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। ইসলাম ধর্ম্মে সময়-বিশেষে চারিজন পর্য্যন্ত নারীকে বিবাহ করিবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, উহা এইরূপ সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক

দূরদৃষ্টি-জাত কি না, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অবস্থা-বিশেষের জন্য মানুষের এইটুকু স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া একথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐকিক বিবাহের দিকেই মানুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে।

বিবাহে দল, সমাজ বা রাষ্ট্রের মঞ্জুরী লাভের জন্য মানুষ অনাদিকাল হইতে বিবাহের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক বিবাহই এই পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। দেশ-ও কাল-ভেদে এই সমস্ত পদ্ধতিতে খুব বড় বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু পদ্ধতি একটি থাকিতেই হইবে। আদিম বর্ব্বরতম জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সভ্যতম জাতি পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষ সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে।

বিবাহের বিভিন্ন প্রণালী

পুরাকালে সভ্য-অসভ্য প্রায় সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রী জাতি পুরুষের সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। সুতরাং ঐ সময় পুরুষের ইচ্ছাই ছিল নারীর যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র নিয়ামক। ইস্কিমো, আশান্তি প্রভৃতি উত্তর মেরুর জাতিসমূহের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের কোনও-কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানের বিবাহ পিতামাতা কর্ত্তৃক স্থির হইয়া থাকিত। বুলগেরিয়ানদের মধ্যে নিয়ম আছে, কোনও নারী কোনও পুরুষের মনোনীত হইলে উক্ত পুরুষ বলপূর্ব্বক উক্ত নারীর সহিত রতি-ক্রিয়া করিবে, ইহার পর নারীর পিতামাতা উক্ত পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আর আপত্তি করিতে পারিবে না। যে-সমস্ত দেশে যুক্ত-পরিবার-প্রথা আজিও বলবৎ আছে, সেখানে পরিবারের কর্ত্তা তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিজের ব্যক্তিগত ভোগ-লালসায় নিয়োজিত করিয়া থাকে। রুশিয়া এবং জাপানে পরিবারের কর্ত্তা পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সকলের যৌন-সম্বন্ধ

নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এমন কি অনেক সময় নিজের বৃদ্ধা স্ত্রীগুলিকে পুত্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া স্বয়ং নূতন যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারে হয় না তাহা নহে। প্রাচীন ভারতে স্বয়ম্বর প্রথাই তাহার উদাহরণ। এই প্রথা-অনুসারে কন্যাকে বহু পাণি-প্রার্থীর মধ্যে বর বাছিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হইত। রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা এইভাবে পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বর-মাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়াতে বিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথায় পুরুষ নিজের মা, ভগিনী, বা কন্যার বিনিময়ে অন্য নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিত।

অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীলাভ বহু জাতির মধ্যে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং আজিও আছে। কন্যার মূল্য নগদ আদায় করিতে না পারিয়া অনেক বরকে কন্যার বাপের চাকুরী করিবার পর স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত। বৃটিশ কলম্বিয়াতে প্রত্যেক নারীর দাম রূপ ও গুণের তারতম্য অনুসারে কুড়ি হইতে চল্লিশ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত ছিল। কাফ্রীদের মধ্যে স্ত্রীর মূল্য ১০টী গাভী হইতে ৩০টী গাভী পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই প্রথা রোমীয় সভ্যতার আমলে বিপরীত রূপ ধারণ করে। এই সময় কন্যার কোনও মূল্য ত ছিলই না, পরন্তু তৎপরিবর্ত্তে বর-পণ-প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। এই প্রথা অনুসারে কন্যাকে ধন-সম্পত্তি সহ বরের বাড়ী আসিতে হইত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বর-পণের প্রচলন আছে।

ভারতবর্ষে পুরাকালে আট প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলিয়া শ্রুতি-শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য ও প্রাজা-

আট প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি

পত্য উন্নত ধরণের আধ্যাত্মিক বিবাহ। শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া পূজা-সহকারে যথা-বিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞে বৃত ঋত্বিককে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাদান দৈব বিবাহ। বরের নিকট হইতে এক বা দুইটী গো-মিথুন গ্রহণ করিয়া কন্যাদান আর্ষ্য বিবাহ। উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর, ইহা বলিয়া অর্চ্চনা সহকারে কন্যাদানকে প্রাজাপত্য বলিত। বাহ্যতঃ যৌন-সম্মিলন ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। অবশিষ্ট পৈশাচ, রাক্ষস, অসুর ও গান্ধর্ব্ব এই চারি প্রকার বিবাহে সমস্ত মানব জাতির বৈবাহিক ক্রমবিকাশের ধারা প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নারীর নিদ্রিতাবস্থায় বা তাহাকে মদ্যপানে অজ্ঞান করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করতঃ তাহাকে বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ। কন্যার আত্মীয়-স্বজনকে বিনাশ করিয়া বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। অর্থের বিনিময়ে নারীকে ক্রয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করার নাম আসুর বিবাহ এবং পিতামাতার অজ্ঞাতে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিক্রমে পরস্পরকে বিবাহ করার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

ব্যালিয়ারিক দ্বীপের অধিবাসিগণের বিবাহ-প্রথা অতি চমৎকার। বিবাহের রাত্রে আত্মীয়-স্বজনের সকলে একে-একে কন্যাকে উপভোগ করিবার পর শেষ-রাত্রে সর্ব্বশেষে বর তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেনেগাম্বিয়াতে প্রত্যেক কন্যাকে বিবাহের রাত্রে দলপতির শয্যা-সঙ্গিনী হইতে হয়।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কোনও-না-কোনও পদ্ধতি এবং তৎসঙ্গে

উৎসব করিবার ব্যবস্থা আছে। পদ্ধতির সঙ্গে কোনও-না-কোনও প্রকারের ধর্ম্ম-ব্যবস্থার সংশ্রব আছে এবং উৎসবের সঙ্গে কোনও-না-কোনও প্রকারের ভোজনের ব্যবস্থা আছে। সভ্য-ও অসভ্য-ভেদে পদ্ধতির ইতর-বিশেষ এবং ধনী-ও নির্ধন-ভেদে উৎসব ও ভোজনের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে।

বিবাহের স্থায়িত্ব

জাতি-ভেদে বিবাহের স্থায়িত্বের গুরুতর প্রভেদ হইয়া থাকে। আন্দামান, সিংহল প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসিগণের বিবাহ-বন্ধন মৃত্যু ব্যতিরেকে ছিন্ন হইতে পারে না। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীদের বিবাহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হইয়া থাকে। ওয়ানডট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র কয়েকদিনের জন্য বিবাহ হইবার নিয়ম প্রচলিত আছে। গ্রীনল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ছয় মাসের জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড, টাস্‌মানিয়া, সামোয়ান প্রভৃতি দ্বীপসমূহের অধিবাসীরা অতি অল্প সময়ের জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। পারস্যের অধিবাসীরা এক ঘণ্টা হইতে নিরানব্বই বৎসরের মিয়াদে বিবাহ করিয়া থাকে। মিশরেও এইরূপ মিয়াদী বিবাহের প্রচলন আছে। সাহারা মরুভূমির নারীরা ঘন-ঘন স্বামী পরিবর্ত্তন করাকে একটা ফ্যাশান মনে করে। যে নারী বহুদিন এক স্বামীর ঘর করে, তাহাকে ইহারা ঘৃণার চক্ষে দেখে। দীর্ঘদিন একই লোকের সহিত রতি-ক্রিয়া করাকে ইহারা কদর্য্য ও কুৎসিৎ ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকে। গ্রীক, রোমীয় ও জার্ম্মানদের মধ্যেও ঘন-ঘন স্ত্রীত্যাগ একটা ফ্যাশান ছিল। পক্ষান্তরে ওয়েষ্টারমার্ক ২৫টী অসভ্য জাতির নাম করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। জাপানী ও চীনাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব, অসতীত্ব, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি ঔদাসীন্য, বাচালতা, স্বামীর সহিত

অসদ্ব্যবহার, কর্কশতা, পুরাতন রোগ, এই সাত কারণে স্ত্রী তালাক দিবার বিধি আছে। কিন্তু তথাপি চীন ও জাপানে খুব কমই তালাক দৃষ্ট হয়।

সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে খৃষ্টান-ইউরোপ ও আমেরিকাতে ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কোনও কারণে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার বিধি না থাকায় অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করিয়া মিথ্যা ব্যভিচারের অভিযোগ আনিয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকে। ভারতীয় হিন্দুদের বিবাহ-বন্ধন শুধু-যে আজীবন স্থায়ী, তাহা নহে। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। এই ধারণায় হিন্দুদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পরও স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিত না।

সতীদাহ-প্রথা

পক্ষান্তরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ মৃত পতির সহিত চিতায় আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় ভস্মীভূত হওয়াকে দাম্পত্য সম্বন্ধের অমরত্বের নিদর্শন মনে করিতেন। ইহাকে সতীদাহ বলা হইত। সতীদাহ দুই প্রকারের ছিল—সহমরণ ও অনুমরণ। পতির শবের সহিত দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ ও বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার কাপড়-চোপড় বা তাহার ব্যবহৃত কোন বস্তু লইয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়াকে অনু-মরণ বলিত। এই প্রথা ব্রাহ্মণদের উপর প্রযোজ্য ছিল না। স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে প্রসবের পরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইত। একাধিক স্ত্রী থাকিলে কে সতীদাহের অধিকারী, ইহা লইয়া গোলযোগ হইত। সতীদাহের সময় স্ত্রীর পক্ষে রোদন বা অশ্রুমোচন অশোভন মনে করা হইত। ভয় পাইয়া পলাইয়া আসার কোন বাধা ছিল না; কিন্তু একবার চিতায় উঠিলে বলপূর্ব্বক হইলেও স্ত্রীকে দগ্ধ করা হইত। মোগল সম্রাট আকবর এই প্রথা রহিত করিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময়ে তাঁহার চেষ্টায় সতীদাহ আইনে দণ্ডনীয় করা হয়। এই আইন প্রণয়নে হিন্দু জনসাধারণ খুব বাধা প্রদান করে। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই আইনের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহা ১৮২৯ খৃঃ অব্দে প্রণয়ন করা হইয়াছিল। সেই অবধি সতীদাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্বামী-স্ত্রী যে-কাহারও ইচ্ছাতে ছিন্ন হইবার বিধি আছে।

সন্তান, ভালবাসা ও বিষয়-বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া থাকে। মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নারীজাতির প্রতি ব্যবহারের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন পুরুষ পারতপক্ষে স্ত্রী ত্যাগ করিতে চায় না। সুতরাং বিশেষ অবস্থায় কোনও কারণ প্রকাশ না করিয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বিবাহ-জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া ব্যভিচার ও সামাজিক অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে।

সংস্কৃতে একটা কথা আছে—পুত্রার্থ ক্রিয়তে ভার্য্যা—অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য। পুত্র না হউক, সন্তানোৎপাদনই যে বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য, একথা প্রায় সকল জাতিই স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু কথাটার মধ্যে একটী মস্ত বড় গলৎ রহিয়া গিয়াছে। সন্তানোৎপাদনের জন্য নারী-পুরুষের যৌন-মিলন প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু বিবাহের প্রয়োজন তাহাতে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং সৃষ্টিই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।

বিবাহের উদ্দেশ্য

সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সাতটী রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। স্ত্রীকে স্নেহে জননী, আদর-যত্নে ভগিনী, সহানুভূতিতে মিত্র, উপদেশে গুরু, সেবায় দাসী, রতি-ক্রিয়ায় বেশ্যা, সন্তানোৎপাদনে ভার্য্যা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ দাম্পত্য-জীবনের ইহাপেক্ষা সুন্দর ও পরিপূর্ণ রূপ কল্পনা বোধ হয় আর হইতে পারে না। গৃহে আনন্দদায়িনী, বিপদে সান্ত্বনাদায়িনী, ইহাই স্ত্রীর আদর্শ রূপ এবং বিবাহের চরম বিকাশ এই আদর্শের পরিপূর্ণতায়। অবশ্য একথা সত্য যে, স্ত্রীর এ রূপ বরাবর ছিল না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে নারীজাতি স্ত্রীরূপে পুরুষের হৃদয়ের এক বিপুল অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি এতটা প্রেম দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে সন্তানের জন্যই স্ত্রীর যা-একটু আদর-আপ্যায়ন। স্ত্রীও স্বামীকে ততটা ভালবাসে না; কেবল তাহার সন্তানের পিতা বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন করিয়া থাকে। শুধু অসভ্য জাতির মধ্যে কেন, সভ্য জাতিরও অশিক্ষিত নিম্নতম সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত সম্বন্ধ সন্তানকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ইহাদের মধ্যে অনাবশ্যক এমন কি কতকটা বেহায়াপনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে এবং অন্যান্য অশিক্ষিত ও কৃষ্টিহীন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন গুরুজনের চক্ষে অনেকটা কুৎসিৎ নির্লজ্জতা বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-জীবনের আদর্শ হইতেছে স্বামীর সংসারে কঠোর পরিশ্রম করা এবং স্বামীর গুরুজন ও অন্যান্যের সেবা করা।

সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সাত রূপ

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা তদ্রূপ নহে। সেখানে অপত্য-স্নেহ--নিরপেক্ষভাবে সুগভীর দাম্পত্য-প্রেম পরিস্ফুট হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পর্কে সুরুচি-ও কৃষ্টি-সম্মত ধারণা জন্মলাভ করে।

আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ দাম্পত্য জীবনের ইহাপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ বোধ হয় আর কল্পনা করা যাইতে পারে না। গৃহ-সংসারে, জ্ঞান-ও কর্ম্ম-সাধনায়, ভোগ-বিলাসিতায়—সকলক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহচর। ইহাই বোধ হয় দাম্পত্য জীবনের সুন্দরতম পরিকল্পনা।

নিভাজ প্রেম ও স্নেহ-প্রীতির দিক হইতে আলোচনা না করিয়া বিষয়-বুদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিলেও আমরা বিবাহের কতকগুলি প্রত্যক্ষ উপকার দেখিতে পাই।

বিবাহের উপকারিতা

বিবাহের প্রথম উপকার বংশ বৃদ্ধি। দুনিয়াতে নিজের প্রতিনিধি রাখিয়া যাইবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে একটী অতিশয় প্রবল বৃত্তি। "আমার পরে আমার নাম বজায় রাখিবার কেহ থাকিবে না" এই কল্পনা মানুষের পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক ও ভয়াবহ। "বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকিবার" অভিশাপ আমাদের দেশে চরম অভিশাপ। এই "বংশে বাতি দিবার লোক" রাখিয়া যাইবার জন্যই মানুষ বিবাহ করিয়া থাকে। বিবাহ ছাড়াও লোক সন্তান উৎপাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ সে পুত্রকে স্বীকার করিয়া না লওয়ায় এবং বিবাহেতর যৌন-গমনে পিতৃত্ব সুনির্দ্দিষ্ট না থাকায় মানুষের আত্মার পিতৃত্বের ক্ষুধা উহাতে তৃপ্ত হয় না। কাজেই বিবাহের ভিতর দিয়া মানুষ সুনির্দ্দিষ্ট পিতৃত্বের তৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

বংশ-বৃদ্ধি

বিবাহের দ্বিতীয় উপকারিতা কামেচ্ছা-নিবৃত্তি। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, রতি-প্রবৃত্তি মানুষের প্রবলতম বৃত্তি। এই বৃত্তির তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষকে বিবাহেতর রতি-ক্রিয়ায় রত হইতে হইলে কত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সে-সমস্ত কথা আমরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। যৌন-সম্মিলন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয়, সে কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু বিবাহে একটী মস্ত বড় সুবিধা এই যে, রতি-ক্রিয়ার জন্য একটী লোক নির্দ্দিষ্ট থাকায় নারী বা পুরুষ ইচ্ছামত রতি-ক্রিয়া করিতে পারে। এ-বিষয়ে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইতে অথবা সময়-সুযোগের সন্ধান করিতে হয় না। ইচ্ছামত যৌন-বাসনার তৃপ্তি সাধনের পাত্র সুনির্দ্দিষ্ট থাকায় নারী বা পুরুষ রতি-ক্রিয়া-বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। যদি বিবাহের দ্বারা পরস্পরের দেহের প্রতি এই অধিকার সৃষ্টি না হইত, অর্থাৎ যদি সমাজে যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের প্রচলন থাকিত, তবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সর্ব্বদা যৌন-চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। যৌন-বাসনার উদ্রেক হইলে কাহাকে পাওয়া যাইবে, কে সম্মত হইবে, যে সম্মত হইবে সে মনোমত হইবে কি না, যে মনোমত হইবে সে সম্মত হইবে কি না, উভয়ে সম্মত হইলেও সুবিধামত স্থান পাওয়া যাইবে কি না ইত্যাদি চিন্তায় অহরহ মানুষকে ব্যস্ত থাকিতে হইত। এইভাবে নারী-পুরুষ উভয়ে অহরহ যৌন-অভিসারে ব্যস্ত থাকিলে সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম অনেক খানি ব্যাহত হইত। কিন্তু বিবাহ যৌন-ক্রিয়ার পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিরা দেওয়ায় এবং পরস্পরের দেহের প্রতি আইন-ও সমাজ-স্বীকৃত অধিকার

কামেচ্ছা-নিবৃত্তি

সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ এই বিষয়ে চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া জ্ঞান-ও কর্ম্ম-সাধনায় ব্যস্ত থাকিবার সুবিধা পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া বিবাহের আর একটা সুন্দর দিক আছে। একাদিক্রমে দীর্ঘ দিন ধরিয়া একই ব্যক্তির সহিত রতি-ক্রিয়া করায় উভয়ের এতটা পারস্পরিক আঙ্গিক উপযোগিতা লাভ হয় যে, সঙ্গম-ক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। লিঙ্গের আকৃতি-গত সামঞ্জস্য ও বাসনার স্থায়িত্ব-গত সামঞ্জস্য উহাদের সঙ্গম-ক্রিয়াকে অতীব সহজ-সাধ্য ব্যাপার করিয়া তুলে। রতিক্রিয়ার এই সহজসাধ্যতার ফলে রতিক্রিয়ায় পুরুষের খুব বেশী শুক্র-ক্ষয় হয় না এবং উত্তেজনায় অসাধারণ তীব্রতার অভাবহেতু উভয়ের বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হয় না। কাজেই যৌন-নিষ্ঠা পুরুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে আশ্চর্য্য রকম উপকারী।

বিবাহের তৃতীয় উপকার মৈত্রী লাভ। বস্তুতঃ যেখানে দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়, সেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এবং স্ত্রী স্বামীর মধ্যে চরম বন্ধুত্ব লাভ করিয়া থাকে। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, নিষ্ঠুর-হৃদয়, হিংসুক ও অত্যাচারী স্বামীকে অনেক সময়ে স্ত্রীর উপদেশ ও পরামর্শে ক্রোধ ও অসূয়া দমন করিতে দেখা গিয়াছে। শুধু শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজের দম্পতি নহে, পরন্তু অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্ত্রীকে স্বামীর পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে আচরণ করিতে দেখা গিয়া থাকে। বিপদে সান্ত্বনা, রোগে পরিচর্য্যা, শোকে সহানুভূতি, এই সমস্ত ব্যাপারে স্ত্রীকে খুব উচ্চ শিক্ষিত হইবার প্রয়োজন হয় না। নিতান্ত সাধারণ ঘরের অশিক্ষিতা স্ত্রীর মধ্যেও সচরাচর এইরূপ আচরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কলহ-বিবাদ হয়

মৈত্রী

না, তাহা নহে। বরঞ্চ অনেক সাধারণ ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে দিবারাত্র কলহ লাগিয়াই আছে। কিন্তু ঐ কলহ হয় প্রায়শঃ বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া এবং উভয়ে একই সংসারকে নিজের সংসার মনে করে বলিয়া। সুতরাং ঐ কলহ তাহাদের পরস্পরকে মিত্র বা আপনার জন ভাবিবার পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধকতা জন্মায় না।

বিবাহের চতুর্থ কল্যাণ সাহচর্য্য লাভ। বিবাহের পর হইতেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জানে উভয়ের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। একজনের দুঃখে আর এক জনের দুঃখ; একজনের সুখে অপরের সুখ।

সাহচর্য্য

এই অনুভূতি হইতে সংসারের কর্ত্তব্যগুলিকে উভয়ে সমানভাগে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভাগ করিয়া লয়। স্বামী সাধারণতঃ বাহিরের কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া আসিয়া দেখে ভিতরের কাজগুলি স্ত্রী গুছাইয়া রাখিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী স্বামীর অর্থোপার্জ্জনের কার্য্যেও সমান সহযোগিতা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ পুরুষ যখন দিল্লীর সিংহাসন-চ্যুত হইয়া রাজপুতানার মরুভূমির বৃক্ষ-তলে নিজেকে ক্ষুধা-কাতর ক্লান্তভাবে শায়িত দেখিল, তখন সেই বিপদে নিজের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিল কাহাকে?—নিজের স্ত্রীকে। সুতরাং আপদে-বিপদে, সুখে-সম্পদে স্ত্রীর মত এমন সহচরী আর কেহ নাই। যে-বিপদে পুরুষ নিজের ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই চরম মুহূর্ত্তে যাহার সান্ত্বনা-দায়িনী হস্ত পুরুষের দেহ জুড়াইয়া দেয়—সে সহচারিণী স্ত্রী। বস্তুতঃ স্ত্রীই পুরুষের বিরাট সাংসারিক দায়িত্বকে অতটা লাঘব করিয়াছে এবং সাংসারিক সকল কাজে শৃঙ্খলা বিধান করিয়াছে।

বিবাহের পঞ্চম উপকারিতা মানব-মনের বিস্তৃতি সাধন। মানুষ

জন্মগতভাবে আত্ম-কেন্দ্রী ও স্বার্থপর। মানুষ দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ই নিজের সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের মাপকাঠি দিয়া ওজন করিয়া থাকে। তাহার কর্ম্ম-ও জ্ঞান-সাধনার সমস্ত সৌধ নিজেকে ঘিরিয়া ও নিজের স্বার্থকে, ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে। কিন্তু মানবের এই আত্ম-পরতার ভিত্তিতে আঘাত করে বিবাহ। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা প্রধানতঃ যৌন-প্রেম হইলেও উহার তীব্রতায় স্বামীকে সকল ব্যাপারে স্ত্রীর অংশীদারত্ব মানিয়া লইতে হয়। এতদিন সমস্ত সাধনা-পথে সে নিজেকে একা কল্পনা করিয়াই আনন্দ পাইত; কিন্তু বিবাহের পর হইতে সকল কাজে যে একটী ব্যক্তি তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কল্পনা-পথে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়—সে তাহার স্ত্রী। এইভাবে পুরুষের আত্ম-পরতার কোনও এক ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী পুরুষের সমস্ত আত্ম-কেন্দ্রী সুখের রাজ্যের অপরিত্যজ্য অংশীদার হইয়া বসে। তাহার পর ক্রমাগত সন্তানদের আগমনে পুরুষের সেই সুখের রাজ্যের অংশীদার-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে পুরুষের আত্ম-পরতা বিস্তার লাভ করিয়া সেই বৃত্তের মধ্যে ক্রমশঃ সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী, দেশবাসী এবং আরও প্রসারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে গ্রহণ করে। ফলতঃ বিবাহই মানুষের ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর আত্মাকে বৃহৎ ও পরার্থপর করে, মানুষের স্নেহ-প্রীতিকে বিস্তৃত করে; পরের জন্য আত্ম-ত্যাগের বাসনাকে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করে। এক কথায়, মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিবাহ এক অতি সুনিশ্চিত সাধনা-পথ।

মানব-মনের বিস্তৃতি সাধন

পক্ষান্তরে বিবাহের অনেকগুলি দোষও আছে। এই সমস্ত দোষ এত

জটীল ও দুঃসাধ্য যে, উহাদিগকে সহজে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

বিবাহের দোষ

এই সমস্ত দোষের মধ্যে যৌন-অতৃপ্তি, কর্ম্ম-কেন্দ্রের সংকীর্ণতা, পারমার্থিক সাধনার বিঘ্ন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত দোষ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ডাঃ ফ্রয়েড এবং অন্যান্য বহু যৌন-বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, বিবাহ কিছুতেই মানুষকে যৌন-তৃপ্তি দান করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব

একঘেয়েমী

অনুচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, পুরুষ সাধারণতঃ বহু-নারী-কামী; সে এক-স্ত্রীতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। অথচ বিবাহ-জীবনে যৌন-নিষ্ঠা রক্ষা না করিলে দাম্পত্য-জীবন কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। যৌন-নিষ্ঠার এই বাধ্যকরতা পুরুষের পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর। সেইজন্য বিশেষ সংযমী পুরুষ ব্যতীত সাধারণতঃ কোনও পুরুষ যৌন-নিষ্ঠা রক্ষা করে না; স্ত্রীর জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অন্য নারীতে কিম্বা বেশ্যায় আসক্ত হইয়া থাকে। পুরুষের এই ব্যবহারে দাম্পত্য-জীবন অসুখের হইতে বাধ্য। যৌন-নিষ্ঠার এই দুঃসহ বাধ্যকরতা এড়াইবার জন্য পুরুষ তাহার ক্ষমতাবলে আইন-সম্মত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে বহু-বিবাহের প্রচলন করিয়া। আজিও পৃথিবীর বহু সভ্য জাতির মধ্যে বহু-স্ত্রী-গ্রহণ আইন-সঙ্গত। যে সমস্ত জাতির মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে আইন-ঘটিত বাধা আছে, তাহারা বিবাহেতর নারী-সঙ্গমে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। সুতরাং বিবাহের অবিচ্ছেদ্য কর্ত্তব্য যে যৌন-নিষ্ঠা, সেই কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব কেবল নারী জাতির স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। ফলে বিবাহের কুফল নারী জাতিকেই বেশী ভোগ করিতে হইতেছে।

ডাঃ হ্যামিল্টন এ-বিষয়ে একশত বিবাহিতা নারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই যে, বিবাহে পুরুষ অপেক্ষা নারী জাতিই বেশী নৈরাশ্য ভোগ করিতেছে। কিন্তু ডাঃ ক্যাথারিন ডেভিসের গবেষণার ফল অন্যরূপ। তিনি এক হাজার বিবাহিতা নারীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ৮৭২ জনের উত্তর পাইয়াছেন যে, তাহারা বিবাহে সুখী হইয়াছে; ১১৬ জন অসুখী হইয়াছে এবং ১২ জন কোনও উত্তর দেয় নাই। যৌন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডিকিন্ এক হাজার রোগী পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শতকরা ৬০ জন বিবাহিতা নারীই বিবাহিত জীবন "সহিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ "কোনও মতে খাপ খাওয়াইয়াছে" মাত্র।

সুতরাং বিবাহিত জীবন মোটের উপর নারী বা পুরুষ কাহারও পক্ষে যৌন-তৃপ্তির দিক হইতে সুখের নহে। এতদ্ব্যতীত বিবাহিত জীবনে রতি-ক্রিয়া নিতান্ত একঘেয়ে বলিয়া নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই উহা বিশেষ পীড়া-দায়ক।

যৌন-ক্রিয়ার তৃপ্তি ও আনন্দের দিক হইতে বিচার করিলে বিবাহের এই সমস্ত দোষের কথা নিতান্ত তুচ্ছ নহে, একথা ঠিক। কিন্তু এ সমস্তেরই প্রতীকার হইতে পারে। বিবাহকে আমরা সমাজ-কল্যাণের অন্যান্য দিক হইতে আবশ্যক বিবেচনা করিলে উপরোল্লিখিত ত্রুটীসমূহ দূর করিবার উপায় সহজেই উদ্ভাবন করিতে পারি। বিবাহের পূর্ব্বে আমরা ভাবী দম্পতির স্বাস্থ্য, রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, শারীরিক সামঞ্জস্য ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উপযোগিতা সাব্যস্ত করিয়া বিবাহ দিলে এই সমস্ত অসামঞ্জস্যের বার-আনা সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে। মানুষের জ্ঞানের সসীমতাহেতু তবু বিবাহ-জীবন অসুখী হইতে পারে।

তাহার প্রতীকারের জন্য উভয় পক্ষের তালাকের অবাধ ক্ষমতা থাকিলে এ-সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে সমাজ রক্ষা পাইতে পারে। যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে বিবাহিত জীবনে যৌন-ক্রিয়ার একঘেয়েমী দূর হইতে পারে, যথা স্থানে আমরা তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

আত্মিক সাধনায় বিঘ্ন

বিবাহের দ্বিতীয় দোষ পারমার্থিক সাধনার বিঘ্ন সৃষ্টি। ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, অধিকাংশ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও সমাজ-সংস্কারক নিজেরা বিবাহিত জীবন এড়াইয়া চলিয়াছেন এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে সৎকার্য্য সাধনের পরিপন্থী মনে করিয়াছেন। ইঁহাদের অভিমত এই যে, পরিবার মানুষকে নির্লিপ্তভাবে কোনও বৃহৎ কার্য্য করিতে দেয় না। স্ত্রী-পুত্র মানুষের দৃষ্টি-কোণ্‌কে সংকীর্ণ ও তাহার সাধনা-ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে পুরুষকে এতটা ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিতে হয় যে, দেশ-সেবা, মানব-সেবা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিবার তাহার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও সময় মোটেই থাকে না। বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণের জীবন অতীব শোচনীয় ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। কারণ উক্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের সাধনায় পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এমন আত্ম-বিস্মৃতভাবে সমাহিত হইতেন যে, স্ত্রীর প্রতি যৌন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য পালন করিবার কথা তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন। সুতরাং কোন সাধনার পক্ষেও বিবাহ একটা মস্ত বড় বিঘ্ন। কিন্তু ইহা চিত্রের একদিক মাত্র। বিবাহও যে একটা সাধনা, এ-সাধনায়ও যে ফল ও আনন্দ আছে, ইহাও যে মানব-কল্যাণের একটা উৎস, প্রাচীন জ্ঞানপন্থীগণ এই দিক

হইতে বিবাহকে বিচার করেন নাই। বস্তুতঃ, নারী-জাতির সদ্ব্যবহার করিলে পুরুষের প্রত্যেক সাধনা-ক্ষেত্রে নারী তাহার পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিতে পারে, এই বোধ আজকাল সভ্য জগতের সর্ব্বত্র উন্মেষ লাভ করিতেছে।

বিবাহের আর একটী মস্ত দোষ এই যে, ইহাতে পুরুষের স্কন্ধে একটা অর্থ-নৈতিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে যাহার-তাহার জীবনযাপনেই বিশেষ বেগ পাইতেছে; তাহার উপর জীবনের প্রারম্ভে যৌবনের আনন্দ উপভোগের সময়ে একটা অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায় যুবক মাত্রেরই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। চারিদিক হইতে অভাবের তাড়নায় সে দুই চক্ষে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া এই বেকার-সমস্যার যুগে স্ত্রী যুবকের স্কন্ধে একটা দুর্ব্বহ বোঝা মাত্র। যুবকের দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অনেক দূরদর্শী সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি এই জন্য যুবকদিগকে উপার্জ্জন-ক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। যুবকদের অর্থনৈতিক দিক হইতে এই পরামর্শ একটী সুযুক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার যৌন-জীবনের কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? যতদিন সে উপার্জ্জন-ক্ষম না হয়, ততদিন বিবাহ না করিলে, হয় তাহাকে ভাবী-স্ত্রীর জন্য দেহের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, অন্যথায় তাহাকে বিবাহেতর যৌন-সম্ভোগ করিবার পরামর্শ দিতে হইবে। যৌন-পবিত্রতা রক্ষা করিতে গেলে যুবকের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও স্বপ্নময় জীবনকাল বৃথা অতিবাহিত হইবে, আর বিবাহিতের যৌন-সম্ভোগ করিতে গেলে তাহার চরিত্র ও অর্থ উভয়ই বিপন্ন হইবে। সুতরাং

অর্থনৈতিক দায়িত্ব

ইহা উভয়-সঙ্কটের ব্যাপার এবং এই উভয়-সঙ্কটের জন্য বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথাকেই দায়ী করা হইয়া থাকে।

কিন্তু বাস্তবিক সঙ্কট ইহা নহে। স্ত্রীকে জীবনের ভার মনে করা একটা ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের যুবকদের মনে ইহা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু একটু ধীর চিত্তে চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বিবাহ আমাদের কর্ম্ম-জীবনে দীক্ষামাত্র। প্রিয়তমা স্ত্রী আমাদের কর্ম্মে প্রেরণা-সৃষ্টি করিয়া থাকে। অনেক নিষ্কর্ম্মা ও উচ্ছৃঙ্খল যুবককে সুন্দরী স্ত্রী বিবাহ করাইয়া বিষয়-কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার সংবাদ হয়ত অনেকেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ বিবাহ আমাদের মধ্যে দায়িত্ব-জ্ঞানের সৃষ্টি করে। অবিবাহিত তরুণ যুবকের মধ্যে অগভীর তারল্য, চপলমতিত্ব, কর্ত্তব্যে অবহেলা ও নিষ্ফল ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ততা আমরা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু মনোগত স্ত্রী বিবাহ করাইয়া দিলে এই প্রকৃতির তরুণদের কর্ত্তব্য-বোধের স্ফুরণ হইতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে।

উপরে বিবাহের যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্তই পুরুষের পক্ষের কথা। স্ত্রীর পক্ষ হইতেও বহু অসুবিধা আছে।

নারীর পক্ষে বিবাহে অসুবিধা

বিবাহিত জীবন নারীর জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দেয়। নারীর মাতৃত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও বহির্জ্জাগতিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাণ্ড বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। মাতৃত্ব এত বড় একটা দায়িত্ব যে, ঐ দায়িত্ব সাধনে নারীর সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়; জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য তাহার আর অবসর থাকে না। বিশেষ করিয়া এই জন্যই

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনে নারী-প্রতিভার ততদূর বিকাশ হইতে দেখা যায় না।

ইহা খুব শক্তিশালী যুক্তি হইলেও ইহা বিবাহের বিরুদ্ধে নহে—ইহা সৃষ্টির বিরুদ্ধে। বিবাহ-প্রথা না থাকিলেও নারীকেই সৃষ্টির কার্য্য চালাইতে হইবে এবং সন্তানোৎপাদনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তাহাকেই সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং এজন্য বিবাহ-প্রথাকে দোষ দিয়া লাভ নাই।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় মোটা-মুটি এই সাব্যস্ত হইল যে, (১) মানব-কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের যৌন-সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও-না-কোনও প্রকারের বিবাহ-প্রথা মানিয়া লওয়া উচিত এবং (২) বিভিন্ন প্রকারের বিবাহের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে বিশেষ ব্যবস্থাসহ ঐকিক বিবাহই সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ।

বিবাহের পাত্র-পাত্রী বিচার

এখন আমাদের বিচার্য্য এই, বিবাহে আমাদিগকে কি নীতিতে পাত্র বিচার করিতে হইবে? অবশ্য আমরা সভ্যতার পূর্ণ বিকাশে এমন অবস্থার কল্পনা করিতে পারি, যখন মানুষ ভালবাসার দ্বারাই বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্দ্ধারণ করিবে। অন্ধ ও বিচার-ক্ষমতাহীন বলিয়া আমাদের প্রেমের একটা বদনাম আছে। ইহা কোনও-কোনও ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সাধারণতঃ মানুষের প্রেম বিশেষ বিবেচনা করিয়াই যে পাত্র নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, তাহার সব চাইতে বড় প্রমাণ এই যে, সুন্দরকেই মানুষ ভালবাসিয়া থাকে। সৌন্দর্য্য একটা গুণ। সৌন্দর্য্য বিচার করিয়া যদি মানুষ ভালবাসার পাত্র স্থির করিতে পারে, তবে ঐ সঙ্গে পাত্রের আরও দু'চারটা গুণ যে কেন বিচার করিতে পারিবে না, তাহার যুক্তি-সঙ্গত কোনও

কারণ নাই। সুতরাং মানুষের প্রেম-বৃত্তি এত অন্ধ নহে যে, সে কাল-অকাল, পাত্র-অপাত্র, সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি বিচার না করিয়া পাত্রের বয়স-শক্তি, সম্বন্ধ, অবস্থা ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া চলিবে। ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে ঐরূপ দুর্জ্জয় প্রেম সাময়িক-ভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ঐ শ্রেণীর অন্ধ প্রেম প্রায়শঃ বিবাহে পরিণতি লাভ করে না। আমরা এখানে প্রেমের পাত্র বিচারে বসি নাই; বিবাহের পাত্র বিচার করিতে বসিয়াছি। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষ ভালবাসা-প্রণোদিত হইয়া বিবাহ করিলেও সামান্য চেষ্টাতেই সকলদিক হইতে গ্রহণ-যোগ্য ও কল্যাণ-প্রসূ পাত্র নির্ব্বাচন করিতে পারে।

রক্ত-সম্বন্ধ বিচার

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে মানুষ রক্ত-সম্বন্ধকেই প্রধান মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কোনও-কোনও মতে রক্তের বিচারে খুব নিকট সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত। আর কোনও মতে যাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই, এমন দুইজনের মধ্যেই বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিকট-আত্মীয় বিবাহ

অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়ের সহিত যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনে সকল জাতিই আজকাল ঘৃণাবোধ করিয়া থাকে। কিন্তু বরাবর এই মনোভাব ছিল না। গ্রীক ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে পিতা-পুত্রী ও মাতা-পুত্রে বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। বেথাল বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাচীন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে, মিশরীয় দেবতা আমন তাঁহার মাতাকে, স্কেন্দানাভিয়ার দেবতা ওডিন স্বীয় কন্যা ফ্রিগাকে, রোমীয়

দেবতা জুপিটার তাঁহার সহোদরা জানোকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুইজারল্যাণ্ড, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, এথেন্স প্রভৃতি দেশে মাতা-পুত্রে, পিতা-কন্যায়, ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে মিশর ও পারস্য হইতে ঐ প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে বটে, তবু এখনও খুব নিকট-আত্মীয়দের মধ্যেই বিবাহ হইয়া থাকে। স্পেন ও রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশেই সহোদরা ভাই-ভগিনী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে অসভ্য জাতি-সমূহের মধ্যে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার অর্দ্ধসভ্য জাতি-সমূহের মধ্যে এ বিষয়ে এত কড়াকড়ি নিয়ম বিদ্যমান যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে বাধ্য। সভ্য জাতি-সমূহের মধ্যে ভারতের হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গলার হিন্দুগণ, এক গোত্রে বিবাহ করেন না। এক গোত্রে কিম্বা নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ না করিবার দুইটী যুক্তি আছে; প্রথমতঃ, ইহাতে সম্বন্ধ এলো-মেলো হইয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বংশ-বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এ সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করিতেছি।

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে বহু অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য সম্প্রদায় আছে, যাহারা নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ে বিবাহ করে না। সিংহলের ওয়েডা সম্প্রদায়ের মধ্যে সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ খুব পুণ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদিমকালে মানুষ যাহাই করুক না কেন, এখন মানুষ মধ্যপন্থা

অবলম্বন করিয়াছে। কারণ মধ্যপন্থাই বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয়।

মধ্যপন্থা

একেবারে ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্কের যৌন-মিলনও যেরূপ শুভ নহে, তেমনই একেবারে ভিন্ন গোত্রে চলিয়া যাওয়াও বিজ্ঞান-সম্মত নহে। ডাঃ ফোরেল বলিয়াছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর মধ্যে যৌন-মিলন করাইয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে সন্তানোৎপাদন হয় না। আবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের যৌন-সম্মিলন দ্বারা যে সমস্ত সন্তান হয়, তাহারা দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক ও উৎপাদিকা-শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, এমন বহু জাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ ফোরেলের মতে এই শ্রেণীর যৌন-মিলনে শতকরা ২৫টী সন্তান মাতৃগর্ভেই মারা যায়।

কিন্তু সাক্ষাৎ খুড়াত, মামাত এবং পিসাত ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ হইলে তদ্দারা যে মানবের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, ডাঃ ওয়েষ্টার মার্ক বা ফোরেল তাহা স্বীকার করেন না। স্পেন ও রুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপে এবং সমস্ত মুসলিম-জগতে ইহার প্রচুর প্রচলন আছে; কিন্তু তদ্দারা যে ইহাদের জন্ম-সংখ্যা-গত কি মস্তিষ্ক-গত কোনও অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

তবু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবাহে মানুষের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সে বিতৃষ্ণা সম্পর্কের ঘনিষ্টতার জন্য নহে, পরন্তু পরিচয়ের ঘনিষ্টতার জন্য! নিতান্ত ঘনিষ্ট পরিচয়ের মধ্যে মানুষের যৌন-বাসনা উদ্দীপ্ত হয় না। প্রকৃতি ও আকৃতির বিভিন্নতাই যৌন-আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা ডাঃ বার্ণাডিনের অভিমত। তিনি বলেন, বেঁটে ব্যক্তি দীর্ঘ ব্যক্তিতে, দীর্ঘ ব্যক্তি বেঁটে ব্যক্তিতে অধিকতর

আসক্ত হইয়া থাকে। উগ্র-প্রকৃতির লোক কোমল-প্রকৃতির লোককে এবং কোমল-প্রকৃতির লোক উগ্র-প্রকৃতির লোককে অধিকতর পসন্দ করে।

সুতরাং মানুষ যে সাধারণতঃ গোত্রের বাহিরে বিবাহ করিতে অভিলাষী, তাহা আত্মীয়-গমনে বিতৃষ্ণার জন্য নহে, পরন্তু অভিনবত্বের লালসার জন্য।

বিবাহে নারী-পুরুষের রূপ, গুণ, অবস্থা ও বংশ এই চারিটী প্রধান বিবেচ্য বিষয়। চরিত্র, শিক্ষা, মেজাজ প্রভৃতি আরও বহু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন বটে, কিন্তু প্রথমোক্ত চারিটী বিষয়কেই মানুষ সাধারণতঃ প্রাধান্য দিয়া থাকে এবং এই প্রাধান্য দেওয়ার মূলে যুক্তি-সঙ্গত হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিবাহে বিবেচ্য বিষয়

বিবাহের ন্যায় আজীবন-স্থায়ী ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনে পরস্পরের গুণা-গুণ বিচারের ন্যায্য অধিকার নারী-পুরুষের উভয়ের সমভাবে থাকা বাঞ্ছনীয় হইলেও পুরুষের প্রাধান্য-হেতু এযাবৎ সে বিচারের অধিকার পুরুষ একাই ভোগ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার এই একচেটিয়া অধিকার কেবল নারীর রূপ বিচারেই বিনিয়োগ করিয়াছে। নারীও অগত্যা পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নিজের রূপ প্রসাধনেই নিজের বার-আনা শক্তি নিয়োজিত করিয়া আসিতেছে। পুরুষের সৌন্দর্য্য-বোধই নারীর সৌন্দর্য্যের নিয়ামক। যে দেশের পুরুষ যে-ভাবে নারীকে সুন্দর মনে করিয়াছে, নারী সেই ভাবেই নিজের দেহকে প্রসাধিত করিয়াছে।

রূপ

বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের ধারণা অতি অদ্ভুতরূপে বিভিন্ন। প্রাচ্য নারীরা ঘন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশরাজিকে সৌন্দর্য্যের উপকরণ

রুচির বিভিন্নতা

মনে করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় নারীরা সোণালী রঙ্গের ঝাঁক্ড়া বাবরী চুল পসন্দ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা আর্য্যজাতির উচ্চ নাসিকাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কোচিন-চীনের অধিবাসীরা সাদা দাঁতকে অতিশয় কদর্য্য মনে করিয়া থাকে। চীনের অধিবাসীরা নারীর ক্ষুদ্রাকৃতিপদ অতিশয় পসন্দ করিয়া থাকে। হটেনটটের অধিবাসীদের বিবেচনায় নারীর স্তন এতটা দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সে স্তন অনায়াসে কাঁধের উপর দিয়া পিঠে ঝুলাইয়া দিতে পারে এবং পিঠে-বাঁধা সন্তান তাহাতে অনায়াসে দুগ্ধ পান করিতে পারে। সাঁওতাল রমণীরা প্রায় সতর সের ওজনের গহণা গায় দিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে গ্রীক ও রোমীয়েরা নারীর যৌন-কেশ মুণ্ডন নারী-সৌন্দর্য্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিবেচনা করিত। প্রাচ্যের অধিকাংশ জাতি বর্ত্তমানে নারী-পুরুষের যৌন-কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলে। কিন্তু ইউ-রোপীয় সভ্য জাতিসমূহ নারীর যৌন-কেশ সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। ইহাকে ইউরোপীয়েরা নারী-সৌন্দর্য্যের অঙ্গ মনে করিয়া থাকে। অনেকের অভিমত এই যে অত্যধিক শৈত্যের প্রকোপ হইতে নারীর যৌন-প্রদেশকে রক্ষা করিবার জন্যই ইউরোপীয়েরা অন্যান্য দিকে অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়াও নারীর যৌন-কেশ মুণ্ডন করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু এই স্বাস্থ্যনৈতিক যুক্তিই যে ইউরোপীয়দের এই আচারের একমাত্র কারণ, তাহা নাও হইতে পারে। কারণ গ্রীষ্ম-প্রধান দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যেও নারীর যৌন-কেশ রক্ষার প্রথা আছে। উত্তর ইংলণ্ডেও নারীর যৌন-কেশ লইয়া এইরূপ বিলাসিতা করিবার

দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ ব্র্যাণ্টন বলিয়াছেন, ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত রমণীরা নিজেদের যৌন-কেশ মাথার কেশের মতই সযত্নে দীর্ঘ করিতেন।

এই সমস্তই পুরুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। পুরুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নারী নাক কান ছিদ্র করিয়াছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুদানী দিয়াছে। ফলতঃ নারীকে পুরুষ যেভাবে সুন্দর হইতে বলিয়াছে, যুগে-যুগে নারী পুরুষের সেই রূপ-ক্ষুধা মিটাইয়াছে।

নারীর স্বাস্থ্যও এই রূপেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এবিষয়ে পৃথক করিয়া বিচার করিবার কারণও সচরাচর ঘটে না। বিবাহের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহা সকল সময় সম্ভবও নহে।

নারীতে দ্বিতীয় বিবেচ্য তাহার গুণ। এই গুণ কথাটী একটী সর্ব্বগ্রাসী শব্দ। স্বামীর প্রয়োজন-ভেদে নারীর গুণ-বিচার হইয়া থাকে। নিতান্ত

গুণ

বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন কৃষকের স্ত্রীর মধ্যে যে গুণ থাকিলে কৃষক খুশী হইবে, রসস্তিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ধনী-পুত্রের বধূর পক্ষে সে সমস্ত গুণ দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। 'কামসূত্র' প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় যৌন-শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, তৎ-কালে নৃত্য-গীতও রন্ধন ব্যতীত শৃঙ্গারাদি চৌষট্টি কলাতে নিপুণ হওয়া নারীর বিবাহ-যোগ্যতার মধ্যে পরিগণিত ছিল! বড়লোকের গৃহিণীর যোগ্যতার মাপকাঠি যাহাই হউক না কেন, সাধারণ গৃহস্থের গৃহিণী হইতে গেলে পত্নীর রন্ধন ও পরিবার-প্রতিপালন-ব্যাপারে দক্ষতা অত্যাবশ্যক। সুতরাং বিবাহ-কামী পুরুষ নিজের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে ভাবী স্ত্রীর দোষ-গুণ বিচার করিয়া থাকে।

স্ত্রীর বংশ-বিচার একটা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। প্রশ্নটী সকল দিক

দিয়াই জটীল। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদের যুগে যখন মানুষ উচ্চ-নীচ ও ইতর-ভদ্র প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতেছে, সেই সময়ে বংশ-বিচার করিয়া বিবাহ করিবার পরামর্শ দিতে আমাদের প্রাণেও বাধিতেছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজন। পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে আমরা নিকট-আত্মীয়-বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছি যে, পিতা-মাতা ও সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী ব্যতীত এবং অবস্থা-ও বয়স-ভেদে আরও দুই-একটী সম্পর্ক বাদে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। এ-বিষয়ে জাতি-গত বা দেশ-গত বা অন্য কোনও রূপ প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নহে। তবু আমরা এখানে বর-কন্যার বংশ-বিচার করিবার পরামর্শ দিতেছি এই জন্য যে, বংশ অর্থে আমরা অভিজাত্য বুঝাইতেছি না। বংশের লোকদের অর্থাৎ পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী ও ভ্রাতা-ভগিনীর চরিত্র, রুচি, শিক্ষা, দীক্ষা ও মস্তিষ্ক-প্রকৃতি বুঝাইতেছি। বর-কন্যার উপরোক্ত আত্মীয়দের স্বাস্থ্য, রুচি, মেজাজ ও প্রকৃতির অনেকখানি তাহাদের মধ্যে সংক্রমিত হইবার কথা। সুতরাং ঐ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহ-জাত সন্তানাদির পক্ষে ত উহা বিশেষ কল্যাণের আকর হইবেই, তাহা ছাড়া দম্পতির বিবাহ-জীবনেও উহা বিশেষ ফল-প্রসূ হইবে।

বংশ

বিবাহে অবস্থা-বিচার আর একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কন্যা যে পরিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, বিবাহের ফলে সে যদি স্বামীর ঘরে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পতিত হয়, তবে তদ্দ্বারা দাম্পত্য-জীবনের সুখ-সুবিধা অনেকখানি বিপন্ন হইয়া থাকে। এক সম্পদশালী বড়লোকের

আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা

অতি সচ্চরিত্র কর্ত্তব্য-পরায়ণা ও স্বামীর প্রতি অতিশয় প্রেমবতী মেয়েও দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিকের গৃহিণীরূপে সুখে জীবনযাপন করিতে পারিবে না। অথচ সমান অবস্থার স্বামী-গৃহে পড়িলে ঐ মেয়েই আদর্শ গৃহিণীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে। সুতরাং বিবাহে অবস্থা বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, বড়লোকের মেয়ে দরিদ্র যুবকের দৈহিক রূপ ও ব্যক্তি-গত গুণে মুগ্ধ হইয়া যৌবনের উদ্দাম প্রেমের আতিশয্যে নিশ্চিত দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। মেয়ের প্রাণে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যুবকের প্রতি অনুপম প্রেম তাহাকে যে-কোনও প্রকার দুরবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দান করিবে। কিন্তু যৌবনে ভাটা পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রেমের উদ্দামতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, প্রেমের নেশা টুটিয়া গেল, সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; পিতার অবস্থা ও স্বামীর অবস্থার পার্থক্য এতদিন পরে তাহার প্রাণে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল; জীবন তাহার দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িল; এইভাবে দুইটী সুন্দর প্রাণ অবস্থা-বৈগুণ্যে পরস্পরের প্রতি তিক্ত হইয়া পড়িল; দাম্পত্য কলহ আরম্ভ হইল ইত্যাদি। অবস্থা বিচার না করিয়া প্রেমে পড়ার ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যৌবনের প্রেম অসম্ভব সাধন করিতে পারে, কিন্তু প্রৌঢ়ের প্রেম তাহা রক্ষা করিতে পারে না, এই কথাটী বিবেচনা করিলে প্রেমেরও মর্য্যাদা রক্ষা হয়, বিবাহটীও যথাস্থানে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আর একটী কথা। বিবাহে বয়স বিচারটাও প্রয়োজন। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ১০।১২ বৎসরের পার্থক্য থাকা উচিত। স্ত্রীর বয়স

বয়স

১৮।১৯ এবং স্বামীর বয়স ২৮।৩০ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাল্য-বিবাহ অবশ্য-পরিহার্য্য। কারণ বাল্য-বিবাহে

নারী জাতির উপর অকাল-মাতৃত্বের বোঝা চাপানোর সাধারণ দোষ ছাড়াও একটী বিশেষ দোষ এই হয় যে, নারী অল্পদিনেই রূপ-যৌবন হারাইয়া ফেলে এবং পুরুষ স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্য অন্য যুবতীর দিকে ধাওয়া করে। দুই জনের বয়স-পার্থক্য ইহাপেক্ষা কম হইলেও নারীর ঐ একই বিপদ। আবার উভয়ের বয়সের পার্থক্য ইহাপেক্ষা বেশী হইলেও বয়সের বিষমতার জন্য ভাবের সামঞ্জস্য সুতরাং মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি আশা করা যাইতে পারে না।

বিবাহের বয়স ব্যাপারে একটী বিষয়ের প্রতি সকলে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া আমি প্রয়োজন বোধ করি। আমি বলিয়াছি, বাল্য-বিবাহ সকল দিক হইতে নিন্দনীয় সুতরাং বর্জ্জনীয়। কিন্তু বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদে দেশে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, ইহাও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

বাল্য-বিবাহ বনাম যৌবন বিবাহ

বিবাহের বয়স না-হইতেই যেমন বালক-বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে, বিবাহের বয়স হইলে এ-বিষয়ে বিলম্ব করাও তেমনই উচিত নহে। শিক্ষা ও বৈষয়িক সংস্থানের অজুহাতে আজকাল অনেকেই বিবাহে অযথা বিলম্ব করিয়া থাকে। ইহার ফলে অনেককে যৌবন-সন্ধ্যায়ও অবিবাহিত দেখা গিয়া থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বাল্য-বিবাহ যেমন স্বাস্থ্য-ও শরীর-গঠনের পরিপন্থী ও তাহা সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর, যৌবন-শেষে বিবাহও তেমনই স্বাস্থ্য-ও শরীর-পালন এবং সন্তান ধারণের প্রতিকূল। প্রাচ্য-দেশীয় সকল জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীনকাল হইতে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কোনও-কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্য-ও শৈশব-বিবাহ হাস্যকর মাত্রায় পৌছিয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু যৌবন-

শেষে বিবাহ বড়-একটা দেখা যাইত না। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ অনেক স্থলে বিপরীত দিকে হাস্যকর মাত্রায় পৌঁছিয়া থাকে। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশেও আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বাল্য-বিবাহকে যতটা নিন্দা করা হয়, অধিক বয়সে-বিবাহকে ততটা নিন্দা করা হয় না। কিন্তু ইউরোপ-খণ্ডেও এই আতিশয্যের ভ্রান্তি উপলব্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ডাঃ মেরী ষ্টোপস, ডাঃ কিশ্‌ প্রভৃতি যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ যৌবনাগমে অতি সত্বর বিবাহ দেওয়ার বিশেষ পক্ষপাতী।

আমরা পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সকল প্রকার যৌন-মিলন-ব্যবস্থার মধ্যে বিবাহই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, বিবাহের মধ্যে আবার ঐকিক-বিবাহই প্রশস্ততম এবং সকল দিক হইতে সামাজিক কল্যাণ-প্রদ।

আদর্শ-বিবাহ

সেইজন্য সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ঐকিক বিবাহকে আইন ও সামাজিক শাসনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্র এই চেষ্টা সফল হইতেছে না।

পুরুষের যৌন-প্রবৃত্তি যাহাই হউক না কেন, বৈষয়িক নানা কারণের চাপে মানুষ সাধারণতঃ ঐকিক-বিবাহবাদী। অনুকূল অবস্থার সাহায্য পাইলে পুরুষ এক-পত্নীক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকিতে প্রস্তুত আছে। আর নারীজাতি ত স্বভাবতঃই ঐকিক বিবাহের পক্ষপাতী।

ঐকিক-বিবাহ

তবু যে ঐকিক বিবাহ-বাদ নানা প্রকারে বাধা-প্রাপ্ত হইতেছে, তবু যে মানুষের বৈবাহিক জীবনে নানা প্রকার অপ্রীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা

দিতেছে, তাহার কারণ, মানুষ বিবাহকে সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে নাই। সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। রাষ্ট্র-নায়কগণ নূতন-নূতন উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। তবু আমরা বিবাহকে আদর্শ অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি নাই। পারি নাই এই জন্য যে, মানুষের স্থিতি-স্থাপক, সংস্কার-বিরোধী মন ধর্ম্মীয় ও সামাজিক স্থাণু কুসংস্কারসমূহকে আকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে। সংস্কারকদের সদিচ্ছা-প্রণোদিত সমস্ত প্রচেষ্টা মানুষের কুসংস্কারান্ধ মনের পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

কিন্তু তবু হতাশ হইবার কারণ নাই। কারণ, নূতন সত্যের সূর্য্য-কিরণ কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া দুনিয়াকে আলোকিত করিবেই। যুগে-যুগে সত্যর আলো এইভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সত্যানু-সন্ধিৎসু সমাজ-হিতৈষীকে কুজ্ঝটিকার অন্তরালে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সত্যের আলো গ্রহণ করিবার জন্য তাহার মনকে প্রস্তুত করিতেই হইবে। মানব-কল্যাণের জন্য মানুষকে ধর্ম্মীয় ও নৈতিক ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য, মানুষকে ক্রমোন্নতিশীল প্রাণীরূপে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, তাহার দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য, বিবাহ-প্রথাকে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। শুধু প্রথাটিকে বাঁচাইয়া রাখিলেই চলিবে না। এই প্রথাকে সকল প্রকারে মানবের কল্যাণ-প্রসূ করিতে হইবে, এই প্রথাকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক আনন্দ ও পুলকের উৎসে পরিণত করিতে হইবে। এক কথায়, বিবাহ-প্রথাকে মানুষের সকল প্রকার যৌন-অকল্যাণ ও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিষেধক মহৌষধিরূপে, সকল প্রকার যৌন-সংযম ও যৌন-তৃপ্তির মনোরম

আশ্রমরূপে মানবের মনে, তাহার সমাজে, তাহার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বিবাহকে অমন সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-প্রসূ অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে বিবাহের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এ বিষয়ে আমাদিগকে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় সংস্কার সাধন করিতে হইবে।

বিবাহিত-জীবনের বহির্জ্জাগতিক মানব-সেবার কর্ত্তব্যের কথা আপাততঃ বাদ দিয়া শুধু স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনের দিক হইতে আলোচনা করিলেও ক্যারেণ হর্ণীর মতে বিবাহের অতি সুস্পষ্ট তিনটী দিক আছে: (১) দৈহিক সম্বন্ধ (২) মানসিক সম্বন্ধ এবং (৩) সংসৈগিক সম্বন্ধ। এই তিনটী সম্বন্ধের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী যদি যোগ-সূত্র খুঁজিয়া পায়, তবেই বিবাহ আদর্শ বিবাহ হইয়াছে মনে করিতে হইবে; অন্যথায় উহার মধ্যে যে পরিমাণে যোগ-সূত্রের অভাব থাকিবে, দাম্পত্য-জীবন সেই পরিমাণে অসুখী ও তিক্ত হইবে।

দাম্পত্য-জীবনে সুখ

দাম্পত্য-জীবন সুখী হইতে হইলে সর্ব্ব-প্রধান প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সামঞ্জস্য। দৈহিক সামঞ্জস্য অর্থ উভয়ের যৌন-অঙ্গের পারস্পরিক উপযোগিতা। মানুষের আকৃতি-ভেদের ন্যায় তাহাদের জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি-ভেদ হওয়া স্বাভাবিক। যে সমস্ত পুরুষের জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত দীর্ঘ তাহাদের সঙ্গে, যে সমস্ত নারীর যোনি-নালী হ্রস্ব, তাহাদের যৌন-মিলন সুখের হইতে পারে না। আবার হ্রস্ব-জননেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পুরুষের সহিত দীর্ঘ যোনি-নালী-বিশিষ্টা নারীর যৌন-মিলন সুখের হইতে পারে না, এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি।

দৈহিক সামঞ্জস্য

জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি ব্যতিরেকে অন্যান্য দিক হইতেও পারস্পরিক যৌন-উপযোগিতা বিচার করা প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে কিম্বা কাহারও মধ্যে জননেন্দ্রিয়-ঘটিত ত্রুটী ও পীড়া থাকিতে পারে। এই ত্রুটী বা পীড়া দম্পতির নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিবাহ-জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

যৌন-উপযোগিতা

দাম্পত্য-জীবনের সুখের জন্য আমরা দম্পতির জননেন্দ্রিয়ের উপর এত অধিক জোর দিতেছি দেখিয়া কেহ-কেহ হয়ত মনে করিতেছেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধকে নিছক দৈহিক সম্পর্করূপে দর্শন করিতেছি। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা খুব ভাল করিয়াই জানি যে, স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ শুধু নারী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নহে; উহার মধ্যে অনেকখানি আত্মিক-সম্পর্কও আছে। শুধু তাহা নহে। আমরা বিবাহকে মানুষের পারমার্থিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতম পন্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং এই সাধনা-পথের সকল প্রকার ত্রুটী ও বিঘ্ন সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়ার আমরা পক্ষপাতী। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের দৈহিক দিকটা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। যৌন-সম্পর্ক-লেশহীন দম্পতি যে এ জগতে নাই বা ছিল না, সেকথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু উহা মানব-জীবনের সাধারণ চরিত্র নহে—উহা বিকল্প। মানব-জীবনের দম্পতি-চরিত্রের সাধারণ কথা এই যে, বিবাহ-সম্পর্ক প্রধানতঃ যৌন-সম্পর্ক। যৌন-সম্পর্ক রূপে দাম্পত্য-জীবন সফল হইলে দম্পতি-জীবনের মহীরুহ মানব-জীবনের বৈষয়িক ও পারমার্থিক কল্যাণের ফুলে-ফলে মঞ্জুরিত হইয়া উঠে। সুতরাং যৌন-সম্পর্করূপে দাম্পত্য-জীবনের সাফল্যের উপরই অন্যান্য সকল দিককার সাফল্য নির্ভর

করিতেছে। কথাটা নিতান্ত দার্শনিক বাক্যের মত শুনা না গেলেও ইহা পরম সত্য কথা এবং এই সত্য কথাটা গোপন করিয়া বাহ্যিক ঠাট বজায় রাখিতে গিয়াই আমরা বহু অমঙ্গল ও অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহ একটা সাধনা। এই সাধনার উপর মানব-জীবনের সকল দিককার কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। দম্পতির পারস্পরিক যৌন-উপযোগিতা এই সাধনার ভিত্তিভূমি। দম্পতির দৈহিক উপযোগিতার অভাব হইলে প্রাথমিক সরঞ্জামের অভাবে সে-সাধনা গোড়াতেই ব্যাহত হয়, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। নারী-পুরুষের প্রথম চেষ্টা এইভাবে ব্যাহত হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা উপযোগিতার সন্ধানে অন্যত্র চেষ্টা করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু উপযোগী সহকারী নির্ব্বাচনেই যদি মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণার সর্ব্বাপেক্ষা মাহেন্দ্র-ক্ষণ যে যৌবন, তাহা অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে সে নর-নারীর জীবন অনেক-খানি ব্যর্থ হইয়া গেল মনে করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম নির্ব্বাচনই যাহাতে সর্ব্ব-প্রকারে নির্ভুল ও সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয় হয়, আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত এবং এ কার্য্যে যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন আছে, তাহা সংস্কার-গতই হউক আর আইন-গতই হউক, দূর করা উচিত।

যৌন-জ্ঞান

ডাঃ ফোরেল, ডাঃ মিচেল্‌স্‌, ডাঃ মার্শাল, মিঃ হ্যাভলক এলিস এবং অন্যান্য বহু যৌন-বৈজ্ঞানিকের মত এই যে, বিবাহের পূর্ব্বেই নারী-পুরুষ উভয়ের যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পূরাপূরি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কোনও দুইটি যুবক-যুবতীর বিবাহের কথা-বার্ত্তা হইলেই, বিবাহ সাব্যস্ত ও বিবাহের কথা জন-সাধারণ্যে

প্রচার হইবার পূর্ব্বেই, উভয়ের ডাক্তারী পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এই পরীক্ষায় যদি বর-কন্যা উভয়ে উভয়ের উপযোগী বলিয়া চিকিৎসক দ্বারা ঘোষিত হয়, তবেই প্রস্তাবিত বিবাহ হইতে পারে, অন্যথায় নহে। ডাঃ ফোরেল ও হ্যাভলক এলিস আরও এক পদ অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের মত এই যে, ডাক্তারী পরীক্ষার পরও বর-কন্যার নিজেদের মধ্যে এ-বিষয়ে ভাব-বিনিময় হওয়া প্রয়োজন। শরীর-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা ও যৌন-বিজ্ঞানে শিক্ষা-প্রাপ্ত দুইটি যুবক-যুবতী অতি সহজেই নিজেদের পারস্পরিক উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে এবং উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, সে সম্বন্ধে নির্ভর-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে। ইঁহাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, যৌন-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত দুইটি যুবক-যুবতীকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বৈবাহিক জীবনের উপযোগিতা বিচারের জন্য একত্রে মিশিতে দিলে তাহাদের যৌন-পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহারা সাময়িক কাম-বাসনায় পরস্পরে উপগত হইয়া গর্ভোৎপাদন করিয়া ফেলিবে, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বরঞ্চ যৌন-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বাহ্যতঃ লজ্জাশীল যুবক-যুবতীকে একত্রে ছাড়িয়া দিলে যেটুকু বিপদের সম্ভাবনা আছে, উপরোক্ত অবস্থায় তাহার সহস্রাংশের একাংশ বিপদেরও সম্ভাবনা নাই।

বর-কন্যার পারস্পরিক দৈহিক উপযোগিতা পরিমাপ করিবার জন্য তাহাদিগকে মিশিতে দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে মত-ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিবাহের যে দ্বিতীয় দিক বর-কন্যার মানসিক সামঞ্জস্য, তাহা পরিমাপ করিবার জন্য বর-কন্যাকে মিশিতে দিবার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মানসিক সামঞ্জস্য

রতি-ক্রিয়া-গত রুচি ও ক্ষমতা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন-যাত্রার উপকরণ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে অভিরুচি, সন্তানের জন্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে আদর্শ, ধর্ম্ম, নীতি ও রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধীয় মতামত, অর্থ-নৈতিক অবস্থা-গত বিচার বিবেচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে ভাবের ঐক্য না হউক অন্ততঃ সামঞ্জস্য না থাকিলে কোনও দাম্পত্য-জীবন সুখের হইতে পারে না। অথচ সুশিক্ষিত দুইটি তরুণ-তরুণী অতি সহজেই এই সমস্ত ব্যাপারে পরস্পরের অভিমত ও অভিরুচি অধ্যয়ন করিতে পারে। এমন দুইটি তরুণ-তরুণী থাকিতে পারে, যাহাদের উভয়েই সকল দিক দিয়া অতি চমৎকার; কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে মিল না হইতে পারে। এমন দুইটি সুন্দর প্রাণকে জোর করিয়া একত্রে বাঁধিয়া দিয়া দুই জনেরই জীবন ব্যর্থ করিয়া দেওয়া উচিত নহে।

আমাদের-কথা

সুতরাং যে-বিবাহে স্বামী-স্ত্রী দৈহিক ও মানসিক উভয়তঃ পরস্পরের উপযোগী, যে-বিবাহে রতি-ক্রিয়ায় উভয়ে সমান আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, যে-বিবাহে স্বামীকে বলাৎকারী বা স্ত্রীকে যৌন-অসন্তোষ-জাত পরকীয়া হইতে হয় না, যে-বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও পূরণ করিতে পারে, যে-বিবাহে স্ত্রী স্বামীর অর্থনৈতিক গলগ্রহ নহে, যে-বিবাহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পারমার্থিক ও অন্যান্য আদর্শ সাধনের পরিপন্থী না হইয়া বরঞ্চ সহায়ক হয়, সেই বিবাহকেই আমরা আদর্শ বিবাহ বলিয়া মনে করি এবং সেইরূপ বিবাহের প্রচলন কামনা করি!

ডাঃ ফোরেল ভবিষ্যৎ মানবের আদর্শ বিবাহের যে কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনই সরল। তিনি

ডাঃ ফোরেলের আদর্শ দাম্পত্য-জীবন

লিখিয়াছেন ঃ ভবিষ্যতের মানুষ শৈশব হইতেই যৌন-বিজ্ঞান ও উহার বিভিন্ন দিকের উপকারিতা-অপকারিতা সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইবে। মানুষ মদ্য বা অন্য কোন নেশা খাইবে না। মানুষ কাঞ্চন-কৌলিন্যে বিশ্বাসী থাকিবে না। সহস্র লোকের রক্ত শোষণ করিয়া এক ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের স্তুপ সৃষ্টি করিবে না। সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষের কাম-লালসায় ইন্ধন যোগাইবার জন্য সহস্র পুরুষের প্রাণ ও সহস্র নারীর সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে না। মানুষ বিলাসী থাকিবে না ; শিল্প-কলা ও ললিত-কলা সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বাহুল্য থাকিবে না। স্বাস্থ্য-সম্মত, স্বল্প-ব্যয়-সাপেক্ষ পোষাকে মানুষ তৃপ্ত থাকিবে। আড়ম্বর ও বিলাসিতা যে শিল্প-কলা নহে, একথা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিবে। সুতরাং মানুষের আবাস-বাটী আড়ম্বরপূর্ণ ইষ্টক-স্তুপ থাকিবে না, মানুষের বাসোপযোগী কবিত্বময়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শিল্প-কলার নিদর্শন হইবে। মানুষ ভণ্ডামী ভুলিয়া যাইবে। সত্য কথা সত্য করিয়া জোরের সঙ্গে বলিবার অভ্যাস হইবে। যৌন-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী অন্যান্য দশটী বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় নিজেদের যৌন-উপযোগিতা আলোচনা ও বিচার করিবে। তাহারা পয়সার হিসাব করিতে যেমন ভুল করে না, যৌন-ব্যাপারে কিম্বা অংশীদার নির্ব্বাচনেও তেমনই ভুল করিবে না। নারী-পুরুষ উভয়েরই তালাকের অধিকার থাকিবে, কিন্তু তালাকের প্রয়োজন থাকিবে না।

খ্যাতনামা মহিলা চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ বলিয়াছেন ঃ বিবাহ-প্রথাকে যদি আনন্দ, শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ভিত্তি-ভূমি-

রূপে মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই, তবে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে এবং উভয়ের প্রীতিদায়ক-রূপে যৌন-কার্য্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

কোকা পণ্ডিত, ঋষি বাৎস্যায়ন ও পণ্ডিত কল্যাণমল্ল প্রভৃতি ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রবিদ্‌গণও স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সামঞ্জস্যের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন। জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি-ভেদে ভারতীয় পণ্ডিতগণ পুরুষকে শশক, বৃষ ও অশ্ব এবং নারীকে হরিণী, অশ্বিনী ও হস্তিনী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি বিচার করিয়া এই সমস্ত পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হরিণী নারী ও শশক পুরুষে, অশ্বিনী নারী ও বৃষ পুরুষে এবং হস্তিনী নারী ও অশ্ব পুরুষে বিবাহ হইলে যৌন-উপযোগিতার জন্য ইহাদের বিবাহ-জীবন খুব সুখের হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণের এই নারী-পুরুষের বিভাগ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া উহা খুব নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু দৈহিক সামঞ্জস্য যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতেও বাঞ্ছনীয়, ইহা পাঠকগণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে পাঠ করিয়াছেন।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ

ভারতীয় পণ্ডিতগণ রতি-ক্রিয়ার তিনটী দিকের উপযোগিতা বিচার করিয়াছেন : (১) জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য, (২) রতি-বাসনার তীব্রতার মাত্রা-ভেদ, (৩) স্থায়িত্ব। জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। রতি-বাসনার তীব্রতার মাত্রা-ভেদ সম্বন্ধে ভারতীয়

দম্পতির রতি-ক্রিয়ার তিনটী দিক

পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে, পুরুষের কাম-কেন্দ্র একটী, নারীর কাম-কেন্দ্র বহু। কাজেই নারীর কামোত্তেজনা যেমন বিলম্বে জাগ্রত হয়, তাহার বাসনাও তেমনই বিলম্বে নিবৃত্ত হয়। সুতরাং বাসনার মাত্রা-ভেদের সহিত পুরুষের ধারণা-শক্তির সামঞ্জস্য হইলেই স্বামী-স্ত্রী রতি-ক্রিয়ায় সমান আনন্দ লাভ করিতে পারে। অন্যথায় নারী অতৃপ্ত থাকার দরুণ শ্বেত-প্রদর, হিষ্টিরিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি বহু রোগাক্রান্ত হয়। রতি-বাসনার তীব্রতার মাত্রা-ভেদে নারী জাতি পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারি শ্রেণীতে ও পুরুষকে পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিবাহ-কার্য্যে নারী-পুরুষের রতি-বাসনার তীব্রতাও বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। রতি-উত্তেজনার স্থায়িত্ব-ভেদেও ভারতীয় পণ্ডিতগণ নারী-পুরুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। নারী-পুরুষের মিলন সাধনে ইহাও আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নহে। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিব।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের মত ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণও বিবাহে কন্যার আবশ্যক গুণসমূহেরই আলোচনা করিয়াছেন বেশী।

ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে স্ত্রীর গুণসমূহ

পুরুষের দোষ-গুণ সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহারা করেন নাই করিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। কারণ পুরুষই নারী নির্ব্বাচন করিত, স্ত্রীর পুরুষ নির্ব্বাচন করিবার কোনও সাধারণ নিয়ম ছিল না। উক্ত পণ্ডিতগণের মতে নিম্নলিখিত গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্ব্বাচন করা উচিতঃ (১) সমবংশ-জাত, (২) শিক্ষিত, (৩) সাহসী, (৪) বুদ্ধিমতী, (৫) বিচার-ক্ষমতাশালিনী, (৬) পবিত্র, (৭) কর্ত্তব্য-পরায়ণা, (৮) যশস্বিনী, (৯) ধনবতী, (১০) দৈহিক ত্রুটীশূন্য, (১১) সুন্দরী, (১২) বয়স্কা।

উপরোক্ত গুণ বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণ বংশের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন। বর্ত্তমান সাম্য-ও ভ্রাতৃত্ব-বাদের যুগে অবশ্য প্রাচীন কালের মত বংশ-মর্য্যাদার উপর তেমন জোর দেওয়া উচিতও নহে, সম্ভবও নহে। তবু একথা বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর বংশ-গত পার্থক্য বর্ত্তমান সময়েও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

বরের গুণ বিচার

কন্যার দিক হইতে বরের বিচার করিবার কোনও নিয়ম না থাকিলেও ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে শ্বশুরের দিক হইতে জামাইর গুণ বিচারের কতকগুলি সূত্র আছে। এই বিচার-ফল অধিকাংশ সময় কন্যারই মঙ্গল-দায়ক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বিচারক কন্যা নহে, কন্যার পিতা। তাঁহার বিচারে জামাতা শিক্ষিত, সাহসী, ধনী, গুণবান, যশস্বী, তরুণ, সুন্দর, সদ্বংশ-জাত, মিষ্টভাষী, দানশীল, দয়াবান, প্রফুল্ল, বহু-গোষ্ঠি-সম্পন্ন, দৃঢ়চেতা, সচ্চরিত্র, নীরোগ ও বলবান হওয়া চাই। স্বয়ং কন্যার উপর বিচার-ভার অর্পণ করিলেও বরের এই সমস্ত গুণই সে বিচার করিত। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে পিতার নির্ব্বাচন মেয়ের কল্যাণকরই হইত।

কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে. তাহার যেমন নির্দ্দেশ আছে, কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা যাইবে না, সে সম্বন্ধেও বাৎস্যায়ন ও কল্যাণমল্ল কতকগুলি নিষেধাত্মক নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে (১) সন্ন্যাসিনী, (২) বয়োজ্যেষ্ঠা, (৩) বিক্ষত-যোনি (বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা), (৪) কৃষ্ণাঙ্গী, (৫) উন্মাদিনী, (৬) স্বগোত্র নারী ও (৭) উচ্চ-গোত্রের নারীকে বিবাহ করা উচিত নহে।

ইংরাজীতে যাহাকে Physiognomy এবং Phrenology বলে, ভারতবর্ষে এবং আরবে অতি প্রাচীনকালে তাহার প্রচলন ছিল। দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য দর্শনে চরিত্র নির্ণয় করার শাস্ত্রের নাম physiognomy এবং মস্তকের গঠন-প্রণালী দর্শনে চরিত্র নির্ণয় করিবার শাস্ত্রের নাম Phrenology. পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের আরবী নাম 'এল্‌মে ফেরাসৎ'। আরবে এই বিদ্যার যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত যৌন-শাস্ত্রবিৎই শারীরিক লক্ষণ দৃষ্টে প্রকৃতি নির্ণয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ঋষি নাগার্জ্জুনের 'সিদ্ধ বিনোদন' নামক রতি-শাস্ত্রে প্রধানতঃ স্ত্রী-পুরুষের দেহ-লক্ষণ হইতেই তাহাদের চরিত্র নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের যৌন-বিজ্ঞানের এই দিকটায় যথেষ্ট মিল আছে বলিয়া আমরা 'এল্‌মে ফেরাসতে'র এক ফারসী পুস্তক হইতেই নিম্নলিখিত লক্ষণ-তত্ত্ব উদ্ধৃত করিলাম। ইহা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যদর্শনে চরিত্র নির্ণয়ের প্রাচীন পদ্ধতি

কপাল। যাহার কপাল ছোট সে অল্প-বুদ্ধি। যাহার কপাল নাতি-ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ কুঞ্চিত সে অতিশয় ক্রোধান্ধ হয়। যাহার কপাল বিশাল সে ক্রোধান্ধ ও পাশবিকতা-সম্পন্ন। কপাল কুঞ্চিত হওয়া প্রগল্‌ভতার চিহ্ন।

চক্ষু। ভ্রূ-যুগলে ঘন কেশ চিন্তাধিক্য ও প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক। লম্বা ভ্রূ বাচালতা ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ। চক্ষু বড় হওয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ। চক্ষু প্রশস্ত ও ভাসা-ভাসা অজ্ঞতা ও বাচালতার পরিচায়ক। কোঠরস্থ চক্ষু কামাতুরতার নিদর্শন। চক্ষুর রক্তিমতা সাহসিকতা ও ক্রোধের পরিচায়ক। নীলাভ চক্ষু নীচ প্রকৃতির নিদর্শন। চক্ষুর তারার

চতুষ্পার্শবর্ত্তী চক্র ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার লক্ষণ। চক্ষু-তারকার হরিদ্রাভা নর-হন্তার লক্ষণ। উজ্জ্বল চক্ষু রতি-বাসনার আতিশয্যের পরিচায়ক।

নাক। নাসিকার অগ্রভাগ সরু হওয়া ক্ষিপ্রতা ও কলহ-প্রিয়তার লক্ষণ। নাসিকার অগ্রভাগ মোটা ও মাংসল হওয়া অল্প-বুদ্ধির পরিচায়ক। নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হওয়া সাহসিকতা ও ক্রোধান্ধতার পরিচায়ক।

মুখ। মুখ-গহ্বরের প্রশস্ততা লোভের পরিচায়ক। অধরোষ্ঠের স্থূলতা অল্প-বুদ্ধির পরিচায়ক। অধরোষ্ঠের সরুতা অসুস্থতা ও চপল-মতিত্বের পরিচায়ক। সরু দাঁত দুর্ব্বলতার লক্ষণ। পরস্পর হইতে পৃথক দাঁত আলস্যের পরিচায়ক। মুখ-মণ্ডলের স্থূলতা দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতার চিহ্ন। মুখ-মণ্ডলের মাংসহীনতা দুশ্চিন্তার নিদর্শন। মুখ-মণ্ডলের বৃহত্ত্ব দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক, ক্ষুদ্রত্ব নীচ প্রকৃতি-জ্ঞাপক।

কান। বৃহৎ কান দুঃসাহসিকতা ও মূর্খতা-জ্ঞাপক। ক্ষুদ্র কান নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কাঁধ। সবল ও প্রশস্ত স্কন্ধ ক্রোধ-জ্ঞাপক। অপ্রশস্ত স্কন্ধ দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক। ক্ষুদ্র স্কন্ধ কৌশল ও চতুরতা-জ্ঞাপক।

হাত। দীর্ঘ হস্ত মহত্ত্ব ও দানশীলতার নিদর্শন। খর্ব্ব হস্ত কলহ-প্রিয়তার পরিচায়ক। হস্ত-পৃষ্ঠের কোমলতা বুদ্ধি ও মেধার চিহ্ন। হস্ত-তালুর অপ্রশস্ততা অল্প-বুদ্ধির পরিচায়ক।

পা। পায়ের পাতা বৃহৎ, লম্বা এবং মাংস-পূর্ণ হইলে উহা অল্প-বুদ্ধির পরিচায়ক। পা ছোট হওয়া মহত্ত্বের লক্ষণ। গোড়ালির সরুতা কলহ-প্রিয়তা ও উরুর স্থূলতা বুদ্ধিহীনতা ও উরুর শিরা-বহুলতা উচ্চ-দয়-জ্ঞাপক।

Physiognomy এবং Phrenology বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এ-বিষয়ে বহু পণ্ডিত গবেষণা করিতেছেন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত গবেষণার ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা শক্ত। কিন্তু আরবীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ ভূয়োদর্শনের দ্বারা ঐ সম্বন্ধে যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উহার ব্যবহারিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই আছে। শুধু ঐতিহাসিক মূল্যের কথাই বা বলি কেন? সূক্ষ্মতর ও নিভু́লতর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দ্বারা এই সমস্ত প্রাচীন মতকে খণ্ডন না করা পর্য্যন্ত উহাদিগকে আগে থাকিতে অবিশ্বাস করিবার ব্যস্ততা প্রদর্শনের কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন :পদ্ধতির নির্ভর-যোগ্যতা

যৌন-বিজ্ঞানে Physiognomy এবং Phrenology র দরকার আমাদের দেশেই বেশী। কারণ আমাদের প্রাচ্য-দেশে বর-কন্যার দৈহিক ও চারিত্রিক সামঞ্জস্য পরীক্ষা করিবার জন্য কোর্টশীপের ব্যবস্থা হইতে অনেক দেরী আছে বলিয়াই বোধ হয়। অথচ বর-কন্যার চরিত্র-গত মোটামুটি জ্ঞান থাকা উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। সেইজন্য দৈহিক লক্ষণ-তত্ত্বের দ্বারা যদি ঐবিষয়ের একটা মধ্য-পন্থা আবিষ্কৃত হয়, তবে তাহা আমাদের অনেক সামাজিক অকল্যাণের মূলোচ্ছেদের কারণ-স্বরূপ হইবে। হইতে পারে এই অসম্পূর্ণ অর্দ্ধ-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত করিব, তাহার সবগুলি সত্য হইবে না; কিন্তু আমরা মোটামুটি যে একটা ধারণা করিতে পারিব, অজ্ঞতার অন্ধকারে তাহার আলোই আমাদিগকে অনেকখানি পথ প্রদর্শন করিবে।

উপরে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-গুণের সামঞ্জস্য ও যৌন-উপযোগিতার যে

প্রমাণ প্রয়োগ করা হইল, সে সম্বন্ধে আধুনিক যৌন-বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ এতদূর একমত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের অধিকাংশেই বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী দম্পতির চরিত্র-গত ও যৌন-উপযোগিতা-সম্পর্কিত পরীক্ষার পক্ষপাতী। এ-সম্বন্ধে যে বিভিন্ন যৌন-বৈজ্ঞানিক ডাক্তারী পরীক্ষার নীতি সমর্থন করিয়াছেন, উপরে তাঁহাদের মত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ পরীক্ষাকে সফল করিবার জন্য পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কোর্টশীপের প্রথা প্রায় সর্ব্বাঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনেক যৌন-বৈজ্ঞানিক কোর্টশীপের সফলতায় সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন।

আসঙ্গ-বিবাহ

সেজন্য অনেকে আসঙ্গ-বিবাহ নামে এক নূতন বিবাহ-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রধানতঃ ডেনভারের বিচারপতি মিঃ লিণ্ডসে-ই এই বিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তক। আজকাল অধ্যাপক বার্টরেণ্ড রাসেল প্রভৃতি খ্যাত-নামা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই বিবাহ-প্রথার সমর্থক হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিবাহ-প্রথা দম্পতির চরিত্র ও যৌন-উপযোগিতা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-মূলক বিবাহ। সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না গেলেও ইহা যে ঐকিক বিবাহ-প্রথাকে সুখী ও আনন্দ-দায়ক করিবার একটী আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কাজেই এ-বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

আসঙ্গ-বিবাহের প্রবক্তাগণ উহার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, পরস্পরের অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া জন্ম-নিরোধের প্রতি-শ্রুতিসহকারে দুইটী নারী-পুরুষ আইন-সঙ্গত উপায়ে অনির্দ্দিষ্টকালের

জন্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার নাম আসঙ্গ-বিবাহ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিবাহ-প্রথায়ঃ (১) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অর্থ-নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করে না; (২) যৌন-মিলনে যাহাতে সন্তান উৎপন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু যৌন-বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করাই এ-বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য সে যৌন-সম্বন্ধে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকিতে হইবে। এই বিবাহের শর্ত্ত এই যে, যদি দম্পতির যৌন-মিলনে সকল প্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে, সন্তান জন্মের সময় হইতেই, উক্ত বিবাহ সাধারণ বিবাহে পরিগণিত হইবে এবং স্বামীকে স্ত্রী ও সন্তানের অর্থ-নৈতিক দায়িত্বগ্রহণ করিতে হইবে। সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলেও উভয়ের সম্মতিক্রমে যে-কোনও সময়ে ঐ বিবাহ সাধারণ বিবাহে পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের সম্মতিব্যতিরেকে কদাচ তাহা হইবে না।

বিশেষ পরীক্ষার পূর্ব্বে এই-প্রথার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা সম্ভব নহে। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তরুণ-তরুণীর মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস সৃষ্টির পক্ষে এবং তাহাদের মধ্যে গোপনীয় যৌন-মিলন হ্রাস করিয়া ব্যভিচার দূরীকরণের পক্ষে এই প্রথা অনেকটা কার্য্যকরী হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

বেশ্যা-প্রথা

বিবাহ ও বেশ্যা-প্রথা—বেশ্যা-প্রথার ইতিহাস—ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানরূপে বেশ্যা-প্রথা—ভারতবর্ষে—গ্রীসে—রোমে—মধ্যযুগীয় ইউরোপে—বেশ্যা-প্রথার প্রসার লাভের কারণ—আধুনিক বেশ্যার সংজ্ঞা—বেশ্যা-মনোবৃত্তি—ডাঃ ফোরেলের অভিমত—বেশ্যার শ্রেণী বিভাগ—বেশ্যা-প্রথার উপকারিতা—অপকারিতা—যৌন-ব্যাধি ও মদ্যপান—ঔপসর্গিক মেহ—উপদংশ—মদ্য পানের অপকারিতা—বেশ্যা ও বন্ধ্যাত্ব—পুরুষ বেশ্যা—বেশ্যা-প্রথা উচ্ছেদে লীগ-অব-নেশনস্—বেশ্যা-প্রথার নিয়ন্ত্রণ।

বিবাহ ও বেশ্যা-প্রথা

সমাজ গঠনের গোড়া-পত্তন হইবার সময় হইতেই মানুষ তাহার যৌন-সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহ-প্রথাই তাহার প্রধান নিদর্শন। মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাসমতে এই প্রথাকে সুষ্ঠু করিবার চেষ্টারও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু বিবাহ সকল ক্ষেত্রে সুখী হয় নাই। সর্ব্বত্রই যে ইহা মানুষের কল্যাণ করিয়াছে, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। ইহার প্রমাণ বেশ্যা-বৃত্তি। বেশ্যা-বৃত্তির যতগুলি কারণই থাকুক না কেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অসুখী বিবাহই ইহার প্রধান কারণ এবং দাম্পত্য-অপ্রীতিই এই কুপ্রথার ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে। পুরুষের বিবাহেতর যৌন-সম্ভোগ-বাসনাই এই প্রথার উৎস। বিধবা, ধর্ষিতা, সমাজ-পরিত্যক্তা নারী প্রধানতঃ এই ব্যবসা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। নারী-পুরুষ উভয়ের দিক হইতে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, দাম্পত্য-নিরানন্দতাই বেশ্যা-প্রথার একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ বটে।

বেশ্যা-প্রথার সামাজিক আবশ্যকতাও অনেকে খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করিয়া থাকেন। আবশ্যকতা থাকুক বা না থাকুক, উহার অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই প্রথা যে আমাদের সমাজ-জীবনের একটা জটীল সমস্যা, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আমরা এই প্রথার জন্ম, প্রসার, কারণ, প্রকৃতি ও প্রতীকারোপায় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

বেশ্যা-বৃত্তি একটা অতি পুরাতন অনুষ্ঠান। কিন্তু সভ্যতার চেয়ে বেশী পুরাতন নহে। অর্থাৎ বেশ্যা-বৃত্তি সভ্যতারই ফল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে

বেশ্যা-প্রথার ইতিহাস

মানুষ যেদিন দীক্ষা লইয়াছে, সেইদিন হইতেই মানব-সমাজের এক কোণে বেশ্যা তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বেশ্যা-প্রথার সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ এইখানে যে, সভ্যতার জন্মের পূর্ব্বে যতদিন আদিম মানুষের মধ্যে কোনও-না-কোনও প্রকারে যৌন-স্বাধীনতা খুব প্রবল ছিল, কোথাও যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের আকারে, কোথাও বা বহু-বিবাহ ও উপপত্নীত্বের আকারে তদানীন্তন গোষ্ঠি, দল বা সমাজ পুরুষের যৌন-স্বেচ্ছাচারিতাকে মানিয়া লইত, ততদিন বেশ্যা-প্রথা ছিল না; কারণ বেশ্যা-প্রথার কোনও আবশ্যকতাই ছিল না। কিন্তু বিবাহ-প্রথার দ্বারা, বিশেষ করিয়া এক-পত্নীত্ব দ্বারা, যেদিন হইতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ম ও আইনের দ্বারা মানুষের যৌন-স্বাধীনতাকে অনেকটা খর্ব্ব করিয়া আনিল, সেইদিন বেশ্যা-প্রথা জন্মলাভ করিল।

বাবিলন, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সভ্য দেশে বেশ্যা-প্রথার প্রচলন ছিল।

বাবিলনে বেশ্যা-বৃত্তিকে পুণ্য কার্য্য মনে করা হইত। সেজন্য প্রত্যেক গৃহী নারীকেও জীবনে অন্ততঃ একবার বেশ্যা-বৃত্তি করিতে হইত।

বাবিলনে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানরূপে বেশ্যা-প্রথা

হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, মাইলিটা (বাবিলনী-দের রতি দেবী) দেবীর মন্দিরে সমস্ত নারীকেই জীবনে অন্ততঃ একবার যাইতে হইত। সেখানে তাহারা মন্দির-প্রাঙ্গণে সারি করিয়া বসিয়া থাকিত। মন্দির-প্রাঙ্গণে পুরুষের বিষম জনতা হইত। সেই জনতা হইতে পুরুষেরা অগ্রসর হইয়া নিজ-নিজ পসন্দ-গত নারীর কোলে রৌপ্য-মুদ্রা নিক্ষেপ করিত এবং বলিত, "তোমার উপর মাইলিটার অনুগ্রহ বর্ষিত হউক।" এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে উক্ত নারীকে রৌপ্য-মুদ্রা নিক্ষেপ-কারী পুরুষের হাত ধরিয়া নির্জ্জন স্থানে গিয়া রতি-ক্রিয়া করিতে হইত। এই ব্যাপারকে বাবিলনীরা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান মনে করিত বলিয়া পুরুষের রূপ বা মুদ্রার পরিমাণ বিচার করিবার কোনও অধিকার নারীর ছিল না। সর্ব্ব-প্রথম মুদ্রা-নিক্ষেপকারীর সঙ্গে যাইতে সে বাধ্য থাকিত। সুন্দরী রমণীরা অতি সহজেই মুক্তি পাইত; কিন্তু অসুন্দরীগণকে মুদ্রা-নিক্ষেপকারীর অপেক্ষায় অনেক সময় সপ্তাহ, মাস, এমন কি দু'চার বৎসর বসিয়া থাকিতে হইত। কারণ কোনও পুরুষের সহিত রতি-ক্রিয়া না করিয়া গৃহে ফিরিবার নিয়ম ছিল না।

ভারতবর্ষে

ভারতবর্ষেও বেশ্যার স্থান বিশেষ নগণ্য ছিল না। স্বর্গেও বেশ্যা আছে, সুতরাং পৃথিবীতে বেশ্যা থাকা আবশ্যক বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিত। বড় বড় তীর্থ-স্থানের দেব-মন্দিরসমূহে যে সমস্ত দেব-দাসী থাকিত,

উহাদিগকে দিয়া বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া মন্দিরের পুরোহিতেরা অর্থোপার্জ্জন করিত।

এথেন্সবাসী সলোনই সমগ্র গ্রীসের আইন-প্রণেতা। তিনি স্বয়ং আইন করিয়াছিলেন যে, সমস্ত বেশ্যালয় রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে

গ্রীসে

এবং লভ্যাংশ এফ্রোডাইট (গ্রীকদের রতিদেবী) দেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সলোনের সময় গ্রীক রমণীরা স্বেচ্ছায় বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিত না। বিজিত-সম্প্রদায় সমূহের নারীগণকেই জোর করিয়া সরকারী বেশ্যালয়ে রাখা হইত। অভিজাত-ভোগ্যা উচ্চ শ্রেণীর সুন্দরী দু'একজন ব্যতীত আর সকলের জীবন বড়ই দুর্ব্বিষহ ছিল। উহাদের দেহ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ছিল বলিয়া এবং পুলিশ কর্ম্মচারী উহাদের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিত বলিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অসুখ-বিসুখ বিন্দুমাত্র বিবেচিত হইত না। পথিকগণকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য উহাদিগকে বেশ্যালয়ের দ্বারদেশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াইয়া বিশ্রী অঙ্গ-ভঙ্গি করিতে হইত। তথাপি খরিদ্দার না জুটিলে পথিকগণকে ভুলাইবার জন্য পথি-পার্শ্বে রতি-ক্রিয়া করিতে হইত।

রোমের বেশ্যাগণেরও অধিকাংশই ছিল বিজিত জাতি-সমূহের নারী জাতি। রোমীয় বেশ্যালয়ে তদানীন্তন সমস্ত জাতির নারী দৃষ্ট হইত।

রোমে

রোমক সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময় নারী-পুরুষের একত্রে উলঙ্গ স্নান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে ইটালীর সমস্ত হাম্মামগুলি বেশ্যালয়ে পরিণত হয়। সমগ্র ইটালীতে এত বেশী বেশ্যা-বৃত্তির প্রচলন ছিল যে, রোমের সমস্ত সার্কাস, থিয়েটার,

মেলা ও তীর্থস্থান বেশ্যায় পূর্ণ ছিল। ঐ সমস্ত বেশ্যাকে স্বাধীনভাবে রাস্তার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া নানা কৌশলে শিকার ধরিতে দেখা যাইত। দেশের ইতর-ভদ্র সমস্ত লোক বেশ্যালয়কেই একমাত্র প্রমোদ-ক্ষেত্র মনে করিত এবং নিজ-নিজ আয়ের বিপুল অংশ বেশ্যালয়ে ব্যয় করিত। ফলে বস্তুতঃই বেশ্যালয়-সমূহের আমোদ-প্রমোদ ও সুখ-সুবিধা দর্শনে বহু বিবাহিত বড় ঘরের স্ত্রীও গোপনে বেশ্যা-বৃত্তি পরিচালন করিত। বড় বড় সম্রাটের স্ত্রীরাও নির্জ্জন স্থানে বাড়ী ভাড়া করিয়া সম্রাটের অজ্ঞাতে বেশ্যা-বৃত্তি করিত। সম্রাট ক্লডিয়াসের মহিষী মেসেলিনা বেশ্যা-বৃত্তি করিবার অপরাধে সম্রাটের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে

মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেশ্যা-প্রথার খুব জোর প্রচলন ছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সমস্ত দেশে বেশ্যালয়-সমূহ শিল্প-কেন্দ্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। সৈন্যদলের উপভোগের জন্যও একদল ভ্রাম্যমান্ বেশ্যা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রুসেডের সময় এই প্রথা জন্মলাভ করে এবং ক্রুসেড শেষ হইয়া যাইবার পরও বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে।

প্রাচীনকালে বেশ্যা-প্রথার প্রসার লাভের কারণ

প্রাচীনকালে বেশ্যা-প্রথার প্রসার লাভের প্রধান কারণ এই ছিল যে, বিবাহিতা স্ত্রীকে পুরুষেরা প্রমোদ-সঙ্গিনী মনে করিত না। সন্তান উৎপাদনের জন্য নিতান্ত যন্ত্র-চালিতবৎ স্ত্রী-সঙ্গম করা ছাড়া পুরুষ স্ত্রীর সহিত অধিক কিছু করিত না। অধিকন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান-পালন ও গৃহ-কর্ম্ম-সম্পাদনই প্রধান এমন কি একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া

বিবেচিত হইত। এই দুইটী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া প্রথমতঃ তাহাকে নোংরা ও অপরিষ্কার থাকিতে হইত, দ্বিতীয়তঃ প্রমোদ করিবার তাহার অবসর ছিল না। সেইজন্য প্রাচীন-কালে—শুধু প্রাচীন-কালেই বা বলি কেন, আমাদের দেশে, আজিও—বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে বিলাসিতা ও স্বামীর সহিত প্রকাশ্য-ভাবে মেলা-মেশা করা প্রাচীনাদের দ্বারা বেহায়া-পনা বা 'ছিনালী' বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং স্বভাবতঃই বিবাহিতা স্ত্রী ছিল কর্ত্তব্য-সঙ্গিনী ও বেশ্যা ছিল প্রমোদ-সঙ্গিনী। সেইজন্য প্রাচীন সভ্য-দেশসমূহে নৃত্য, গীত, ললিত-কলা, চিত্র-বিদ্যা, এমন কি বিদ্যা-চর্চ্চা পর্য্যন্ত বেশ্যাদের একচেটিয়া ছিল—বিবাহিতা নারীরা কখনও বিদ্যা-চর্চ্চা করিত না; কারণ গৃহিণী-পনায় ঐ সমস্ত বিদ্যার কোনও প্রয়োজন নাই।

উপরে বেশ্যা-প্রথার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন কালের ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের বেশ্যা-প্রথার প্রকার-গত কোনও পার্থক্য নাই।

আধুনিক বেশ্যাবৃত্তি—বেশ্যা কাহাকে বলে?

ডাঃ আইউয়ান ব্লক (Iwan Bloch) বেশ্যা-বৃত্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ বা নারী অর্থের বিনিময়ে বিনা-নির্ব্বাচনে একাধিক লোককে যৌন-উদ্দেশ্যে দেহ দান করিয়া থাকে, তাহাকে বেশ্যা কহে। প্রাচীন-কালে যাহা ছিল, এখনও বেশ্যা-বৃত্তি মোটামুটি তাহাই আছে—এখনও অর্থের বিনিময়ে দেহ-দান করাকেই বেশ্যা-বৃত্তি কহে।

বেশ্যা-প্রথার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বহু বিশেষজ্ঞ বেশ্যা-মনোবৃত্তি অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমেরিকার ডাঃ উইলিয়াম

বেশ্যা-মনোবৃত্তি

সেঞ্জার দুই হাজার বেশ্যাকে তাহাদের বেশ্যা-বৃত্তি গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই দুই হাজারের মধ্যে ৫২৩ জন যৌন-বাসনার তীব্রতা, ৫১৫ জন দারিদ্র্য, ২৫৮ জন পুরুষের প্রতারণা, ১৮১ জন মদ্যপান, ১৬৪ জন স্বামী ও পিতামাতার অত্যাচার, ১২২ জন বিনাশ্রমে সুখের লালসা, ৮৪ জন কুসংসর্গ, ৭১ জন বৃদ্ধ বেশ্যার প্ররোচনা, ২৯ জন আলস্য, ২৭ জন ধর্ষণ, ১৬ জন বিদেশ-গামী জাহাজের প্রলোভনকে নিজেদের বেশ্যা-জীবনের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রায় একচতুর্থাংশ স্থলেই নারী যৌন-বাসনার অতৃপ্তি হইতে বেশ্যা-বৃত্তি গ্রহণ করে।

ডাঃ ফোরেলের সহিত ডাঃ সেঞ্জারের গবেষণার ফলের অনেকটা মিল দৃষ্ট হয়। ডাঃ ফোরেলও বলিয়াছেন যে, বেশ্যা-মনোবৃত্তি একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি। এই বেশ্যা-বৃত্তি হইতেই নারীজাতির রহস্যময়ীত্ব প্রমাণিত হয়। নারীজাতি স্বভাবতঃ সংযমী, লজ্জাশীলা, বিনয়ী ও শিষ্টাচার-সম্পন্না। কিন্তু বেশ্যাদের নির্লজ্জতা, অসংযম, যৌন-বীভৎসতা নারী-জাতির সাধারণ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা যৌন-ব্যাপারে পরম লজ্জাশীলা নারী কিরূপ যৌন-বীভৎসতা আয়ত্ত করিতে পারে, বেশ্যারা তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বেশ্যাদের আচরণ দর্শনে এই জন্যই অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, নারী-জাতির যৌন-লজ্জা একটা ভণ্ডামী মাত্র। উহার মধ্যে যদি লেশমাত্র আন্তরিকতা থাকিত, তবে নারী বেশ্যা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই অমন নারী-চরিত্র-বিরোধী নির্লজ্জতা আয়ত্ত করিতে পারিত না। কিন্তু উক্ত পণ্ডিতগণ নারীর প্রতি সুবিচার করেন নাই। তাঁহারা নারী-

ডাঃ ফোরেলের অভিমত

চরিত্রের একটা বিরাট দিকের প্রতি দৃকপাত করেন নাই। সে দিকটী এই যে, যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলার ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশী। খাপ-খাওয়াইয়া চলিবার এই অসাধারণ ক্ষমতা-বলেই নারী বেশ্যালয়ের বীভৎসতা অত সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। নারীর এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য তাহার গার্হস্থ্য-জীবনের চরিত্রে কটাক্ষ করা উচিত হইবে না।

যাহা হউক, দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তি ও অসন্তোষের জন্যই যে বহু নারী বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করে, ইহা একরূপ অকাট্য সত্য। আমাদের দেশে অকাল-বৈধব্য, বাল-বিধবাদের উপর বল-প্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য, বৃদ্ধের তরুণী বিবাহ প্রভৃতি কারণই বেশ্যালয়ের উপকরণে যোগান দিতেছে।

* * * * * *

* * * * *

* * * *
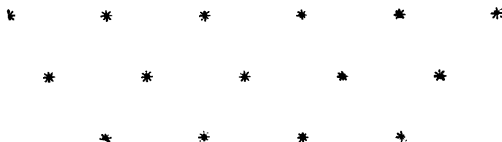
বেশ্যা মোটা-মুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বেশ্যা আছে, ইহারা স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা নৃত্য-গীতে পটু।

বেশ্যার শ্রেণী-বিভাগ

সেজন্য থিয়েটার-বায়স্কোপের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে। এজন্য তাহারা রাজা-জমিদার প্রভৃতি বড় লোকের বিলাস-দরবারে নিমন্ত্রণও পায়। ঐ সমস্ত উপায়ে ইহারা স্বাধীন-ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া থাকে এবং অধিকন্তু বেশ্যা-বৃত্তিও করিয়া থাকে। ইহারা নিজেরা স্বাধীন বলিয়া যৌন-ব্যাপারে নারীত্বের উপর বেশী মাত্রায় অত্যাচার হইতে দেয় না। ইহারা স্বাধীন শ্রেণীর বেশ্যা। ইহাদের মজুরীও খুব বেশী। আর এক শ্রেণীর বেশ্যা আছে, তাহারা দলবদ্ধভাবে একজন 'বাড়ী-ওয়ালীর' অধীনে বাস করে। 'বাড়ী-ওয়ালী' একজন ধূর্ত্ত-শিরোমণি অবসর-প্রাপ্ত বেশ্যা মাত্র। এই অবসর-প্রাপ্ত অভিজ্ঞ বেশ্যার কঠোর শাসনাধীনে সাধারণ বেশ্যারা বন্দিনী ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের উপার্জ্জন 'বাড়ী-ওয়ালীর' হাতে যায়। 'বাড়ী-ওয়ালী' ইহাদের খোরাক-পোষাকের ব্যয়-ভার বহন করে। ইহারা অসুখ-বিসুখের জন্য খরিদ্দার 'বসাইতে' না পারিলে 'বাড়ী-ওয়ালীর' নিকট তাহাদিগকে বিশেষ তিরস্কার এবং শাসন ভোগ করিতে হয়। নিজেদের সুখ-সুবিধা বিচার করিবার অধিকার এই সমস্ত হতভাগিনীদের নাই। খরিদ্দারের ভিড় হইলে প্রতি রাত্রে এক-একজনকে বিশ-ত্রিশ জন পর্য্যন্ত পুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী হইতে হয়। ডাঃ ফোরেল এই শ্রেণীর হতভাগিনীদের দুরদৃষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে-সমস্ত দেশে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত দেশে যুদ্ধ ঘোষণার দিন বেশ্যালয়ে অত্যন্ত ভিড় হয়। কারণ যুবকগণ যুদ্ধে যাওয়ার

প্রাক্কালে একবার শেষ-বারের মত রতি-সুখ উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য ঐ সমস্ত দেশে ঐ সময় বেশ্যালয়ে এত ভিড় হয় যে, একজনকে একরূপ টানিয়া উঠাইয়া দিয়া আর একজনকে শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। বড় বড় শহরে সরকারী পায়খানায় ভিড় করিতে যেমন 'প্রকৃতির নিমন্ত্রিত' ব্যক্তিগণ বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করিবার অবসর পায় না, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়া থাকে।

বেশ্যাবৃত্তির 'উপকারিতা'

বেশ্যা-বৃত্তির প্রতি আমাদের যতই ঘৃণা থাকুক না কেন, আমাদের ইহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বহু সমাজ-বৈজ্ঞানিক বেশ্যা-প্রথার আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ-জীবনের একটা আবশ্যক অঙ্গরূপেই বেশ্যা-প্রথা প্রসার লাভ করিয়াছে। বেশ্যা-প্রথার সমর্থনকারী সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত এই যে, যে সামাজিক আবশ্যকতা হইতে বেশ্যা-বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, সেই আবশ্যকতার জন্যই বেশ্যা-প্রথা প্রচলিত থাকা উচিত। সমাজ-বৈজ্ঞানিক লেকী তদীয় "হিষ্ট্রী অব ইউরোপীয়ান মরালস্" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, বেশ্যা-প্রথা আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পবিত্রতার 'সেফ্‌টী ভাল্‌ব্'। ফ্রয়েড ও এলিসও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বেশ্যা-বৃত্তিকে নিন্দা করিয়াও বলিয়াছেন যে, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যতদিন যৌন-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তন না করা হইবে, ততদিন বেশ্যা-বৃত্তি রাখিতেই হইবে।

বেশ্যা-বৃত্তির পক্ষে এই সমস্ত মনীষিগণের প্রধান যুক্তি সাধারণতঃ এই যে, বর্ত্তমান বৈশ্য-সভ্যতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে পুরুষকে

সাধারণতঃ, স্ত্রী ছাড়িয়া বহুদিন বিদেশে বাস করিতে হয়। শিল্প-কেন্দ্রে কল-সমূহের শ্রমিকগণকে সাধারণতঃ স্ত্রী-হীন-ভাবে সমস্ত জীবন বা জীবনের বহুলাংশ ব্যয় করিতে হয়। বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাষ্ট্রসমূহের অগণিত সৈন্যগণকে সাধারণতঃ বিবাহিত স্ত্রীর সংসর্গ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহা ছাড়াও বিবাহিত স্ত্রীর বিষয়-ব্যস্ত জীবনে অনেক পুরুষই রতি-তৃপ্তি লাভে বঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত লোকের জন্য বিবাহেতর নারী-সম্ভোগের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনকে পবিত্র ও সুখ-দায়ক রাখিতে হইলে এই সমস্ত রতি-সন্ধানী লোককে কিছুতেই অন্যের দাম্পত্য-জীবনে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক, বহুদিন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে থাকিবার, কিম্বা সাগর-ভ্রমণ করিবার পর একদল সৈন্য এক নগরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিল। এই নগরে যদি যথেষ্ট-সংখ্যক বেশ্যা থাকে, তবে সৈন্যগণ উহাদের দ্বারাই নিজেদের রতি-বাসনা পূরণ করিতে পারে। আর যদি না থাকে, তবে, অনেকে আশঙ্কা করেন যে, ঐ সমস্ত সৈন্য ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর ন্যায় নগর-বাসীর পুর-মহিলাগণকে রাস্তায় আক্রমণ করিবে। তাহা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। বিবাহিত স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই সমস্ত লোকের অভাব মিটাইবার জন্যই বেশ্যা-প্রথার উদ্ভব। ইহাতে বিশেষ সুবিধা এই যে, পুরুষের প্রয়োজন-মত যখন-তখন নারী পাওয়া যায়, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর খরিদ্দারের উপযোগী নারীর ব্যবস্থা আছে, এবং এই সাময়িক নারী-সম্ভোগের বিলাসের জন্য পুরুষকে স্ত্রী বা সন্তান

প্রতিপালনের নৈতিক, অর্থনৈতিক বা আইন-ঘটিত কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না। যদি বেশ্যা-প্রথার প্রচলন না থাকিত, তবে ঐ সমস্ত রতি-সুখ-সন্ধানী লোকেরা পারিবারিক ক্ষেত্রে আক্রমণ চালাইয়া প্রলোভনে বা বল-প্রয়োগে গৃহস্থগণের স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়া দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনে নানা অশান্তির সৃষ্টি করিত।

উপরোল্লিখিত যুক্তিসমূহের সারবত্তা বহুলাংশে স্বীকার করিতে হইলেও আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে, বেশ্যা-প্রথার দ্বারা মানবের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশী হইয়াছে কি না। বেশ্যা-প্রথার ফলে বহু তরুণ যুবকের ভবিষ্যৎ নষ্ট ও বহু পুরুষের দাম্পত্য-জীবন শোচনীয় হওয়ার মত ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও আমরা দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পারি না। এই দুইটী বিষয়ের একটী, যৌন-ব্যাধি ও অপরটী মদ্য-পান। যৌন-ব্যাধি ও মদ্য-পানের প্রসারের কেন্দ্র এই বেশ্যালয়। এই দুইটী পাপ মানব-জাতির এমন গুরুতর অকল্যাণ করিতেছে যে, অন্য কোনও কারণ না থাকিলেও কেবলমাত্র এই দুই কারণেই কঠোর হস্তে বেশ্যা-বৃত্তি দমন করা উচিত হইত।

অপকারিতা

যৌন-ব্যাধি ও মদ্য-পান

যৌন-ব্যাধি ও মদ্য-পান ফলতঃ একই ধরণে মানবজাতির গুরুতর অকল্যাণ করিলেও আমরা এখানে পৃথকভাবে উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

যৌন-ব্যাধি প্রধানতঃ দুইটী: ঔপসর্গিক মেহ বা গণোরিয়া ও উপদংশ বা সিফিলিস।

'গণোককাস্' নামীয় এক প্রকার জীবাণু মূত্র-নালীতে প্রবিষ্ট হইয়া মূত্র-নালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করিলেই গণোরিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। দূষিত-যোনি বেশ্যা-সহবাসেই এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, অন্য কোনও কারণে নহে। সহবাসের পর সাতদিনের মধ্যেই এই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমতঃ লিঙ্গের অগ্রভাগে সুড়সুড় করে; লিঙ্গোদ্রেক ও মূত্র-ত্যাগে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ক্রমশঃ লিঙ্গ-নালীর মধ্যে ক্ষত হইয়া পূঁয-রক্ত নির্গত হয় এবং লিঙ্গ স্ফীত ও রক্ত-বর্ণ হইয়া যায়। এই রোগ কিছুদিন স্থায়ী হইলে মূত্র-রোধ হইয়া অশ্মরী ও বৃক্কক-প্রদাহ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি জন্মিতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে জ্বালা-যন্ত্রণা কমিয়া যায়; কিন্তু ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে এবং পুনরাক্রমণ ব্যতিরেকেই উপরোল্লিখিত সমস্ত বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। ইহা অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি। ইহা পুরুষ হইতে নারীতে এবং নারী হইতে পুরুষে অতি সহজে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

ঔপসর্গিক মেহ

পুরুষ অপেক্ষা নারীতে এই ব্যাধি অধিকতর দুশ্চিকিৎস্য। কারণ 'গণোককাস' নামীয় বীজাণু নারীর জননেন্দ্রিয়ে নিরাপদে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে পারে। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের গঠন-প্রণালী এই রোগ-বীজের বাসের অত্যন্ত উপযোগী। ওষ্ঠদ্বয়ের পরতে-পরতে নিরাপদ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া এই মারাত্মক বিষ-বীজ নারীর জরায়ু, ডিম্ববাহী-নল, এমনকি ডিম্বাধার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় সন্তান প্রসব হইলে সন্তানের চক্ষে গণো-বীজ লাগিয়া থাকে। ইহাতে সন্তানের চোখ উঠিয়া থাকে এবং ফলে, হয় সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়, না হয় তাহার দৃষ্টি-শক্তি ক্রটী-পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা ঘন-ঘন গণোরিয়ায় আক্রান্ত হয়, মানবজাতির

সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা প্রজনন-শক্তি হারাইয়া ফেলে। অন্যথায় পৃথিবী গণোরিয়ার রোগীতে ছাইয়া যাইত।

উপদংশ গণোরিয়া অপেক্ষা অধিক মারাত্মক। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উপদংশ রোগও একপ্রকার কীটাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কীটাণু রক্তের ভিতর দিয়া চলা-ফেরা করে। রক্তে উপদংশ-বিষ প্রবেশ করিয়া দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে (মতান্তরে ৩ হইতে ৩৯ দিনের মধ্যেই) লিঙ্গ-মুণ্ডে, সময়-সময় শরীরের অপরাপর অংশে পিড়কা জন্মে এবং এই পিড়কার চারিদিক কঠিন হইয়া উঠে।

উপদংশ

দূষিত-যোনি রমনীর সহিত সহবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পর লিঙ্গ ধৌত না করা অথবা ক্ষার-মিশ্রিত জলে লিঙ্গ ধৌত করা, এই সমস্ত কারণে উপদংশ রোগ জন্মে। এইরূপ দূষিত-পুরুষ সহবাসে স্ত্রীলোকেরও উপদংশ হইতে পারে। উপদংশ অধিকদিন অচিকিৎসিতভাবে থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে পিড়কার উৎপত্তি হইয়া স্থানে স্থানে ক্ষত বা স্ফোটক, নেত্ররোগ, কেশ-ও লোমনাশ, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, পীনস, এমনকি কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ক্ষত-স্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া লিঙ্গ-ক্ষয় পর্য্যন্ত হইতে পারে।

উপদংশ রোগ দুই প্রকার—হার্ড শ্যাঙ্কার ও সফ্‌ট শ্যাঙ্কার। সফ্‌ট শ্যাঙ্কার তিন হইতে পনর দিনের মধ্যে প্রকাশ পায়। ক্ষত লাল হয়, পুঁয-রক্ত পড়ে এবং ক্ষতের ধার শক্ত হয় না। হার্ড শ্যাঙ্কার পনর হইতে উনচল্লিশ দিনের মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহাতে প্রায়ই পুঁয-রক্ত হয় না। কখন-কখন আদৌ ক্ষত না হইয়া একটু স্থান শক্ত ও ফাটা

ফাটা হয় এবং ঐ স্থান হইতে সামান্য রস নির্গত হয়। এই শেষোক্ত প্রকারের উপদংশই সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

উপদংশ রোগের বীজ পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে সংক্রমিত হইতে পারে। এই সংক্রমণের ফলে সন্তান নানাপ্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত ও অঙ্গহীন হইতে পারে। উপদংশ রোগী সাধারণতঃ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ফলতঃ গনোরিয়া ও সিফিলিস প্রত্যহ বৃদ্ধি লাভ করিয়া মানবের গুরুতর ক্ষতি করিতেছে। ডাঃ উইন্‌ফিল্ড স্কট্‌পিউ উপদংশ বিষয়ে একটী প্রবন্ধে ইহার সংক্রমণশীলতার বহু উদাহরণ দিয়াছেন। উপদংশ-বিষ-দুষ্ট মানব-দেহের সহিত যৌন-ক্রিয়া ত দূরের কথা, এমন কি উহার সংস্পর্শও বিপজ্জনক। রোগীর কাপড়-চোপড়, চিরুণী, সাবান বা অন্য কোন জিনিষ ব্যবহারে এই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে।

উপদংশ রোগীর রোগ-মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করা মানবতার দিক দিয়া নিতান্ত গর্হিত। কারণ বিবাহ করিবার পর স্ত্রীর সহিত শারীরিক সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া চলা দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন লোক ভিন্ন সাধারণ স্বামীর পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য। স্ত্রীর শরীরে এই বিষ সংক্রমিত হইলে সে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। ডাঃ পিউ বলিয়াছেন যে উপদংশ-দুষ্ট দম্পতির ভাবী সন্তানের সম্ভাবনা থাকিলেও শতকরা ৮০টী গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়; অবশিষ্ট ২০টীর মধ্যে ১০টী শিশুর শৈশবেই মৃত্যু হয়। এবং বাকী ১০টী বাঁচিয়া গেলেও তাহারা পঙ্গু ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন ধারণ করে।

উপদংশ রোগ পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে বলিয়া এ-দেশে

যে-ধারণা আছে তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। এই রোগের ভয়াবহতা এক সময়ে কলেরা-বসন্ত অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিল না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে ইহার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের অনেকটা সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই রোগের ইতিহাসে নিম্নলিখিত আবিষ্কারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। উপদংশ বীজাণুই এই রোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্ণয়।

২। কতিপয় জন্তুর মধ্যে এই রোগের পাত্রান্তর করার সম্ভাব্যতা।

৩। এই রোগ নির্ণয়ের নির্ভর-যোগ্য পরীক্ষার আবিষ্কার (Wasserman Test)

৪। এই রোগের চিকিৎসায় Salversan (ঔষধ বিশেষ) এর আবিষ্কার।

মদ্য পান

শীত-প্রধান দেশসমূহে মানব-দেহকে শৈত্যাধিক্য হইতে রক্ষা করিয়া মানুষকে কর্ম্ম-প্রেরণা দিবার পক্ষে মদ্যের কিছু প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ঐরূপ উত্তেজক দ্রব্যের কোনও প্রয়োজন নাই। আর শরীর গঠন ও পুষ্টির জন্য সুরার আবশ্যকতা আছে বলিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে না। তথাপি আমাদের দেশে সুরাপান প্রথা হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, বেশ্যা ও তাহাদের মওক্কেলগণ সদা-সর্ব্বদা অতিরিক্ত যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকায় স্বভাবতঃই উহারা যৌন-উত্তেজনা হারাইয়া ফেলে। সেজন্য কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মদ্য পান আবশ্যক। এইজন্য বেশ্যাপল্লীই মদ্য বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র।

সুরাপানের ফলে মানুষ বিচার-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি হারাইয়া ফেলে বলিয়া তাহার যৌন-উত্তেজনা স্বভাবতঃই অর্দ্ধ-বৃত্তিতে পরিণত হয়। মানুষের স্বাভাবিক যৌন-উত্তেজনার মধ্যে প্রেম-প্রীতি, কর্ত্তব্য-বোধ, পিতৃত্ব-বাসনা প্রভৃতি মহান বৃত্তিসমূহ লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু সুরাপানের দ্বারা যে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই উত্তেজনায় ঐ সমস্ত মহৎ বৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সুরা-উত্তেজিত রতি-ক্রিয়ার মধ্যে রতি-ক্রিয়ার স্বাভাবিক লালিত্য, মমতা ও কবিত্ব থাকিতে পারে না! বরঞ্চ মদের উত্তেজনা রতি-ক্রিয়াকে অতিরিক্ত মাত্রায় অশ্লীল ও কদর্য্য করিয়া তুলে। পূর্ব্বে আমরা যে সমস্ত যৌন-বিকল্প ও যৌন-নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সমস্ত বিকল্পের অধিকাংশই সুরার প্রভাব-জাত।

মদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর ক্রিয়া এই যে, অতিরিক্ত মদ্যপানে মানুষের উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং আরও কতিপয় শহরের আদম-শুমারী পর্য্যালোচনা করিয়া ডাঃ ফোরেল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বৎসরের যে-ঋতুতে কার্নিভ্যাল প্রভৃতি উৎসবামোদের জন্য অতিরিক্ত মদ্যপান করা হয়, সেই ঋতুতেই অধিক-সংখ্যক বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের গর্ভাধান হইয়া থাকে। যে সমস্ত দেশে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই জন্য ঐ স্থানে মদ্য প্রস্তুতের ঋতুতেই অধিকাংশ ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের গর্ভাধান হইয়া থাকে।

যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মদ্য পান করা হইয়া থাকিলেও মজা এই যে, মদ্যপানই রতি-শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়া থাকে। কারণ মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দারুণ অবসাদ।

'মদ্যপানে মানুষ বিচার-ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে বলিয়াই যৌন-নিষ্ঠুরতা ও যৌন-বিকল্প হইতে আরম্ভ করিয়া নর-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, আত্মহত্যা, প্রভৃতি বহু অপরাধের মূলীভূত কারণ সুরা। এতদ্ব্যতীত মদ্যপানের ফলে বহু দম্পতি অসুখী, বহু ধনী পথের ভিখারী হইতেছে। মদ্য পানের কুফল পুত্র-পৌত্রাদিতে সংক্রমিত ও হইতে পারে।

ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ব্যবসায়ী বেশ্যাদের প্রায় সকলেই সাধারণতঃ বন্ধ্যা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বেশ্যাদের বন্ধ্যাত্ব যে মানব-সমাজের পক্ষে কতটা কল্যাণকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারণ অধিকাংশ জাতির বেশ্যাদের মধ্যে গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগের যেরূপ প্রসার, তাহাতে বেশ্যা-প্রসূত সন্তানাদির প্রায় সকলকেই যে ঐ সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি-গ্রস্ত হইতে হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে মানব-সমাজের একটা বিরাট অংশ এতদিন ঐ সমস্ত বিশ্রী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িত।

বেশ্যা ও বন্ধ্যাত্ব

বেশ্যাদের বন্ধ্যাত্বের কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর অভিমত এই যে বেশ্যাদের অধিকাংশই গণোরিয়া ও সিফিলিসে আক্রান্ত হইয়া প্রজনন-শক্তি হারাইয়া ফেলে। কারণ বেশ্যার যোনি-মধ্যস্থ গণোরিয়া বা সিফিলিসের বীজ পুরুষের শুক্র-কীট ধ্বংস, অথবা উহাকে উৎপাদিকা-শক্তিহীন, করিয়া ফেলে।

আর এক শ্রেণীর মত এই যে, বেশ্যাগণ ঘন-ঘন বিভিন্ন পুরুষের সহিত রতি-ক্রিয়া করাতে তাহাদের যোনি-মধ্যে বিভিন্ন পুরুষের শুক্র একত্রিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন পুরুষের শুক্র-বীর্য্যের প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু কোনটীরই উৎপাদিকা-শক্তি থাকে না।

উক্ত উভয় কারণ এড়াইয়া যদি বেশ্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াও যায়, তবু তাহার সন্তান-প্রসব হয় না, কারণ বেশ্যার জরায়ু ভ্রূণের জন্য নিরাপদ স্থান নহে। ফলে অল্পদিন মধ্যেই ভ্রূণটি স্বতঃই মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং জরায়ু হইতে স্খলিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে বেশ্যাকে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না।

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ বেশ্যাগণের বন্ধ্যাত্বের পুরাতন যুক্তিবাদ। কারণ উহাদের কোনটাই বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগতের বেশ্যাগণের মধ্যে প্রযোজ্য নহে। প্রতীচ্য জগতের অধিকাংশ দেশের বেশ্যাগণ অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিষ-প্রতিষেধক ঔষধাদির ব্যবহারে সম্পূর্ণ ব্যাধি-মুক্ত হইয়া গিয়াছে। মিঃ এডুইন ফ্রেডারিক বাওয়ার্স বেশ্যাদের বন্ধ্যাত্বের কারণ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বেশ্যারা গৃহস্থ বালিকাগণ অপেক্ষা অনেক কম ব্যাধি-গ্রস্ত। ডাঃ উইলিয়ম রবিনসনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বাস্থ্য-নীতির বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির দ্বারা পরিচ্ছন্নতার ধারণা মানুষের এতটা উন্নত ও সংস্কৃত হইয়াছে যে, আগামী দুই-এক যুগে বেশ্যারা সম্পূর্ণ ব্যাধি-মুক্ত হইয়া পড়িবে। ইউরোপীয় বেশ্যাগণ এতটা ব্যাধি-মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের গর্ভসঞ্চার হয় না। সেজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ বেশ্যাদের বন্ধ্যাত্বের যুক্তির সবটুকু নহে; উহা ছাড়াও অন্য কারণ আছে।

সেই কারণ কী? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বেশ্যা-ব্যবসায় পরিচালনে যে দৈহিক ও মানসিক অবস্থা প্রয়োজন, তাহাতে বেশ্যার জননেন্দ্রিয়সমূহে একটা স্থায়ী সঙ্কোচ

সাধিত হইয়া থাকে। এই স্থায়ী সঙ্কুচিত অবস্থা সন্তান ধারণের অনুকূল নহে। দ্বিতীয়তঃ বিষ-প্রতিষেধক ডুশ-সমূহে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ হয়, উহাদের অধিকাংশই যোনি-গাত্রের রস-ক্ষারণের প্রতিকূল।

আমাদের মনে হয়, আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত উক্ত কারণ-দ্বয়ও সম্পূর্ণ নহে। কারণ, প্রাচ্যের বেশ্যাগণ প্রতীচ্যের বেশ্যাগণের ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাস্থ্য-নীতি পালন করে না, তবু তাহারা তাহাদের প্রতীচ্যের ভগিনীগণের ন্যায়ই বন্ধ্যা।

আমাদের অভিমত এই যে, উপরোক্ত সমস্ত কারণের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলেই বন্ধ্যাত্ব সাধিত হয়। সুতরাং দুই-একটি কারণের মধ্যে উহাকে কিছুতেই সীমাবদ্ধ করা যুক্তি-সঙ্গত হইবে না।

বেশ্যা বলিতে আমরা সাধারণতঃ কেবল নারী-বেশ্যাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে অল্প-বিস্তর পুরুষ-বেশ্যাও বিদ্যমান আছে এবং দিন-দিন তাহাদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে।

পুরুষ-বেশ্যা

মিঃ এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ তাঁহার "ওয়ার্ক, ওয়েল্‌থ্ এণ্ড হ্যাপিনেস্ অব ম্যানকাইণ্ড্" নামক গবেষণা-মূলক বিখ্যাত গ্রন্থের ৫৬৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—নীতিবাগীশরা বেশ্যা-প্রথার দৈহিক দিকটাই কেবল আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষ যে বিবাহিতা স্ত্রী অপেক্ষা বেশ্যার নিকট অধিক যৌন-প্রমোদ লাভ করিয়া থাকে, তাহা সত্য নহে। তবু সে যে বেশ্যা-ভোগ করিয়া থাকে, তাহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। শহর-বন্দর প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে ব্যবসায় বা কর্ম্মোপ-লক্ষে পুরুষরা স্ত্রী-হীন বা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অস্থায়ী-ভাবে বাস করে, সেখানেই বেশ্যা-প্রথার প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে,

বেশ্যা নিঃসঙ্গ পুরুষের অস্থায়ী সঙ্গী, বন্ধু, সান্ত্বনা-দায়ক যৌন-সহচর। ইহাই বেশ্যার প্রকৃত রূপ। ইহাই যদি বেশ্যার প্রকৃত রূপ হয়, তবে দুনিয়াতে পুরুষ-বেশ্যা বেশী নাই কেন? ইহার কারণ আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা। কর্ম্মোপলক্ষে পুরুষই এ-যাবৎ ঘরের বাহির হইয়া অস্থায়ীভাবে বিদেশে বাস করিয়াছে; সুতরাং ঘরের বাহিরে সঙ্গীর প্রয়োজন হইয়াছে পুরুষেরই বেশী। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, ভ্রমণে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গ পুরুষ অস্থায়ী ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব-নিরপেক্ষ নারী-সঙ্গ কামনা করিয়াছে। নারী-বেশ্যা ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও নারী-স্বাধীনতার যুগে নারীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নারী আজ আর অবরোধের পিঞ্জিরার পাখী নহে। নারীও আজ ব্যবসায়, ভ্রমণ ও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সঙ্গিহীন অবস্থায় দুনিয়ার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং অতীতে পরিভ্রমণশীল পুরুষের যে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পুরুষের অস্থায়ী বন্ধুরূপী নারী-বেশ্যার অভ্যুদয় হইয়াছিল, বর্ত্তমানে পরিভ্রমণশীল নিঃসঙ্গ নারীর সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নারীর অস্থায়ী বন্ধুরূপী পুরুষ-বেশ্যার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের প্রমোদ-কেন্দ্রসমূহে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ধনবতী পরিব্রাজিকা-রূপে বহু আমেরিকান মহিলাকে ধনের বিনিময়ে অস্থায়ী পুরুষ-সঙ্গী সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে অনেক পুরুষও ঐ সব স্থানে এই ধরণের নারীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। উহাদিগের সাঙ্কেতিক নাম 'গিগোলো'। আইনের ব্যবস্থার সুবিধাহেতু এই সমস্ত পুরুষ-বেশ্যাকে কোনও প্রকার সনদ লইতে হয় না বলিয়া এই পুরুষ-

বেশ্যা-প্রথা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। নারী-বেশ্যার চেয়ে ইহাদের সুবিধা অনেক বেশী। কারণ এই বেশ্যা-বৃত্তির জন্য নারী-বেশ্যার ন্যায় ইহাদিগকে সমাজে পতিত ও পরিত্যক্ত হইতে হয় না।

অতীতে বেশ্যা-বৃত্তির উচ্ছেদের বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেলেও বর্ত্তমানের সভ্যজাতিসমূহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে 'লীগ-অব-নেশনস্' ১৯২৭ সালে একটী সাব-কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটী বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ লইয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই প্রথার প্রতীকারোপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন। এই সাব-কমিটীর বাৎসরিক কার্য্য-কলাপের যে সমস্ত রিপোর্ট বাহির হইতেছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, এই জটীল সমস্যার সমাধানের আন্তরিক চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না।

বেশ্যা-উচ্ছেদে লীগ-অব-নেশন্স্

তবে উক্ত কমিটী এ বিষয়ে এক-মত যে, এই বহুকাল-প্রচলিত জটীল সমস্যা সমাধানের সহজ ও সরল অনায়াস-সাধ্য কোনও উপায় নাই। এই প্রথার প্রতীকারের জন্য একদিকে যেমন সুযোগ-সুবিধামত কার্য্যকরী আইন প্রণয়ন করিতে হইবে, পক্ষান্তরে জনসাধারণকেও তদনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। কুসংস্কার-বর্জ্জিত সুশিক্ষার দ্বারা মানুষের নৈতিক ও ধর্ম্মীয় দৃষ্টি-কোণের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। বেশ্যা-প্রথা কোনও জাতি বা দেশ-বিশেষের সমস্যা নহে ; ইহা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা। উক্ত সাব-কমিটী বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, বেশ্যা-প্রথা একটা সুগঠিত সঙ্ঘ ; সমস্ত পৃথিবীর বেশ্যা-সঙ্ঘ একসূত্রে গাঁথা। ইহা বিশ্বব্যাপী একটী প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং ইহার প্রতীকার করিতে হইলে একটী আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে ; কোনও জাতি বা রাষ্ট্র একার চেষ্টায় ইহার প্রতীকার করিতে পারিবে না।

আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র-শক্তি বেশ্যা-প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কি না, এ সম্বন্ধেও 'লীগ-অব-নেশন্স্' বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত। কারণ ইহাতে সুফল পাইবার আশা কম। এ বিষয়ে British Social Hygienic Council লীগের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা সকল দিক হইতে প্রণিধান-যোগ্য। ঐ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আইনের সাহায্যে বেশ্যা-বৃত্তি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে যৌন-রোগীর সংখ্যা বরং বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, হাজারে রোগীর সংখ্যা ২০১.০ হইতে ২৭৫.৪এ উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও তিনটী কারণে নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। (১) নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টার সাফল্য রেজিষ্টারী-করা বেশ্যার সংখ্যা-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। (২) বেশ্যার সংখ্যা-বৃদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রথায় উৎসাহ দান করা হয় ; (৩) নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যে পুলিশের মধ্যে পাপ বৃদ্ধি পায়।

বেশ্যা-প্রথার নিয়ন্ত্রণ

সুতরাং লীগ বেশ্যা-নিয়ন্ত্রণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণকে যৌন-বিজ্ঞানে অধিকতর শিক্ষিত করিয়া তুলিবার দিকে অবহিত হইবার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়

দাম্পত্য-জীবন

দাম্পত্য-জীবন পরীক্ষা-ক্ষেত্র—দাম্পত্য-জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী—দায়ী কে?—সতীত্ব—স্ত্রী-সতীত্ব—পুরুষ-সতীত্ব—অবিবাহিতা নারীর সতীত্ব—স্ত্রী-পুরুষের সতীত্বের পার্থক্য—নারী-সতীত্বের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা—ইউরোপে প্রাগুদ্বাহ সতীত্ব—ভারতে ধর্ম্মে সতীত্ব—বিবাহেতর যৌন-মিলন—আদর্শ দম্পতি—কোর্টশীপ্—যৌন-বোধের প্রাধান্য—নির্ব্বাচনে সন্তোষ—গৃহে আনন্দ—স্ত্রীর দায়িত্ব—স্বামীর সহযোগিতা—পারস্পরিক মনোভাবের বিস্তীর্ণতা—স্ত্রী ও পুরুষের ভাবের পারস্পরিকতা—পুরুষ সম্বন্ধে নারীর জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য—সৌন্দর্য্যের সাধনা—পুরুষের মনোভাব—ব্যায়াম ও প্রসাধন—কতিপয় উপদেশ—পোষাক ও অলঙ্কার—মেজাজ—যৌন-বোধ—পুরুষের জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য—নারীর লজ্জাশীলতা—নারীর ভয়—নারীর দ্বৈত মনোভাব—নারীর কবি-প্রাণতা ও কলা-প্রিয়তা—কলারূপে-প্রেম—উহার আবশ্যকতা—আমাদের পারিবারিক জীবনের সাধারণ ইতিহাস—প্রীতি স্থাপনের কতিপয় উপকরণ।

দাম্পত্য-জীবন
পরীক্ষার ক্ষেত্র

দাম্পত্য-জীবন একটা বিরাট পরীক্ষা-ক্ষেত্র। দুইটী তরুণ প্রাণীকে জীবনের নামে একত্রে বাঁধিয়া দিয়া সুখে, দুঃখে, অসুখে-বিসুখে, হাসি-কান্নায় সারা জীবন একত্রে কাটাইতে বলা উহাদের উপর বিপুল কর্ত্তব্য-ভার চাপানো ছাড়া আর কিছু নহে। যৌবন-উন্মত্ত দুইটী তরুণ-তরুণীর পক্ষে পরস্পরের ভোগ-স্পৃহায় দু'চার মাস বা দু'চার বৎসর একত্র কাটাইয়া দেওয়া আশ্চর্য্য বা কঠিন নহে। কিন্তু বিবাহ-জীবন ত অস্থায়ী যৌন-সম্বন্ধ মাত্র নহে। ইহাতে অধিকার ও দায়িত্ব, প্রীতি ও অপ্রীতি, সরসতা ও তিক্ততা সমভাবে বিদ্যমান আছে এবং আছে বলিয়াই ইহাকে ক্ষুদ্রাকৃতির বিশ্ব-সংসার বা World in miniature বলা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবাহের সময় সমস্ত ধর্ম্মেই মন্ত্র আওড়াইবার প্রথা আছে। কিন্তু বিবাহিত জীবনকে সুখী করিবার কোনও দৈব শক্তি ঐ সমস্ত মন্ত্রের নাই।

দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

কঠোর সাধনা, নৈষ্ঠিক একাগ্রতা, বিপুল আত্মসংযম, অপরিসীম ধৈর্য্য, আন্তরিক সহানুভূতিই কেবল আমাদের দাম্পত্য-জীবনকে আনন্দ-দায়ক করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমাদের ভাবী দম্পতিরা দাম্পত্য-জীবনকে সুখী করিবার কৌশল অবগত হইতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই আমাদের দাম্পত্য-জীবন অধিকাংশ স্থলে অপ্রীতি, নিরানন্দ ও কলহের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। সত্যই বলা হইয়াছে, "Marriage is a blessing to a few, a curse to many and a great uncertainty to all." অর্থাৎ বিবাহ দুই-একজনের জন্য আশীর্ব্বাদ হইতে পারে, কিন্তু অনেকের জন্য ইহা অভিশাপ এবং সকলের জন্যই উহা এক বিষম অনিশ্চয়তা। সুখী দম্পতির সংখ্যা অধুনা এত কমিয়া গিয়াছে যে, বিবাহ সত্য-সত্যই আজকাল আর তেমন আগ্রহের বস্তু নহে। কারণ দেখা গিয়াছে, গোড়াতে দম্পতির মধ্যে যতই গভীর ও তীব্র ভালবাসা থাকুক না কেন, অতি অল্পদিন মধ্যেই সে ভালবাসা শুখাইয়া গিয়াছে এবং দাম্পত্য-জীবন কলহ-বিবাদের আকরে পরিণত হইয়াছে।

দাম্পত্য-জীবনের এই নিরানন্দের জন্য দায়ী পুরুষ, না নারী? অতীতে সমস্ত অপরাধ নারীর ঘাড়ে চাপাইয়া পুরুষ নিজেকে বেকসুর খালাস

দায়ী কে?

দিয়াছে। নারী ছিল বেহেশ্‌ত হইতে আদমের পতনের কারণ, পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, অত্যাচার-অবিচার, পাপ ও দুর্নীতির হেতু। সুতরাং নারীর জন্যই দাম্পত্য-জীবন

সুখের হইতে পারে নাই, ইহাই ছিল সমস্ত জাতির সর্ব্ববাদী-সম্মত রায়।

দোষ পুরুষেরও আছে নারীরও আছে। অনেক দাম্পত্য-জীবন স্ত্রীর দোষে সুখী হইতে পারে নাই। আবার অনেক জীবন স্বামীর দোষেই সুখী হইতে পারে নাই। কিন্তু উহার জন্য স্ত্রী-বা স্বামী-বিশেষকে দোষ দিয়া লাভ নাই। দোষ আমাদের শিক্ষার। কারণ দাম্পত্য-জীবনকে সুখী করিবার কোনও চেষ্টা আমরা করি নাই। সে শিক্ষা আমরা তরুণ-তরুণীকে দেই নাই। দাম্পত্য-সুখের মত জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ আমরা একেবারে বিনা-মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিয়াছি। সেজন্য আমরা এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে চাহি নাই।

ত্যাগেই আনন্দ, একথা দাম্পত্য-জীবনে যত প্রযোজ্য অন্য কোথাও বোধ হয় এত প্রযোজ্য নহে। যে ব্যক্তি অপরের প্রাণে আনন্দ দান করিতে না পারিল, সে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে না; যে অপরের মুখে হাসি ফুটাইতে জানে না, সে হাসিতেও পারে না। স্ত্রীকে যে সুখী করিতে পারে না, সে নিজেই সুখী হইতে পারে না। জগতকে সে কী সুখদান করিবে?

কিন্তু আমরা স্বার্থপর, ত্যাগ অভ্যাস আমরা করি নাই। প্রভুত্ব লইয়া প্রতিযোগিতা করিয়াছি; স্ত্রীর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া নারীকে দাসী করিয়াছি। কিন্তু নারী দাসী নহে, সে জীবন-সঙ্গিনী। বহু ধর্ম্ম-মতে হাওয়া (Eve)কে খোদা আদমের বক্ষ-পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জনৈক ইংরাজ-লেখক বলিয়াছেন— Woman was made out of a rib from the side of Adam, not out of his head to top him, not out of his feet to be

trampled on, but out of his side to be equal to him, under his arm to be protected, near his heart to be loved." অর্থাৎ নারীকে পুরুষের মস্তক হইতে সৃষ্টি করা হয় নাই, সুতরাং নারী পুরুষের উপর প্রাধান্য করিবে না; পুরুষের পদ হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হয় নাই, সুতরাং পুরুষ তাহাকে পদ-দলিত করিবে না; পুরুষের বক্ষ-পঞ্জরাস্থি হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং পুরুষ বাহুর আশ্রয়ে তাহাকে রক্ষা করিবে এবং ভালবাসিবে।

দাম্পত্য-জীবন সাধনা-ক্ষেত্র, দাম্পত্য-সুখ সাধনার বস্তু। এই সুখ লাভ করিতে হইলে যৌন-নিষ্ঠা, সহৃদয়তা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ আয়ত্ত্ব করিতে হইবে। যৌন-উপযোগিতা লাভের জন্য কলারূপে আমাদিগকে প্রেম-চর্চ্চা করিতে হইবে। মোট কথা, কি যৌন-জীবনে, কি বাহ্য-জীবনে আমাদিগকে পরস্পরের উপযোগী হইতে হইবে। এই অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

যৌন-নিষ্ঠা অর্থাৎ বিবাহিত দম্পতি ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে রতি-ক্রিয়া না হওয়ার নামই সতীত্ব। 'সতী' বলিতে যৌন-নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোক বুঝায়। যৌন-নিষ্ঠাবান পুরুষ বুঝাইবার মত কোনও শব্দ আমাদের অভিধানে নাই। ইংরাজী chastity শব্দ দ্বারাও নারীর যৌন-নিষ্ঠাই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যৌন-সাহিত্যে পুরুষের বেলাতেও অন্য শব্দের অভাবে chaste এবং chastity কথা ব্যবহার করা হইয়াছে। ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য আমিও এই পুস্তকে 'সতী' ও 'সতীত্ব' শব্দদ্বয় উভয় লিঙ্গের শব্দরূপে ব্যবহার করিব।

সতীত্ব

স্ত্রীলোকের যৌন-নিষ্ঠার জন্য 'সতী' ও 'সতীত্ব' এবং chaste এবং

chastity শব্দ আছে; কিন্তু পুরুষের সতীত্ব প্রকাশের জন্য কোনও শব্দ ভাষায় না থাকার একমাত্র কারণ এই যে, সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যেই নারী ও পুরুষের সতীত্বকে দুইটী ভিন্ন মাপ-কাঠি দিয়া মাপা হইয়াছে। পুরুষের সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও নারীর সতীত্বের ন্যায় উহাকে অত্যাবশ্যক বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সেজন্য নারীর অসতীত্বকে যেমন কঠোর হস্তে দণ্ডিত করা হইয়াছে, পুরুষের অসতীত্বকে তেমনভাবে দণ্ডিত করা হয় নাই।

স্ত্রী-সতীত্ব

নারী-পুরুষের মধ্যে সতীত্বের এই পার্থক্যের যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল। কারণ রতি-ক্রিয়ার ফলাফল নারী-পুরুষের মধ্যে স্বভাবতঃই পৃথক। পুরুষ রতি-ক্রিয়া করিয়াই মুক্ত। কিন্তু রতি-ক্রিয়ায় নারীর দায়িত্ব আরম্ভ হয় মাত্র। পুরুষ ব্যভিচার করিলে সে স্ত্রীর বিশ্বাস-ভঙ্গ করিল মাত্র। আর স্ত্রী ব্যভিচার করিলে সে ত স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করিলই, তদুপরি সে এমন একটী সন্তান পেটে ধরিল যে সন্তান তাহার বিবাহিত স্বামীর নহে। সুতরাং পিতৃত্ব নির্দ্ধারণের সুবিধার দিক হইতেই প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা স্বীকার্য্য যে পিতৃ-প্রধান পরিবার-প্রথাই এই মনোভাবের জন্য দায়ী। পিতৃ-প্রধানের স্থলে যদি মাতৃ-প্রধান পরিবার-প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে নারী-সতীত্বের কোনও প্রয়োজন থাকিত না।

পুরুষ-সতীত্ব

অবিবাহিতা নারীর জন্য সতীত্ব বর্ত্তমান সমাজ- ও রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যক। কারণ অবিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করিয়া তাহার অসতীত্বকে যেমন গোপন রাখিয়া ধার্ম্মিক সাজিয়া সমাজে চলা-ফেরা করিতে পারে, অবিবাহিতা

অবিবাহিতা নারীর সতীত্ব

নারী তাহা পারে না। কাজেই অবিবাহিতা নারী নিজের সতীত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য।

কিন্তু যদি নারী-পুরুষের সতীত্বকে প্রয়োজনীয়তার মাপ-কাঠি দিয়াই মাপা হয়, তবে বর্ত্তমান-যুগে পুরুষের অসতীত্ব অপেক্ষা নারীর অসতীত্বকে অধিক নিন্দা করা যায় না। যে সমস্ত লোক নারী ও পুরুষের সতীত্বের মধ্যে পার্থক্যের সীমা-রেখা টানিয়া এ-যাবৎ একই ধরণের অপরাধের জন্য পুরুষকে ক্ষমা ও নারীকে শাস্তি-দান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা শুধু এই যুক্তিতেই তাহা করিয়াছেন যে, নারী গর্ভ-ধারণ করে বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে এত অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। অন্যথায় পুরুষের দিকে পক্ষপাতিত্ব করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের আদৌ নাই। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "স্রষ্টা পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, আমরা কি করিব?" এই যুক্তি ও মতবাদ যদি সত্য ও আন্তরিক হয়, তবে বর্ত্তমান যুগে যখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপকরণ প্রয়োগে নারী গর্ভ-ধারণ না করিয়াও রতি-ক্রিয়া করিতে পারে, তখন অসতীত্বের জন্য নারীকে পুরুষের চেয়ে এক তিল বেশী নিন্দা করা যাইতে পারে না।

স্ত্রী-পুরুষের সতীত্বের পার্থক্য

নারী-সতীত্বের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু আমার মতে দৈহিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও সতীত্বের একটা নিজস্ব গুণ আছে। সতীত্ব স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের বিশ্বাস ও মমতা সৃষ্টির দ্বারা বিবাহ-বন্ধনে একটা পবিত্র মাধুর্য্য আনা ছাড়াও উহা মানব-মনে যৌন-বোধ সম্বন্ধে একটা মহৎ মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। যৌন-বোধ দায়িত্ববোধের সংমিশ্রণে স্বতঃই মানব-মনে একটা উচ্চতা লাভ করে। অধ্যাপক মিচেলস্ তদীয় 'সেক্শুয়েল এথিকস্' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন

ইউরোপে প্রাগুদ্বাহ সতীত্ব

যে, ইউরোপের অধিকাংশ তরুণী রতি-ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ লোককেই স্বামীরূপে পাইতে চায়। তাহারা নাকি রতি-ক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ সতী-পুরুষ অপেক্ষা রতি-ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ-সতী পুরুষকেই বেশী পছন্দ করে।

কিন্তু আমাদের ভারতীয় তরুণীদিগকে আমরা এই মনোবৃত্তি-সম্পন্ন বলিয়া মনে করি না। ভারতীয় তরুণীরা নিজেরা যেমন সতী থাকিতে

ভারতে

চায়, তেমনই সতী-যুবককেই তাহারা স্বামীরূপে পাইতে চায়। ইহারা চায়, তাহাদের স্বামীরা যেন তাহাদের প্রথম মিলনের রাত্রে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বলিতে পারে, "ইহাই আমার প্রথম যৌন-মিলন।"

হ্যাভ্‌লক এলিস নারী-পুরুষের উভয়ের সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে রুশিয়ার সমাজ-তন্ত্রবাদীরা এ-যাবৎ সতীত্বকে বর্জ্জনীয় কুসংস্কার বলিয়া বিদ্রূপ করিত, তাহারাও ইদানীং সতীত্বের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবীর অধুনা-প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই সতীত্বের উপর খুব জোর দিয়াছে এবং প্রাগুদ্বাহ যৌন-মিলনের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে। উহারা

ধর্ম্মে সতীত্ব

নারী ও পুরুষ উভয়ের সতীত্বের প্রশংসা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘদিন সতীত্ব রক্ষা করা যে খুবই কঠিন কার্য্য, ঐ সমস্ত ধর্ম্মে উহাও স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় হিন্দু ধর্ম্মে বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্ম যে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চারি-বিবাহের অনুমতি দিয়াছে, তাহাও বোধ হয়, এই যৌন-নিষ্ঠার দুরূহতা

বিচার করিয়া। মানুষের পক্ষে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত যৌন-নিষ্ঠা রক্ষা করা দাম্পত্য-জীবনে যৌন-সুখের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। যৌবন-প্রাপ্তির পর আর যুবকদিগকে জবরদস্তী করিয়া যৌবন-উপভোগ হইতে বিরত রাখা উচিতও নহে, সম্ভবও নহে। সেইজন্যই হিন্দুধর্ম্মে সকাল-বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মানুষ সেই সকাল-বিবাহ-প্রথাকে যে শৈশব-বিবাহে পরিণত করিয়াছে, সে জন্য হিন্দুধর্ম্মের দোষ দেওয়া চলে না।

বিবাহেতর যৌন-মিলন

বস্তুতঃ বিবাহেতর যৌন-মিলন সত্যিকার সুখ দান করিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ সম্যক-রূপে রতি-সুখ পাইতে হইলে যৌন-মিলন ভীতিহীন, বিরক্তিহীন, ব্যস্ততাহীন, চিন্তাহীন ও বিবেকের দংশনহীন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিবাহেতর যৌন-মিলনের ঐ সমস্ত গুণ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে বিবাহেতর যৌন-সুখ যতই তীব্র হউক না কেন, উহা অতীব ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে অতিশয় তিক্ত হইতে বাধ্য। রতি-সুখে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় পুলক পাইতে হইলে উহাতে যে মানসিক স্থৈর্য্য অত্যাবশ্যক, বিবাহেতর যৌন-মিলনে কদাচ তাহা থাকিতে পারে না।

আদর্শ দম্পতি

পূর্ব্বেকার আলোচনা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন: (১) যৌনবৃত্তি সার্ব্বজনীন; (২) এই বৃত্তি অতিশয় তীব্র; (৩) মানব-কল্যাণের দৃষ্টি-কোণ হইতে এক-বিবাহ-প্রথাই প্রশস্ততম।

সুতরাং যে দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত যৌন-আবশ্যকতা পূর্ণ হইতে পারে, সেই দাম্পত্য-জীবনই শ্রেষ্ঠ। যে দম্পতি যৌন-সুখের

যতটুকুর জন্য পরস্পরে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্যত্র সে সুখের সন্ধান করিবে, সেই দম্পতি-জীবন ততটুকুর জন্যই নিস্ফল। আমার এক বন্ধু তাঁহার স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন। স্ত্রীটীও সকল দিক দিয়া আদর্শ পত্নী। কিন্তু দিনের বেলা সহবাস করিবার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বন্ধুকে বেশ্যাগমন করিতে হইয়াছিল। বন্ধুর গুণবতী স্ত্রীর দ্বারা তাঁহার এই তুচ্ছ সাধটী পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার দাম্পত্য-জীবন ঐ টুকুর জন্যই নিস্ফল। পুরুষ যে-টুকু সুখ স্ত্রীর নিকট পাইবে না, সে-টুকুর জন্য সে অন্যত্র যাইতে বাধ্য। স্ত্রীকে আমরা সকল প্রকার প্রমোদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলি না বলিয়াই বেশ্যা-প্রথা এরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে।

বহুদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, বিবাহ-প্রথাকে একটা যৌন-গবেষণা মনে করিলে তাহাতে মানুষের ব্যক্তি-গত বা সমষ্টি-গত কল্যাণ হইবে না।

কোর্ট-শীপ

দেশত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও মানুষ সাধারণতঃ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে, সেই স্থানকেই জ্ঞান-প্রয়োগের দ্বারা বাসোপযোগী সুখকর স্থানে পরিণত করিয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ যাহার সহিত মানুষের যৌন-সম্বন্ধ একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, ইচ্ছা করিলে মানুষ জ্ঞান-প্রয়োগের দ্বারা সে সম্বন্ধকে মধুর করিতে পারে। কোর্ট-শীপ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাগুদ্বাহ পরীক্ষা দ্বারা বিবাহ-জীবনকে স্থায়ী ও সুখকর করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে, ঐ সমস্ত পরীক্ষার কোনটাই যৌন-ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট নহে। ইউরোপ প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে কোর্টশীপ-প্রথা বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত স্থানের দাম্পত্য-জীবন এশিয়া-খণ্ডের অন্ধ-বিবাহের দাম্পত্য-জীবন অপেক্ষা

অধিক সুখের নহে। নিস্ফল বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদও ইউরোপ অপেক্ষা এসিয়ায় বেশী নহে। ইহার অর্থ এই যে, সহস্র প্রকারের কোর্ট-শীপ বা অন্য কোনও পরীক্ষা দাম্পত্য-জীবনকে নিশ্চিতরূপে সুখী করিতে পারে না। বর্ত্তমান-প্রচলিত কোর্ট-শীপে ভাবী-দম্পতির মানসিক পরীক্ষাই হইয়া থাকে। শারীরিক পারস্পরিক উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার নিয়ম নাই। বাক-দত্তদের যৌন-মিলন কদাচিৎ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহের পূর্ব্বে যৌন-মিলন নিষিদ্ধ। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, কোর্ট-শীপে পারস্পরিক যৌন-উপযোগিতা পরীক্ষাও হইতে পারে, তবু তাহাতে আমরা দম্পতির সমস্ত জীবনের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। কারণ দাম্পত্য সম্বন্ধ শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারের সম্বন্ধ। কাজেই জীবনের কোনও-এক মুহূর্ত্তের উপযোগিতাকে সারা জীবনের উপযোগিতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কোর্ট-শীপ-কালে তরুণ ও তরুণী পরস্পরের প্রিয় হইবার জন্য নিজেদের দোষত্রুটীকে এমনভাবে গোপন করিয়া চলে যে, ফলে কাহারও পক্ষে পরস্পরকে চিনিবার ও বুঝিবার সুবিধা হয় না। এবিষয়ে How To Be Happy Though Married নামক ইংরাজী পুস্তকে লেখা হইয়াছে—The whole endevour of both parties during the time of courtship is to hinder themselves from being known to each other—to disgiuse their natural temper in hypocritical imitations studied compliane and continued affectation and the cheat is often managed on both sides with so much art and discovered afterwards with so much abruptness that each

has reason to suspect that some transformation has happened on the wedding night. সুতরাং কোর্ট-শীপ দাম্পত্য-উপযোগিতার সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভর-যোগ্য রক্ষা-কবচ হইতে পারে না।

বাজারে তৈয়ারী জামা-কাপড় ও জুতা পাওয়া যায়। অনেকগুলি লাগাইতে-লাগাইতে একটা ক্রেতার উপযোগী হয়। আমাদের বিবাহ-প্রথা অনেকটা সেই ধরণের। আমরা কোর্ট-শীপ করি, বিবাহ করি, তালাক দেই, আবার বিবাহ করি, আশা এই যে এইরূপে তালাস করিতে করিতে উপযোগী সঙ্গী জুটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাদের যৌন-জীবনকে এইরূপ গবেষণার বিষয় করা উচিত ও সম্ভব কি না? জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ অনেক উন্নত হইয়াছে। অনেক অনাবাদ জায়গাকে মানুষ বাসোপযোগী করিয়াছে, অনেক অখাদ্যকে মানুষ সুখাদ্যে পরিণত করিয়াছে। এক কথায়, মানুষ প্রকৃতির উপর অচিন্তনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু কি যৌন-ব্যাপারেই মানুষের সাধনা নিস্ফল হইবে? এখানেই কি মানুষ অন্ধের মত সুখের সন্ধানে হাতড়াইয়া বেড়াইবে?

আমার মনে হয়, যৌন-ব্যাপারে মানুষের অতটা নিরাশ্রয় ও অদৃষ্টবাদী হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। কোর্ট-শীপ করিয়াই হউক, আর অন্ধভাবেই হউক, যে-কোনও প্রকারের দুইটী সুস্থ নর-নারীর মিলন হইলে সাধনার দ্বারা সে মিলনকে সুখের করা যাইতে পারে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করিয়া চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা দাম্পত্য-জীবনকে সফল ও সুখী করিবার মধ্যেই মানুষের যৌন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও এইখানে। বিবাহ

যৌন-বোধের প্রাধান্য

নারী ও নর উভয়ের পক্ষেই একটা সাধনা, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরস্পরকে যৌন-সুখ দান করাই এই সাধনার পনর-আনা। কারণ যৌন-ব্যাপারে পরস্পরের উপযোগিতাকে ভিত্তি করিয়াই জীবন-সাধনার অন্যান্য স্তরের সাধনা গড়িয়া উঠিবে। মানসিক ও শারীরিক অন্য সহস্র প্রকারের মিল থাকিয়াও যদি যৌন ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে গরমিল থাকে, তবে সে দম্পতির জীবন নিস্ফল হইতে বাধ্য, কিন্তু যদি যৌন-ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপযোগী হয়, তবে অন্য সহস্র প্রকারের গরমিল ও মতভেদ সত্ত্বেও তাহাদের জীবন সুখের হইতে পারে। এ বিষয়ে মহিলা যৌন-বেত্তা ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ তাঁহার "এণ্ডিওরিং প্যাশন" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সুখ-দায়কভাবে রতি-ক্রিয়া করিতে পারে, অন্য ব্যাপারে তাহাদের মতভেদ হইতে পারে, পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে তাহারা বিপরীত মত পোষণ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমস্ত মতভেদের জন্য তাহাদের মধ্যে কদাপি কলহ-বিবাদ হইবে না। বরঞ্চ ঐ মতভেদে তাহারা সুখানুভব করিবে। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে এক-মত ও এক-রুচির লোক হইয়াও যদি যৌন-ব্যাপারে তাহারা পরস্পরের উপযোগী না হয়, যদি তাহারা রতি-ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরকে সুখ-দান করিতে না পারে, তবে ঐ সহস্র প্রকারের মতৈক্যও তাহাদিগকে একত্রে রাখিতে পারিবে না।"

স্বামী-স্ত্রীর এই যে অতি-প্রয়োজনীয় যৌন-উপযোগিতা, আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, এই যৌন-উপযোগিতা ঘটনা-চক্রের দান নহে—সাধনার দান। আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, যে-কোনও নারী-পুরুষ আন্তরিক সাধনার দ্বারা স্ব-দাম্পত্য-জীবনকে সুখের আকর করিতে

পারে। মানব-কল্যাণের দিক হইতে যৌন-বিজ্ঞানের যদি কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া থাকে, তবে তাহা এই।

দাম্পত্য-জীবনকে সুখী করিতে হইলে যাহা-যাহা প্রয়োজন, আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি। বিবাহ-জীবনকে সর্ব্ব-প্রকার সুখের আকরে পরিণত না করিয়াই পুরুষকে গৃহ-কোণে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সুতরাং হয় আমাদিগকে সাধনার দ্বারা বিবাহ-জীবনকে আনন্দ-দায়ক করিতে হইবে, না হয়, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ-ব্যবস্থায় জলাঞ্জলি দিয়া যৌন-নির্ব্বিশেষত্বকে মানিয়া লইতে হইবে।

দাম্পত্য-জীবনকে সুখী করিতে হইলে দম্পতির পরস্পরকে অন্ততঃ বাহ্যতঃ সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে যত তালাস-অনুসন্ধান, যত বিচার-বিবেচনা, যত তুলনা-পর্য্যালোচনাই করা হউক না কেন, যেইমাত্র বিবাহ হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ সমস্ত তুলনা-সমালোচনা বন্ধ হইয়া যাওয়া উচিত।

নির্ব্বাচনে সন্তোষ

বিবাহের পরে যদি দম্পতির মনে এমনও অনুশোচনা আসে যে নির্ব্বাচনে ভুল হইয়া গিয়াছে, তবু সে মনোভাব সযত্নে গোপন রাখিয়া কি ভাবে নির্ব্বাচন-ত্রুটীর সংশোধন করা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। মনে করা উচিত, বহু চেষ্টার পরে যে ব্যক্তি আসিয়া জীবন-সঙ্গীরূপে জুটিয়াছে, তাহার সঙ্গে সুখের জীবন যাপন করা যায় কি না, তাহার আন্তরিক চেষ্টা করিয়া দেখা দরকার। যে প্রথম দৃষ্টিতেই আমার চক্ষে খারাপ লাগিতেছে, সে বস্তুতঃই খারাপ কি না, এবং সত্যই খারাপ হইলেও একেবারে অসহনীয়রূপে খারাপ কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

গুটীকতক বিষয় চিন্তা করিলে এ-বিষয়ে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতে

পারি। প্রথমতঃ, আমাদের প্রথম দৃষ্টির দেখাই সর্ব্বদা নির্ভুল দেখা নহে; দ্বিতীয়তঃ, আমার যে সঙ্গী জুটিয়াছে, এই বিপুল পৃথিবীতে সেই-ই সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ মানুষ কি না; দৈবাৎ ইহার চেয়ে খারাপ সঙ্গীও ত আমার জুটিতে পারিত। তৃতীয়তঃ, আমি নিজে নির্দ্দোষ কি না, এবং যে সঙ্গী জুটিয়াছে, তাহার চেয়ে ভাল সঙ্গী আমার প্রাপ্য কিনা। এই কয়টী বিষয় চিন্তা করিলে প্রাণে একটা সন্তোষ আসিতে পারে। এই সন্তোষই দাম্পত্য-জীবনের মূলধন। মনে রাখা উচিত, অসন্তোষে কোনও লাভ হইবে না। উহাতে জীবন আরও দুর্ব্বহ ও শান্তিহীন হইয়া যাইবে মাত্র।

কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, সন্তোষসহকারে সঙ্গীকে গ্রহণ করিয়া তৎপর গৃহকে আনন্দময় করার দিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে।

গৃহে আনন্দ

নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি যে সমস্ত আনন্দের উপকরণ এ-যাবৎ মানুষকে ঘরের বাহিরে আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সমস্ত উপকরণকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরুষকে গৃহ-মুখী করিতে হইবে। রাজার শাসন-ভীতি বা ধর্ম্মের নরকাগ্নি-ভীতি যে পুরুষকে এ পর্য্যন্ত গৃহে বন্ধ করিতে পারে নাই, আনন্দ তাহা করিতে পারিবে।

গৃহকে আনন্দময় করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ নারীর হইলেও এ-কার্য্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন। বাস-গৃহ ও শয্যাদি

স্ত্রীর দায়িত্ব—স্বামীর সহযোগীতা

পরিপাটী রাখা, খাদ্য-দ্রব্য রুচিকর করিয়া রান্না করা, শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার সহিত সংসার পরিচালন করা, নিজের দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদকে সুশ্রী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্য্য স্ত্রী সামান্য চেষ্টাতে নিজেই সম্পাদন করিতে পারে। সাধ্য-মত প্রসাধন ক্রিয়াদি দ্বারা নিজের রূপ-যৌবনকে

স্বামীর চক্ষে লোভনীয় রাখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্ত্রীর উচিত। নৃত্য-গীতাদি দ্বারা স্বামীকে আনন্দ দান করিবার যোগ্যতা প্রত্যেক স্ত্রীর থাকা আবশ্যক। এ-সমস্ত উপায়ও স্ত্রী নিজেই অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পারস্পরিক মনোভাবের বিস্তীর্ণতা

আমরা উপরে ডাঃ মেরী ষ্টোপসের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর ঐক্যমত থাকিলেও যৌন-ব্যাপারে গরমিল হইলে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে মত-ভেদ থাকিলেও রতি-ক্রিয়ার পারস্পরিক উপযোগিতা থাকিলেই উভয়ের জীবন সুখের হইতে পারে। যৌন-উপযোগিতার উপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়াই হয়ত ডাঃ ষ্টোপ্‌স্‌ ঐ কথা বলিয়াছেন। অন্যথায় তিনি রতি-ক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত উপযোগিতার আবশ্যকতাকে ঐ ভাবে উড়াইয়া দিতেন না। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে মতের মিল থাকিলেও রতি-ক্রিয়ায় পরস্পরকে আনন্দ দান করিতে না পারিলে যে সে-দাম্পত্য-জীবন সুখের হইতে পারে না, এ-কথা আমরা বিনা-প্রতিবাদে মানিয়া লইতেছি। কিন্তু যাবতীয় ব্যাপারের মত-বিরোধ একমাত্র যৌন-উপযোগিতার দ্বারা নিরুদ্ধ হইতে পারে, এ-কথা আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। তবে এ-কথা সত্য যে, দম্পতির যৌন-সামঞ্জস্য তাহাদের অন্যবিধ সামঞ্জস্য বিধানের সুদৃঢ় ভিত্তি হইতে পারে। দম্পতির যৌন-উপযোগিতাকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অন্য সর্ব্বপ্রকারের বিরোধ ধীরে-ধীরে অপসারিত

হইতে পারে। গৃহকে সম্যক আনন্দপূর্ণ করিতে হইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সকল প্রকার ঐক্য-মত না হউক অন্ততঃ সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি নিতান্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় দম্পতির প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ আমরা সাধারণতঃ যাহাকে প্রেম বলিয়া থাকি, তাহা আমাদের যৌন-আসঙ্গ-লিপ্সা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই লিপ্সা যেমন তীব্র, তেমনই অল্প-কাল স্থায়ী। রূপ-যৌবনের সঙ্গে-সঙ্গে এই লিপ্সার তীব্রতা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই তীব্র লিপ্সাকে ভিত্তি করিয়া সৌহার্দ্দ্য, সহানুভূতি ও মমতার মিশ্রণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে একত্ববোধের উন্মেষ হয়, উহারই নাম ভালবাসা। সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও প্রীতির কর্ষণে বিবাহিত জীবনে ধীরে-ধীরে এই ভালবাসা দম্পতির প্রাণে দৃঢ়-মূল হইয়া বসে। ফলে রূপ-যৌবনের ভাটার সঙ্গে তাহাদের মধ্যে যে যৌন-লিপ্সার তীব্রতা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, সে-কথা তাহারা বুঝিতেই পারে না।

এই স্থায়ী সত্যিকারের ভালবাসার উন্মেষ-লাভ হয় কেবল তখনই, যখন যৌন-লিপ্সার প্রাথমিক তীব্রতা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যৌন-লিপ্সার তীব্রতা বিদ্যমান থাকিতে-থাকিতেই যদি সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও প্রীতির দ্বারা পারস্পরিক মমত্ব-বোধের ভিত্তি গড়িয়া তুলা না হয়, তবে স্থায়ী ভালবাসা কখনও জন্মলাভ করিতে পারে না। সহৃদয়তা ও সহানুভূতি সাধনার বস্তু। মানুষের মন কলে-তৈয়ারী জিনিষ নহে। সুতরাং যত বাছাই করিয়াই বিবাহ হউক না কেন, মন ও দেহের দিক দিয়া একেবারে খাপ খাইয়া যাইবে, এমন দুইটী নর-নারী পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর। সুতরাং সম্যকরূপে পারস্পরিক উপযোগিতা লাভের জন্য উভয় পক্ষ

হইতেই কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে। পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি না থাকিলে এই ত্যাগ স্বীকারের বাসনা-স্ফুরণ হইতে পারে না। উপরন্তু এই ত্যাগ স্বীকারের বাসনা-স্ফুরণ না হইলে পরস্পরকে সুখী করিবার কোনও চেষ্টা কোনও দিক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ যে-গৃহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সুখী করিবার জন্য আগ্রহশীল, যে-গৃহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মেজাজকে পরস্পরের উপযোগী করিতে যত্নবান, সেই গৃহে আনন্দ বিরাজমান, সে গৃহেই দম্পতি সুখী না হইয়া যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাম্পত্য-জীবনকে সম্যক-রূপে সুখী ও আনন্দ-ময় করিতে হইলে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইবে, পরস্পরের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে হইবে। তাহা হইতে গেলে পরস্পরের মনোভাব সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সচেতন থাকা প্রয়োজন। মানুষের মনোবৃত্তি অধ্যয়ন খুব কঠিন কার্য্য হইলেও যে দম্পতি পরস্পরকে ভালবাসে, তাহাদের পক্ষে পরস্পরের মনোভাব অধ্যয়ন করা খুব কঠিন নহে। রুচি, মেজাজ ও মনোবৃত্তি ব্যক্তি-ভেদে বিভিন্ন হইলেও দাম্পত্য-জীবনের অনেকগুলি বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মনোভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রায় সাধারণ। "In matrimony, as in Religion, in things essential there should be unity, in things indifferent, diversity, in all things charity." দাম্পত্য-জীবনকে আনন্দ-প্রদ করিতে হইলে এই সমস্ত সার্ব্বজনীনভাব সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। স্ত্রীর মধ্যে স্বামী কি কি গুণ আশা করে, আমি প্রথমে তাহার এবং স্বামীর মধ্যে স্ত্রী কি কি গুণ আকাঙ্ক্ষা করে, পরে তাহার, আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে

স্ত্রী ও পুরুষে ভাবের পারস্পরিকতা

এ-কথাটী বলিয়া রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী বিবাহ-জাত ধর্ম্মীয় ও আইন-গত বন্ধনকেই যথেষ্ট দৃঢ় বন্ধন মনে করিয়া পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্বে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। "আমাদের মধ্যে যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধন বিবাহই হইয়া গিয়াছে, তখন আর পরস্পরের প্রতি ভদ্রতার কোনও প্রয়োজন নাই" এরূপ মনোভাব ভাল নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, বিবাহ কেবল অধিকার সৃষ্টি করে না, দায়িত্বও সৃষ্টি করে এবং সে দায়িত্ব খোরাক-পোষাকে সীমা-বদ্ধ নহে।

আমি পূর্ব্বে এক পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, স্ত্রীকে আদর্শ-স্ত্রী হইতে হইলে তাহাকে স্নেহে মাতা, আদরে ভগিনী, বিপদে বন্ধু, সেবায় দাসী ও শয্যায় বেশ্যা হইতে হইবে। অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় গুণসমূহের কথা আলোচনা না করিয়া আমরা এখানে স্বামীর যৌন-প্রয়োজনের দিক হইতেই স্ত্রীর গুণসমূহের আলোচনা করিব। যৌন-প্রয়োজনের দিক হইতে স্ত্রীর নিম্নলিখিত গুণসমূহ থাকা চাই:

পুরুষ সম্বন্ধে নারীর জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য

(১) সৌন্দর্য্য—যৌন-প্রয়োজনের দিক হইতে সৌন্দর্য্যের স্থান এত উচ্চে যে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের নীতিবাদী লেখক কবেটও তদীয় 'যুবকগণের প্রতি উপদেশ' নামক গ্রন্থের 'প্রেমিকের প্রতি' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন 'শারীরিক সৌন্দর্য্য চর্ম্মের গুণ মাত্র', 'গুণই সৌন্দর্য্য,' 'শারীরিক সৌন্দর্য্য চক্ষুকেই শীতল করে, কিন্তু অন্তরকে দাহ করে' ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্য শারীরিক সৌন্দর্য্য-বিহীনদের সান্ত্বনা লাভের জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র।

সৌন্দর্য্যের সাধনা

হ্যাভলক এলিস বলিয়াছেন, 'দৈহিক সৌন্দর্য্য আমাদের যৌন-জীবনের একমাত্র না হইলেও প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ।' ডাঃ ফোরেল বলিয়াছেন যে, দৈহিক আকর্ষণই যৌন-আকর্ষণের প্রধান উপাদান। প্রেগ ইউনিভার্সিটীর অধ্যাপক ডাঃ হেনরী কিশ্ তদীয় "নারীর যৌন-জীবন" নামক গ্রন্থে যৌন-জীবনে সৌন্দর্য্যের, বিশেষ করিয়া নারী-সৌন্দর্য্যের, প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

পুরুষের মনোভাব

ডাঃ ফোরেল ও মিঃ এলিস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ এক-মত যে সাধারণ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও যৌন-সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের প্রভেদ অনেকখানি। সাধারণ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আমাদের চক্ষু ও সঙ্গে-সঙ্গে মনকে আনন্দ দান করে। কিন্তু যৌন-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আমাদের চক্ষু ও মনের সঙ্গে দেহকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। একটী ফুলের বা একটী স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য যেভাবে আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে আঘাত করিবে, একটী সুন্দর সুঠাম নারীদেহ আমাদিগকে সেভাবে আঘাত করিবে না। ডাঃ ফোরেলের মতে প্রথমোক্ত অবস্থায় আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি নিঃস্বার্থ ও নিস্ফল, তাহাতে আসঙ্গ-লিপ্সা নাই; আর শেষোক্ত সৌন্দর্য্য-বোধে আমাদের লিপ্সা আছে। হ্যাভলক এলিস আমাদের যৌন-সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ দীর্ঘ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যৌন-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আমাদের যৌন-প্রয়োজন-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে যৌন-সৌন্দর্য্য-বোধের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষের চক্ষে সেই নারীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, যে-নারীর যৌন-অঙ্গসমূহ স্বাভাবিক-ভাবে অথবা কৃত্রিম উপায়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নারীর স্তন উন্নত

অথবা তাহার নিতম্ব স্থূল, তাহার উরুদ্বয় সুডৌল হওয়ার মধ্যে সাধারণ সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের বিচারে বিশেষ কোনও সৌন্দর্য্য থাকিবার কথা নহে। কিন্তু পুরুষের যৌন-প্রয়োজনীয়তার খাতিরে উহা পুরুষের চক্ষে সুন্দরের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঠিক সেইরূপ, পুরুষের পেশী-বহুল দেহ নারীর চক্ষে চরম সুন্দর জিনিষ। নারীর পেশী-হীন সুডৌল কোমল দেহ যদি সৌন্দর্য্যের নিদর্শন হয়, তবে পুরুষের অমন দৃঢ়-দেহ সৌন্দর্য্যের নিদর্শন কেন হইবে, নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্যোপাসকের তাহা বোধগম্য হইবে না। নারীর যৌন-প্রয়োজনের জন্যই পুরুষের পেশী-বহুল দেহ সুন্দর আখ্যা পাইয়াছে।

ডাঃ কিশ্ বলিয়াছেন, নারী-পুরুষের উভয়ের সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন থাকিলেও সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ নারীরই অঙ্গ-ভূষণ। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে নারী-প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে যখন নারীর প্রয়োজনই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি হইবে, তখনকার কথা পৃথক। কিন্তু বর্ত্তমানে পুরুষের প্রয়োজনের খাতিরেই হউক, আর নিজস্ব গুণের দরুণই হউক, নারী-দেহই সৌন্দর্য্যের আদর্শ। এই নারী-সৌন্দর্য্যের জন্য অনাদিকাল হইতে পুরুষ তাহার ধন, মান, স্বার্থ এমন কি প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া আসিতেছে।

সুতরাং যে নারী নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিল, সে পুরুষের মনোভাবকেই অশ্রদ্ধা করিল।

দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ প্রকৃতির দান। কিন্তু প্রকৃতির-দেওয়া এই সৌন্দর্য্য রক্ষা করা ব্যক্তি-গত ইচ্ছা ও সাধনার উপর নির্ভর করে।

ব্যায়াম ও প্রসাধন

দৈহিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইলে দেহের মাংস দৃঢ়, চর্ম্ম মসৃণ ও কোমল রাখিতে হইবে। তাহা করিতে

হইলে ব্যায়াম ও প্রসাধনের প্রয়োজন। চর্ম্মের বর্ণ ও দেহের গঠন প্রকৃতির দান হইলেও প্রসাধন ও ব্যায়ামের দ্বারা মানুষ উহার অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারে। একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শারীরিক সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে প্রকৃতির-দেওয়া সুন্দর দেহও অতি সত্বর বিশ্রী হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সুন্দর স্বাস্থ্য কান্তি ও লালিত্য দ্বারা দেহের অনেক গঠন-ত্রুটী সংশোধন করিতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও সবল ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা অনেককে দেহ সুগঠিত করিতে দেখা গিয়াছে।

ইংরাজীতে একটা মূল্যবান কথা আছে যার অর্থ এই: "পৃথিবীতে শ্রী-হীন স্ত্রীলোক নাই; শুধু এমন কতিপয় স্ত্রীলোক আছে যাহারা নিজেদের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার কায়দা জানে না।" কথাটী নিতান্ত মিথ্যা নহে। পুরুষের প্রশংসা ও প্রীতি-লাভই যদি স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি হয়, তবে সত্যই পৃথিবীতে বেশী-সংখ্যক অসুন্দর মেয়েলোক পাওয়া যাইবে না। কারণ নিজের দেহ সম্বন্ধে মনোযোগী হইলে সমস্ত স্ত্রীলোকই নিজেকে পুরুষের চক্ষে লোভনীয় করিয়া তুলিতে পারে।

স্ত্রীলোকের স্মরণ রাখা উচিত, পুরুষের সৌন্দর্য্য-ক্ষুধা অতিশয় প্রবল। সেইজন্য পুরুষ নিজে অতিশয় অসুন্দর হইয়াও নিজের স্ত্রীকে সুন্দর দেখিতে চায়; এবং এই জন্যই পুরুষ নিজের চেয়ে স্ত্রীর জন্য অধিক অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নারীর এ কথাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সারাদিন জীবিকার্জ্জনের জন্য পুরুষ যে কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা কেবল স্ত্রীর সুন্দর মুখের হাসিটুকুর জন্য। কাজেই দাম্পত্য-জীবন সুখের করিতে হইলে নারীকে নিজের দেহের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইবে।

সামান্য চেষ্টাতেই নারী তাহার দেহের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারে ; কারণ পুরুষের চক্ষে নারী স্বভাবতঃই সুন্দর এই জন্য যে, পুরুষ নারীর সৌন্দর্য্য বিচার করে তাহার যৌন-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে।

নিম্নে নারীদের পালনের জন্য সংক্ষেপে কতিপয় উপদেশ দেওয়া হইল :

কতিপয় উপদেশ

(১) সর্ব্বদা মানসিক প্রফুল্লতা রক্ষা করিবে। মানসিক প্রফুল্লতা শারীরিক শ্রীবর্দ্ধক।

(২) পরিমিত আহার করিবে। উদরাময় নারী-দেহের পরম শত্রু।

(৩) যথাসম্ভব উন্মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিবে। ভ্রমণের মত উপকারী ব্যায়াম আর নাই।

(৪) আবশ্যক-মত নিদ্রা যাইবে। অনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্ট-জনক।

(৫) শারীরিক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইবে না। পরিশ্রম দেহকে সুগঠিত করে ও চর্ম্মকে লালিত্য ও মসৃনতা দান করে।

(৬) রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে প্রসাধন করিতে ভুলিবে না ; এই অভ্যাস সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক।

(৭) শরীর সোজা ও মস্তক উন্নত করিয়া চলা-ফেরা করিবে। ইহা শরীরের দৃঢ়তা রক্ষা করিবে।

দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির আর এক উপায় পোষাক ও অলঙ্কার। সুপ্রযুক্ত পোষাক নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পোষাক ও অলঙ্কার

পোষাক ও অলঙ্কার পরিধানে নারীর প্রধাণতঃ স্বামীকেই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত। অর্থাৎ যে পোষাক স্বামীর চক্ষে ভাল লাগে, অন্যে যাহাই বলুক, নারীর

সেই পোষাকই পরিধান করা উচিত। কারণ, নারীর সৌন্দর্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য স্বামীর মনকে স্ত্রীতে নিবদ্ধ রাখা, বাজারে বা সভা-সমিতিতে নিজের রূপের প্রদর্শনী খোলা নহে।

তাই বলিয়া পোষাকে স্বামীর অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করা স্ত্রীর উচিত নহে। বিশেষতঃ মূল্যের উচ্চতার সঙ্গে পোষাকের সৌন্দর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ভাল করিয়া সাজাইয়া-গুজাইয়া পরিতে জানিলে অল্প মূল্যের পোষাকও সুন্দর দেখা গিয়া থাকে।

মেজাজ নারী-সৌন্দর্য্যের উপেক্ষনীয় উপাদান নয়। ফলতঃ নারী-দেহের সৌন্দর্য্য অঙ্গের ও মুখের গতি-ভঙ্গির উপর নির্ভর করে এবং অঙ্গের গতি-ভঙ্গি ষোলআনা মেজাজের উপর নির্ভর করে। মেজাজটী ঠাণ্ডা রাখিয়া স্নেহ ও মমতার সহিত ব্যবহার করিয়া নারী পুরুষের শুধু ভালবাসা নহে, তাহার শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে, পুরুষের উপর নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করিতে পারে। অহঙ্কারী, বদ-মেজাজী ও রাগত স্বভাবের নারীর মত নির্ব্বোধ জীব আর দুনিয়াতে নাই। কারণ রাগের দ্বারা নারী নিজের অবস্থাই শোচনীয় করিয়া তুলে। পুরুষের এইটুকু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা প্রত্যেক নারীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য যে, চোখ রাঙাইয়া পুরুষকে শাসন করা যাইবে না। পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে নারীকে পুরুষ-চরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। নারী জাতির জ্ঞাতার্থে আমি নিম্নে পুরুষের কতিপয় দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিতেছি:

মেজাজ

যে মানসিক সবলতা পুরুষের শক্তি, সেই সবলতাই তাহার দুর্ব্বলতা। সে নারীকে সরলভাবে বিশ্বাস করিতে পারে। সে বিশ্বাসে

যেমন সরলতা আছে, তেমনি বিচার-হীন অন্ধতাও বিদ্যমান আছে। নারী ইচ্ছা করিলে বাহ্য সরলতা ও আদর-স্নেহ দিয়া পুরুষকে অনায়াসে ভুলাইয়া রাখিতে পারে। নারী যতই বিনয়-নম্র ও সেবা-পরায়ণ হইবে, পুরুষ ততই তাহার উপর নির্ভর-শীল গোলামে পরিণত হইবে। পুরুষ নারী অপেক্ষা অনেক বেশী ভাব-প্রবণ এবং এই ভাব-প্রবণতার প্রকাশও পৌরুষপূর্ণ। পুরুষ যদিও ক্রোধে কটূক্তি ও শ্লেষপূর্ণ গালাগালি করিতে জানে না, শোকে অশ্রুপাত করিতে জানে না, তথাপি তাহার ক্রোধ ও শোক নারী অপেক্ষা কম নহে, শুদ্ধমাত্র তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি ভিন্ন। বুদ্ধিমতী নারী ইচ্ছা করিলে পুরুষের এই অহমিকতাপূর্ণ ভাব-প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শুধু বাহ্‌বা দিয়া তাহাকে যত-ইচ্ছা খাটাইয়া লইতে পারে। পুরুষ নারী অপেক্ষা সরল ও উদার-হৃদয়। সে নারীর মত মনোভাব গোপন করিতে জানে না।

নারী যদি বুদ্ধিমতী হয় এবং স্বামীকে সত্যই যদি সে ভালবাসে, তবে স্বামীর এই সমস্ত চরিত্র-গত বৈশিষ্ট্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সে বাস্তবিকই দাম্পত্য-জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিতে পারে। আমরা পুরুষের এই সমস্ত দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিলাম নারীকে পুরুষ ঠকাইবার কায়দা শিখাইবার জন্য নহে, পরন্তু পুরুষকে সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য। নারী জাতির সতর্কতার জন্য পুরুষের এই চরিত্র-গত বৈশিষ্ট্যটুকুর কথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, পুরুষ সাধারণতঃ সরল বিশ্বাসী ও নিঃসন্দিগ্ধ বটে, কিন্তু যদি সে বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রমাণ একবার পাইয়া বসে, তাহার তবে পৌরুষের অহমিকতা এমন ভীষণ আকার ধারণ করে যে, সে চরম প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

(২) যৌন-বোধ।—পুরুষের যৌন-বোধের তীব্রতা সম্বন্ধে নারীর সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। রতি-ক্রিয়ায় নারী স্বভাবতঃই কর্ম্ম- এবং পুরুষ কর্ত্তা-স্থলবর্ত্তী হওয়ায় নারীর পক্ষে পুরুষের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন একথা স্বীকার করিতেই হইবে। রতি-ক্রিয়ার এই কর্ম্মত্ব হইতে যদি নারী-জাতি এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, রতি-ক্রিয়ায় অচল হইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই, তবে নারীকে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু নিজের এবং স্বামীর সুখের জন্য নারীর এই উদাসীন অবস্থা মোটেই হিতকর নহে, একথা নারীর উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের দেশের অনেক অতিরিক্ত ধার্ম্মিক নারীর আবার এমনও ধারণা আছে যে, রতি-ক্রিয়ায় তাহারা যতই অনিচ্ছা দেখাইবে, ততই তাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া স্বামীর শ্রদ্ধা পাইবে এবং স্বামীর প্রতি যতই ঔদাসীন্য দেখাইবে সতী নারী বলিয়া শ্বশুর-শ্বাশুরী-মহলে তাহারা ততই প্রশংসা পাইবে। এই ভ্রান্ত সতী-মনোবৃত্তি আমাদের দেশের শতকরা আশিটী অসুখী পরিবারের বিবাদের মূল কারণ। কারণ আমাদের দেশের পুর-মহিলারা রতি-ক্রিয়ার কলা-কৌশল জানাটাকে বেশ্যার একচেটিয়া ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন।

আমাদের দাম্পত্য-জীবনকে সুখের করিতে হইলে নারীজাতিকে অবশ্য-অবশ্য এই মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে। সংস্কৃত শাস্ত্রের "শয্যায় স্ত্রী বেশ্যা" এই মহাবাক্যের মর্য্যাদা দান করিতে হইবে।

ফলতঃ রতি-ক্রিয়ায় অগ্রনী হওয়ার দায়িত্বটা স্বামীর একার ঘাড়ে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। স্ত্রীর নিজের কথা বাদ দিলেও শুধু স্বামীর প্রাণে সম্যক যৌন-আনন্দ দান করিবার জন্যও স্ত্রীকে স্বামীর নিকট "ছিনাল"

সাজিতে হইবে। স্বামীর সহিত যৌন-উত্তেজক ইয়ারকী দিয়া তাহাকে যৌন-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। স্ত্রীর পক্ষে ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, স্বামীর শৃঙ্গারে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত রতি-ক্রিয়ায় স্ত্রী যেমন অধিক আনন্দ পায়, ঠিক সেইরূপ স্ত্রীর শৃঙ্গারে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত রতি-কার্য্যে পুরুষও তদ্রূপ আনন্দ পায়। স্ত্রীর ন্যায় পুরুষেরও কতকগুলি যৌন-প্রদেশ আছে। পুরুষের নিকট হইতে স্ত্রী স্বীয় যৌন-প্রদেশে যে-যে আনন্দ আশা এবং লাভ করে; সেই-সেই আনন্দ স্ত্রী পুরুষকে দিবে না কেন?

ইহা শুধু আদান-প্রদানের কথা নহে। এই পারস্পরিকতার উপরই আমাদের যৌন-জীবনের তৃপ্তি নির্ভর করিতেছে; এবং যৌন-জীবনের এই তৃপ্তির উপরই আমাদের বিবাহের স্থায়িত্ব ও বিবাহ-জীবনের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

দাম্পত্য-জীবন সুখের করিতে হইলে স্ত্রী-জাতিকে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে এই যে, পুরুষ স্বভাবতঃই বহু-কামী। বিবাহ-জীবনের একঘেয়েমী সে সহ্য করিতে পারে না। বিবাহ-জীবনের একঘেয়েমী সহ্য করা নারীর পক্ষেও কঠিন ও সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু রতি-ক্রিয়ায় পুরুষ কর্ত্তা বলিয়া পুরুষের পক্ষে এই একঘেয়েমী সহ্য করা অনেক বেশী দুরূহ। সেজন্য বিবাহ-জীবনের একঘেয়েমী দূর করিবার সকল প্রকার চেষ্টা করা উভয়ের, বিশেষতঃ নারী জাতির, কর্ত্তব্য। ইহারই নাম কলা-রূপে রতি-ক্রিয়া। আমি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কলা-রূপে রতি-ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকুমাত্র বলিতে চাই যে, বিবাহ-জীবনের একঘেয়েমী দূর করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নারীজাতির আছে। ডাঃ মেরী-ষ্টোপস ও অধ্যাপক মিচেলস্ বলিয়াছেন, "নারীজাতি

রতি-ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা পুরুষকে এক-পত্নীক জীবনে বহু-নারী-ভোগের আস্বাদ দিতে পারে।" একটী বিবাহিত-জীবন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী হয়। এই পঞ্চাশটী বৎসর একই নারী-পুরুষের একই উপায়ে একই ধরণে একই পারিপার্শ্বিকতায় রতি-ক্রিয়া করিলে সে রতি-ক্রিয়ায় একঘেয়েমী ও নিরানন্দ, এমন কি বিরক্তি, না আসিয়া যায় না। এই একঘেয়েমীর নিরানন্দ দূর করা সম্ভব, একমাত্র রতি-ক্রিয়ায় প্রত্যহ নূতন-নূতন উপায় ও নূতন-নূতন আসন অবলম্বন করতঃ ঐ কার্য্যে অভিনবত্ব আনয়ন দ্বারা। এই অভিনবত্ব এক-তরফা হইতে পারে না। নারী যদি পুরুষের মত কামানুরাগিণী না হয়, এবং ভাবাতিশয্যে এবং শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গিতে এবং বাক্যে যদি সে কামানুরাগ প্রকাশ না করে, তবে একা পুরুষ রতি-ক্রিয়ায় কিছুতেই পুলক-দায়ক অভিনবত্ব আনয়ন করিতে পারে না। সুতরাং দাম্পত্য-জীবনের সুখের খাতিরে নারীকে রতি-ক্রিয়ায় অন্ততঃ পক্ষে পুরুষের সমান কম্মিষ্ঠ হইতে হইবে।

পুরুষের জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য

পুরুষের যেমন নারীর নিকট কতকগুলি কাম্য আছে, পুরুষের নিকট নারীরও তেমনই কতকগুলি কাম্য আছে। নারীর এই মনোভাবের সম্যক জ্ঞান পুরুষের থাকা উচিত। অন্যথায় দাম্পত্য-জীবন সুখ-দায়ক হইতে পারে না।

চিকাগোর মিঃ আর্থার স্যামন তাঁহার "নারী ও পুরুষ" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, নারীজাতি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী চালাক, ধূর্ত্ত, ভণ্ড ও কুটীল বলিয়া পুরুষের পক্ষে নারী-চরিত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব নহে।

আমাদের মনে হয়, মিঃ স্থামন নারীজাতির উপর সুবিচার করেন নাই। নারী-চরিত্র পুরুষের কাছে দুরূহ নারীজাতির কুটীলতার জন্য নয়—পরন্তু নারী অধিকাংশস্থলে সহজাত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া।

যৌন কার্য্যে নারীর ব্যবহার যৌন-জীবনের অনেক দুর্গতির কারণ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু মহিলা যৌন-বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ একটী অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্বীয় ভগিনীগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাহার বিখ্যাত 'আইডিয়াল ম্যারেজ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"পুরুষের কাছে সত্যই নারী একটা হেঁয়ালী মাত্র। আজ নারী যে প্রকার আদরে একেবারে গলিয়া গিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পুলকে, অবসাদে এলাইয়া পড়িল, আগামী কল্য অবিকল সেইরূপ আদরেই সে দশ হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। আজ যে সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষুধা লইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল, বিনা কারণে আগামী কল্য সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিল। নারীর এই ব্যবহারে পুরুষ স্বভাবতঃই প্রাণে ব্যাথা পায়। কিন্তু দুঃখ এই যে, যে পুরুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে এত উন্নতি করিয়াছে, পতঙ্গের জীবন-চরিত আলোচনা করিতেছে, সেই পুরুষ নারীর মনো-বিজ্ঞান আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করিতেছে না।" ডাঃ ষ্টোপস্ এই ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—"নারীর যৌন-জীবনে তাহার যৌন-বোধ নৃত্যের ছন্দে তরঙ্গায়িত হইতেছে। চান্দ্র-মাসের সহিত এই তরঙ্গের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নারী দেহের যৌন-বৃত্তির তন্ত্রীর যথাস্থানে আঘাত করিয়া তাহার যৌন-ছন্দ তরঙ্গায়িত না করিয়া বলপূর্ব্বক রতিক্রিয়া করিতে গিয়াই পুরুষ নারীকে ভুল বুঝিয়াছে। পুরুষ

আলো, শব্দ ও জলের তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, কিন্তু তাহার জীবন-সঙ্গিনী নারীর যৌন-তরঙ্গ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহের পরিচয় দিতেছে না, ইহা কত পরিতাপের বিষয়।"

এ-সব তর্কিত বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, রতি-ক্রিয়ায় নারী জাতির এই যে বাহ্য ঔদাসীন্য, ইহার কারণ—(১) নারীর স্বাভাবিক লজ্জা, (২) রতি-ক্রিয়ায় পুলক ও পরিণামে ব্যথার মধ্যে কোন্‌টী অধিক গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ততা, (৩) উৎপীড়িত হইবার নারীর স্বাভাবিক বাসনা।

নারীর লজ্জাশীলতা

নারীর মধ্যে লজ্জাশীলতা পুরুষ অপেক্ষা অনেক তীব্র। এই কারণে রতি-ক্রিয়াতে নারীকে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়।

(২) রতি-ক্রিয়া নারীর পক্ষে পুরুষের ন্যায় নিরাপদ নহে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অনুসারেই নারীকে রতি-ক্রিয়ার বিপজ্জনক ফল ভোগ করিতে হয়।

নারীর ভয়

নারীর এই বিপজ্জনক বিশেষ দায়িত্বের কথা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিলে নারীকে পুরুষ কোনও মতেই দোষ দিতে পারে না। পুরুষের একথা ভুলা উচিত নহে যে, পুরুষের জন্য যাহা পুলক-প্রদ ক্রীড়া মাত্র, নারীর জন্য উহাই জীবন-মরণ সমস্যা। কাজেই রতিক্রিয়ায় রত হইবার পূর্ব্বে নারীকে অগ্রপশ্চাৎ অনেক ভাবিতে হয়।

(৩) নারী তাহার প্রিয়জনের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে ভালবাসে। ইহা নারী-প্রাণের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। প্রিয়তম স্বামী যতই জবরদস্তী

নারীর দ্বৈত মনোভাব

করিয়া তাহাতে উপগত হইবে, নারীর পুলকের মাত্রা ততই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে পুরুষেরও উত্তেজনা তীব্রতর হইয়া থাকে। নারীর এই দ্বৈত মনোভাব পুরুষের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা। কারণ রতিক্রিয়ায় নারীর অসম্মতির কোন্‌টা আন্তরিক আর কোন্‌টা ক্রীড়াত্মক তাহা বুঝার উপরই দাম্পত্য-জীবনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যৌন-উত্তেজিত পুরুষ যদি নারীর অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক রতি-ক্রিয়া করে, তবে নারী বলিবে "তুমি পশু" আর যদি সহৃদয়তা বশতঃ রতিক্রিয়ায় বিরত হয়, তবে বলিবে "তুমি কাপুরুষ।" পুরুষ তবে কোন্‌টা করিবে? ডাঃ মেরী ষ্টোপসের প্রস্তাবিত নারীর যৌন-তরঙ্গের নির্ভুল নির্দ্ধারণ সম্ভব হইলে ইহার একটা সমাধান হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পুরুষকে এসব ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতার সহিত নারীর ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য রাখিয়া সহৃদয়তা, ধৈর্য্য ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারীর কাম-কেন্দ্র বহু ও বিস্তৃত। সুতরাং নারীর যৌন-উত্তেজনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়। বিভিন্ন প্রকারের শৃঙ্গারের দ্বারা নারীর রতি-বাসনা সম্পূর্ণ জাগ্রত করিবার পূর্ব্বে নারীতে উপগত হওয়ার নাম রতি-ক্রিয়া নহে—-বলাৎকার, পাশবিকতা। কারণ শৃঙ্গারের দ্বারা নারীর কাম-বাসনা জাগ্রত না করিলে, নারী রতিক্রিয়ায় পুলকের পরিবর্ত্তে ব্যথা পাইয়া থাকে।

ফলতঃ নারী রতি-ক্রিয়ায় সদাজাগ্রত নহে। অন্ততঃ বাহ্যতঃ নারী রতি-ক্রিয়ায় চেষ্টা-লভ্য। নারীর এই চেষ্টা-লভ্যতার কারণ যৌন-বিরুদ্ধতাই হউক, আর যুগ-যুগান্তের আচার-সঙ্গাতই হৌক, নারীর এই বৈশিষ্ট্যের

একটা ভাল দিক আছে। নারীর এই যৌন-লজ্জা তাহাকে পুরুষের চক্ষে সুন্দর ও লোভনীয় করিয়াছে। যৌন-পুলকের জন্য নারীর এই দুর্লভতা একেবারে নিষ্ফল নহে।

আর এই বৈশিষ্ট্যকে দোষাবহ স্বীকার করিয়া লইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নারী জাতি অতিশয় অনুকরণ-প্রিয় এবং অতি-সহজেই নিজের স্বভাবকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা তাহার আছে। সুতরাং একটু ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত পরিচালিত করিলে নারীকে পুরুষ সম্পূর্ণ মনের-মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

পুরুষ আর একটী ব্যাপারে নারী-মনো-ভাবকে নিষ্ঠুর-ভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকে। নারী স্বভাবতঃই কবিপ্রাণা, কলা-প্রিয়া এবং সৌন্দর্য্যের উপাসিকা। একথা জানিয়া শুনিয়াও পুরুষ নিজের বিবাহিত স্ত্রীর নিকট সুন্দর করিয়া প্রদর্শনের কোনও চেষ্টা করে না। অথচ পর-স্ত্রীর কাছে সুন্দর দৃষ্ট হইবার জন্য তাহার চেষ্টার ক্রটী নাই। বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? পুরুষ নিজে যখন স্ত্রীকে সুন্দরী দর্শন করিবার জন্য এত আগ্রহশীল, তখন সে স্ত্রীরও সুন্দর স্বামী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকার সম্ভাবনাটা ভুলিয়া যায় কিরূপে, ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

নারীর কবিপ্রাণা ও কলা-প্রিয়তা

যে রতিক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রী আদর্শ স্বামী-স্ত্রী রূপে গণ্য হইতে পারে, সে রতিক্রিয়ায় প্রেম বিদ্যমান থাকা চাই। সুতরাং বিবাহিত জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করিতে হইলে রতি-ক্রিয়া ও প্রেমকে কলারূপে কর্ষণ ও সাধনা করিতে হইবে।

'কলারূপে প্রেমে'র কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত চম্‌কাইয়া উঠিবেন। যে প্রেম নিছক মানসিক ব্যাপার মাত্র, তাহাকে কিরূপে কলারূপে গণ্য করা যাইতে পারে? এইরূপ তর্ক সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির পরিচায়ক নহে। কর্ত্তব্য সাধনের দ্বারা মানুষের সমস্ত বৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। মানুষের অন্যান্য অনেক বৃত্তির ন্যায় প্রেম বৃত্তিরও কেবল কর্ষণ করিলে চলিবে না, তাহা প্রদর্শন করাও মানব-কল্যাণের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। প্রেমের সাফল্য প্রেম আকর্ষণে। প্রেম যত গভীরই হউক না কেন, সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত না হইলে তাহা অন্ধকার পর্ব্বত-গহ্বরস্থ সূর্য্যকান্ত-মণির মতই নিষ্ফল। যাহাকে ভালবাসিলাম, আমার ভালবাসার গভীরতা জানাইয়া যদি তাহাকে আনন্দ-দানই করিতে না পারিলাম, তবে আমার ভাল-বাসার মূল্য কী? প্রেমের অজ্ঞাতে প্রেমিকের প্রাণে যে 'আদর্শ' প্রেমকে 'গুমরিয়া মরিতে' আমরা কবিতা পুস্তকে দেখিয়া থাকি, সে 'আদর্শ' প্রেমের আমরা নিন্দা করিতেছি না; তবে ঐরূপ প্রেমের দোষ এই যে আমরা ঐরূপ প্রেম সকলের জন্য ব্যবস্থা করিতে পারি না। আমরা যে প্রেমের কথা বলিতেছি, সে প্রেম মিলনান্তক নাটকের প্রেম—বিয়োগান্ত নাটকের নহে।

কলারূপে প্রেম

কলারূপে প্রেমের কর্ষন দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে বাস্তবিকই অনেক-খানি রমন্তিক করা যাইতে পারে। সেজন্য স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে যত-খানি ভাল বাসে, কাজে-কর্ম্মে ভাবে-ভঙ্গিতে তাহার সব-খানি প্রদর্শন ত করিবেই, উপরন্তু খানিকটা কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত হইলেও পরস্পরের প্রতি সোহাগ-পূর্ণ ভালবাসা দেখানো উচিত। এই উদ্দেশ্যে অবিবাহিত

প্রেমিক প্রেমিকার মত একের অপরকে পাইবার অসীম-প্রচেষ্টা, প্রেম-নিবেদন, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি রতি-ক্রীড়া—এমত সহস্র উপায়ে বিবাহিত জীবনকে চিরমধুর করিয়া রাখা সত্যিকার ও আন্তরিক প্রেম-স্ফুরণের পক্ষে অতীব উপযোগী।

কলারূপে প্রেমের আবশ্যকতা। আমাদের পারিবারিক জীবনের সাধারণ ইতিহাস।

প্রেমের এই সমস্ত প্রদর্শনী এই জন্য প্রয়োজন যে, বিবাহ স্বামী-স্ত্রীকে সহজ-লভ্য করিয়া ফেলায় পরস্পরের প্রতি আগ্রহের তীব্রতা সত্যই খানিকটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত প্রেম-শাস্ত্রই এ বিষয়ে একমত যে, পরকীয়া ছাড়া প্রেম হইতে পারে না। ইউরোপীয় মনো-বৈজ্ঞানিক ও যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে প্রেম বিবাহে পর্য্যবসিত হইল, সে প্রেম-কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িল, বিবাহের এমন চরম অপবাদ আর হইতে পারে না। কিন্তু অপবাদের ন্যায় শোনা গেলেও সত্য সত্যই আমাদের বিবাহিত জীবন একেবারে রোমান্স-বিহীন। তীব্র প্রেমে যে নায়ক-নায়িকা প্রাণবিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল, বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া বিবাহে তাহাদের মিলন সংঘটিত হইবার অল্পদিন পরেই তাহাদের প্রেমের তীব্রতার পরিসমাপ্তি ঘটে; তাহারা অতঃপর কর্দ্দমাক্ত সংসার-পথে নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধে প্রেম ও কবিত্ব-বিহীন জীবনের ঠেলা-গাড়ী ঠেলিতে থাকে: ইহাই আমাদের বিবাহিত জীবনের সাধারণ ইতিহাস।

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিয়া আমাদের বিবাহিত জীবনকে রোমান্স ও কবিত্বপূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে কলারূপে প্রেমের চর্চ্চা

করিতে হইবে। বাগান অরণ্যের মত প্রকৃত নয় সত্য, কিন্তু কৃত্রিম বাগানকে কি মানুষ সুন্দর করে নাই? পরকীয়া প্রেমে অরণ্যের স্বাভাবিকত্ব থাকুক, কিন্তু বিবাহিত প্রেমকে আমাদের বাগানের সৌন্দর্য্য দান করিতে হইবে। যতই কৃত্রিম হৌক তাহাতে আমরা পরকীয় প্রেম-রূপী অরণ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিব, কিন্তু তাহার হিংস্রজন্তু আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

এতদ্ব্যতীত এমন সব ব্যাপারে দাম্পত্য-জীবনের সুখের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠিতে থাকে, যাহা অপরের চক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হইতে পারে। প্রেম-পত্রের কথাই ধরা যাউক। দীর্ঘ-দীর্ঘ প্রেম-পত্র অপরের নিকট হাস্যকর বাড়া-বাড়ি মনে হইতে পারে, দম্পতির উভয়ের জ্ঞাত-সারেই তাহাতে অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে, তবু ঐ সমস্ত প্রেম-পত্রের মূল্য অনেক-খানি। ঐ সমস্ত পত্রের অতিশয়োক্তি উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়কে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ট করিয়া তুলিবে।

প্রীতি-স্থাপনের কতিপয় উপকরণ

জন্ম-তিথি, পূজা-পার্ব্বণ, ঈদ ইত্যাদি পর্ব্ব উপলক্ষে পরস্পরকে উপহার দেওয়া, নিজেদের বিবাহ-দিবসকে স্মরণীয় করিবার চেষ্টা করা উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি ও মমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পূজা বা ঈদের দিন যদি স্বামী তাহার সাধ্যগত অর্থব্যয় করিয়া একটী শাড়ী বা গহনা লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে কিম্বা জন্ম বা বিবাহ-তিথির দিনে স্বামী গৃহে প্রবেশ মাত্র স্ত্রী যদি একটী ফুলের মালা গলায় দিয়া কিম্বা একটী নূতন সিলাই-করা রুমাল হাতে দিয়া বলে 'জন্মদিনের উপহার,' তবে তাহাতে উহাদের সম্বন্ধ কতই-না মধুরতর হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কেবল ভালবাসিলেই চলিবে না। ভালবাসা দেখাইতে হইবে। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা যে, ভুল বুঝিবার দোষে বহু বন্ধুত্ব টুটিয়া গিয়া থাকে। মানুষের মন দৃশ্য-বস্তু নহে। সুতরাং মনে মনে ভালবাসা থাকিলেও যাহাকে ভালবাসি তাহার পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নহে। ভালবাসা প্রদর্শিত না হইবার ফলে তাহার মনে অভিমানের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া অভিমান হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ঘৃণা, ঘৃণা হইতে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা হইতে শত্রুতা জন্মগ্রহণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে তাহার সেই মনোভাব একটীর পর একটী অপরের মনেও সংক্রমিত ও প্রতিফলিত হইতে পারে। ভালবাসা প্রদর্শনের অভাবই সমস্ত ভুল বুঝার মূল কারণ। পক্ষান্তরে প্রদর্শিত ভালবাসার মধ্যে যদি খানিকটা বা ষোল-আনা কৃত্রিমতাও থাকে, তবে ভালবাসার পাত্র হইতে অকৃত্রিম ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া ক্রমে আমার কৃত্রিম প্রেমকে অকৃত্রিম প্রেমে উন্নীত করিতে পারে।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা দাম্পত্য-জীবনে সুখের অন্যতম ভিত্তি। স্ত্রীকে যতই মূর্খ মনে করা হউক না কেন, সকল কাজে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় সাংসারিক শান্তি ও দাম্পত্য-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। বৈষয়িক ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে যত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিবে, স্ত্রীও তাহাদের বৈষয়িক ব্যাপারে ততই উদাসীন হইয়া পড়িবে।

সামান্য ব্যাপারে খিট্‌-খিটে হওয়া দাম্পত্য-সুখের অনুকূল নহে। হলদে শাড়ীর বদলে চাঁপা রঙের শাড়ী আনিলেই যদি স্ত্রী মেজাজ দেখায়, কিম্বা তরকারীতে বেগুনের বদলে সীম দিলেই যদি স্বামী রাগ

করিয়া বসে, তবে সে দম্পতির জীবন কদাচ সুখের হইতে পারে না। ফলতঃ সে সমস্ত ব্যাপার উপেক্ষা করিলে কোনও বিশেষ গোলমাল হয় না, সে সব ব্যাপারে পরস্পরের ত্রুটী-বিচ্যুতি সহিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শোকে সান্ত্বনা ও দুঃখে শান্তি দান করা দম্পতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিরাট কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে সমাজ ব্যবস্থার ফলে দুঃখ-কষ্টের চাপ পুরুষের উপর দিয়াই যায় বেশী। কিন্তু শিক্ষার অভাবে নারী তেমন অবস্থায় পুরুষকে যথোপযুক্ত সান্ত্বনা দিতে পারে না। পক্ষান্তরে চীৎকার, কান্না-কাটি ও সোর-গোল করিয়া পুরুষের বিপদের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেয়।

জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছেই, থাকিবেই—কিন্তু সেগুলি সহ্য করিবার জন্য আমাদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমার যে বিপদ হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদ হইতে পারিত। 'অন্ধকারের পরেই আলোক আসিবে', 'দুঃখের পরেই সুখ' এই সমস্ত মহাজন-বাক্য ও প্রাকৃতিক সত্য আমাদিগকে গুরুতর বিপদেও সান্ত্বনা দান করিতে পারে। বিপদে এলাইয়া পড়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার মোটেই অনুকূল নহে। বুদ্ধিমতী স্ত্রী এই ধরণের কথা বলিয়া বিপদ-চঞ্চল-স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

স্ত্রী বস্তুতঃই স্বামীর গৃহিণী, সে গৃহের "লক্ষ্মী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী"। স্বামী যতই উপার্জ্জন করুক, স্ত্রী যদি মিতব্যয়ী ও সুগৃহিণী না হয়, তবে হয় সংসার বিশৃঙ্খল ও বাড়ী-ঘর কদর্য্য থাকিবে, না হয় চরম বিলাসিতায় দারিদ্র্য দেখা দিবে। এরূপ অবস্থায় স্বামী সংসার পরিচালনার ভার

নিজে হাতে রাখিতে পারে; কিন্তু তাহাতে স্বামীর অন্যান্য কর্ম্ম ব্যাহত হয়, এবং স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস সূচিত হয়। ইহা দাম্পত্য-সুখের অনুকূল নহে! যে কোনও কারণেই হউক, যে স্বামী স্ত্রীকে সিন্ধুকের চাবি দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, সে স্বামীর প্রতি স্ত্রীরই বা শ্রদ্ধা হইবে কেন? শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের যেখানে অভাব সেখানে কদাচ প্রেম জন্ম-পরিগ্রহ করিতে পারে না।

নবম অধ্যায়

দম্পতির রতি-জীবন

সঙ্গমে তৃপ্তি—ক্রিয়া মাত্রের দুইরূপ—সাধারণরূপ ও কলারূপ—কলারূপে রতিক্রিয়া—যৌন উপগমন—প্রাণী-জগতে শৃঙ্গার—মানুষের মধ্যে শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা—অসভ্য জাতি সমূহে শৃঙ্গার—নারীর ঋতুস্রাবের অর্থ—যৌন প্রদেশের গোপনীয়তা ও শৃঙ্গার—শৃঙ্গারে রুচিভেদ—আনন্দে সংস্কারের স্থান—আনন্দে ব্যক্তিগত রুচির স্থান—শৃঙ্গারে ভগাঙ্কুর—চৌষট্টী শৃঙ্গার—পুরুষের যৌন-জড়তা—নারীর যৌন-ঔদাসীন্য—সঙ্গমের দৈহিক পরিক্রমণ—রতি-পুলকের গভীরতা ও বিস্তৃতি—সঙ্গমের বিভিন্ন স্তর—সঙ্গম শেষে—ষ্টোপসের দৃষ্টান্ত—আসন—অভিনবত্বের প্রয়োজন—আসনের বিভিন্নতার দৈহিক প্রয়োজন—১৫১ আসন—পরিমাণ ও ব্যবধান—সার্ব্বজনীন বিধি অসম্ভব—পুলকাবেগ—রতিকালের স্থায়িত্ব—বীর্য্যস্তম্ভনের যৌগিক সাধনা—নিষিদ্ধ সঙ্গম—গর্ভাবস্থায় রতিক্রিয়া—দিবসে রতিক্রিয়া—রতিকৃষ্টি—ত্বকচ্ছেদ—যৌনকেশ মুণ্ডন—রতিশক্তির যৌগিক প্রক্রিয়া—যৌগিক প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি—ঔষধপ্রয়োগে রতিকৃষ্টি—রতিক্রিয়ায় নারীর স্তন—।

ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌সের মতে সঙ্গমে তৃপ্তি বিবাহিত জীবনের সুখের জন্য কত প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রতি-

সঙ্গমে তৃপ্তি

ক্রিয়াকে সংসার বিরাগীরা যতটা জঘন্য দৈহিক কার্য্য মনে করিয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে প্রেম-সঞ্জাত রতিক্রিয়া ততটা জঘন্যও নহে, ততটা নিছক দৈহিকও নহে। সত্য বটে, যেখানে রতিক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী আসঙ্গ-লিপ্সার ফল, যেখানে রতি-ক্রিয়ার পশ্চাতে গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক সহানুভূতি বিদ্যমান নাই, সেখানে রতি-ক্রিয়া দৈহিক-ক্রিয়া মাত্র, সেখানে ঐ কার্য্যের সহিত অন্তরের সত্যিকার কোনও যোগ নাই। কিন্তু রতি-ক্রিয়া যেখানে ভালবাসা-

সঞ্জাত, রতি-ক্রিয়া যেখানে প্রেম-কল্পিত দৈহিক উচ্ছাস, রতি-ক্রিয়া সেখানে দৈহিকের চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক। সেখানে দুইটী প্রণয়ী-আত্মা নিজেদের দৈহিক পার্থক্য ভুলিয়া একাত্ম ও এক-দেহ" হইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টা করে মাত্র। পবিত্র প্রেম-সঞ্জাত ও দৈহিক-ক্ষুধা-সঞ্জাত রতি-ক্রিয়ার মধ্যে যে জাজ্জল্যমান পার্থক্য বিদ্যমান ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্‌ তাঁহার 'এণ্ডিওরিং প্যাশান' নামক গ্রন্থে তাহার সুন্দর প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রতি-ক্রিয়া যেখানে দৈহিক প্রয়োজনের ফল মাত্র, যেখানে রতি-ক্রিয়ার শেষে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি একটা অপ্রীতি এমন কি ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু রতি-ক্রিয়া যেখানে ভালবাসা-সঞ্জাত, সেখানে নর-নারী রতি-ক্রিয়ার পরও একটা আত্মিক একত্ব বোধ করিয়া থাকে এবং তাহারা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া সুখদায়ক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে সঙ্গমে তৃপ্তিলাভ না করিলে স্ত্রীর ভালবাসা স্থায়ী হইতে পারে না, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দিয়া অসুখী দম্পতিকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলেরই ক্ষতি হইবে, কারণ তাহাতে ভণ্ডামী ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মাত্র।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষের আত্মা বা দেহ ছাঁচে ঢালাই করা জিনিষ নহে যে, দুইটী দেহ বা আত্মা খাপে-খাপে মিলিয়া যাইবে। সুতরাং দুইটী নর-নারী পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ যৌন-সামঞ্জস্য লাভ করিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। কাজেই সঙ্গমে তৃপ্তি খুব সুলভ হইবার কথা নহে। নহে বলিয়াই ইহা সাধনার বস্তু। এই সাধনাই

বিবাহ-জীবনকে সুন্দর করিয়াছে, এবং তাহাকে আধ্যাত্মিকরূপ দান করিয়াছে।

আমাদের প্রত্যেক দৈহিক কার্য্যের দুইটী রূপ আছে, একটী কলারূপ আর একটী সাধারণ রূপ। জীবনধারণের জন্য আহার্য্য-দ্রব্য ভক্ষণ, খাওয়ার সাধারণ রূপ। কিন্তু সেই খাদ্যদ্রব্যকে বিভিন্ন পাক-প্রণালী দ্বারা নানাপ্রকার মুখ-রোচক সুস্বাদু আহার্য্যে রূপান্তরিত করিয়া ভক্ষণ করার নাম কলারূপে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুধকে রসগোল্লা-সন্দেশ, চাউলকে পিষ্টকে ও আঙ্গুরকে মদ্যে পরিণত করিয়া আহার করার কথা বলা যাইতে পারে। ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলিবার শক্তি আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। গদ্যে কথা বলাই আমাদের সে শক্তির সাধারণ ব্যবহার। কবিতায় কথা বলা তাহার কলারূপ; সঙ্গীত তাহার অধিকতর উন্নত কলারূপ। নৃত্য আমাদের হাঁটার কলারূপ।

ক্রিয়ার দুইটী রূপ সাধারণ রূপ ও কলারূপ।

সেইরূপে সঙ্গমেরও সাধারণ রূপ ও কলারূপ আছে। রতি-ক্রিয়া সাধারণরূপ নিতান্ত দৈহিক কার্য্য—দম্পতির আঙ্গিক মিলন মাত্র। এই কার্য্য নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মতও সম্পাদিত হইতে পারে; আবার নানা-প্রকার পুলক-দায়ক কল-কৌশলের সঙ্গেও সম্পাদিত হইতে পারে। মানুষ তাহার উদ্ভাবনী-শক্তির প্রয়োগ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়কে যথাসম্ভব অধিক সুখদান করিবার জন্য অন্যান্য সমস্ত দৈহিক ক্রিয়াকে যেমন কলারূপে রূপায়িত করিয়াছে, সঙ্গম-ক্রিয়াকেও তেমনই সম্পূর্ণ রূপ দিয়াছে।

তৃপ্তিকর রতি-ক্রিয়াকে যদি আমরা স্থায়ী প্রেমের ভিত্তি বলিয়া

স্বীকার করিয়া লই, তবে রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা না করিয়া উপায় নাই। অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম্ম-ক্ষমতাকে আয়ত্ত্বাধীন করিতে পারি, একথা প্রমাণের জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম, ডন, কস্‌রতের দ্বারা মানুষ স্বীয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে কেমন অদ্ভুতরূপে আয়ত্তাধীন কারিতে পারে, আমরা প্রত্যহ তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইতেছি। সুতরাং অভ্যাস ও চর্চ্চার দ্বারা আমরা আমাদের যৌন-ক্ষমতাকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি, একথা একরূপ অবধারিত। ব্যায়াম কস্‌রতের দ্বারা আমাদের অঙ্গের বিভিন্ন অংশকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদের শক্তি প্রদর্শন করা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য নহে; তবু যখন ঐ সমস্ত ডন-কস্‌রত সমাজে ও রাষ্ট্রে সমাদৃত হইতেছে, তখন যে অঙ্গের সদ্ব্যবহারের উপর মানুষের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, সে অঙ্গের ব্যবহার-বিধির কলারূপে কেন চর্চ্চা হইবে না, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নাই।

কলারূপে রতিক্রিয়া

শুধু তাহাই নহে। রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করা কতিপয় কারণে অত্যাবশ্যক।

প্রথমতঃ, দম্পতির উভয়ের রতি-বাসনার তীব্রতা সমান না হইবারই সম্ভাবনা বেশী। অভ্যাসের দ্বারা উভয়ের রতি-বাসনার মধ্যে সমতা সাধন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষের কাম-কেন্দ্র অপেক্ষা নারীর কাম-কেন্দ্র সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর বিস্তারিত বলিয়া নারীর কাম-বাসনা ধীরে ধীরে

জাগ্রত হয়। অভ্যাসের দ্বারা দম্পতির কাম-বাসনার মধ্যে সমতা বিধান না করিলে নারীর পুলক-প্রাপ্তির বহু পূর্ব্বেই পুরুষের শুক্র-স্খলন হইয়া যায়, এবং নারী অতৃপ্ত ও নিরানন্দ থাকিয়া যায়। ইহাতে দাম্পত্য জীবন ত নিরানন্দ হয়ই, উপরন্তু নারী হিষ্টিরিয়া, শ্বেত-প্রদর প্রভৃতি জটীল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ রতি-ক্রিয়ায় নারী স্বভাবতঃ কর্ম্ম ও পুরুষ স্বভাবতঃ কর্ত্তা বলিয়া রতি-ক্রিয়ার প্রারম্ভে উভয়ের মনোভাবের পার্থক্য ও বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থা নারী-জাতীর এই কর্ম্মত্বকে এতটা দৃঢ়মূল করিয়া দিয়াছে যে, নারী সভ্যতা ও ধর্ম্ম-ভাবানুযায়ী স্বীয় নারীত্বকে সতীত্বে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য রতি-ক্রিয়ায় একটা কৃত্রিম ঔদাসীন্য অভ্যাস করিয়াছে। এই কৃত্রিম ঔদাসীন্য নারী-চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে উহার ফলে পুরুষের অসহিষ্ণু মন অনেক সময় নারী-জাতিকে ভুল বুঝিয়া থাকে। মহিলা যৌন-বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ তাঁহার 'ম্যারেড লাভ' নামক গ্রন্থে অতি চমৎকার-রূপে নারী-মনের এই-দিকটার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রকাররা সকলে পুরুষ বলিয়া নারী-চরিত্রের এই দিকটা কেহ সহানুভূতির সহিত আলোচনা করেন নাই। নারীর দৈহিক প্রয়োজনীয়তার দিকে পুরুষ এতটা কম দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে যে পুরুষ নারীর মধ্যে কামভাব জাগ্রত না করিয়াই স্ত্রীর নিকট সহানুভূতি আশা করিয়া থাকে। ডাঃ ষ্টোপস্ এ বিষয়ে একটী সত্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এক রমণীকে তাঁহার স্বামী অতিশয় ভালবাসিতেন; বাড়ী হইতে বাহির হইবার ও বাড়ীতে ফিরিবার সময় চুম্বন করিতেন।

এত ভালবাসা সত্ত্বেও সেই রমণী রতি-ক্রিয়ায় আনন্দ ও পুলক অনুভব করিতেন না। মহিলাটী অনেক চিন্তা করিয়াও ইহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই। মহিলার স্বামী মহিলার গণ্ডদেশ ব্যতীত আর কোনও অঙ্গে কখনও চুম্বন করেন নাই। একদিন রতিক্রিয়ার সময় ঘটনাক্রমে স্বামীর ওষ্ঠদ্বয় স্ত্রীর স্তনে লাগিয়া যায়। ইহাতে স্ত্রীর দেহে অব্যক্ত অনুভূতির-শিহরণ জাগিয়া উঠে। তিনি স্বামীর মুখ স্বীয় স্তনে চাপিয়া ধরেন, স্বামীও স্ত্রীর স্তনে চুম্বন করেন। মহিলাটী সেইদিন রতি-ক্রিয়ায় এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় পুলক অনুভব করেন। এই দৃষ্টান্ত হইতে ডাঃ ষ্টোপস্ ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পুরুষ নারীদেহে রতি-বাসনা জাগ্রত না করিয়াই তাহার দেহ ব্যবহার করিতে চাহে এবং ফলে যথোপযুক্ত প্রতিধ্বনি না পাইয়া নারীর উপর দোষারোপ করে। নারী-চরিত্রের এই জটীলতার জন্যও নারী-পুরুষ উভয়কেই কলারূপে রতিক্রিয়ার চর্চ্চা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ এমন অনেক পুরুষ আছে, যাহাদের রতি-ক্ষমতা এত বেশী যে, তাহারা যে কোনও নারীর জীবন দুঃখময় এমন কি বিপন্ন করিতে পারে। রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করিয়া এই শ্রেণীর পুরুষও স্বীয় রতি-শক্তিকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিতে পারে যে, নিজের এবং নিজের স্ত্রীর দেহের কোনও অনিষ্ট না করিয়াও উভয়ের তৃপ্তিজনকভাবে রতি-ক্রিয়া করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ এমন অনেক পুরুষ আছে, যাহাদের রতি-শক্তি এত কম যে, তাহারা স্ত্রীর অতিশয় ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে পারে না। ইহারা যে একেবারে সামর্থ্যহীন, তাহা নহে। মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বৈগুণ্যেই

ইহাদের রতি-শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। রতিক্রিয়াকে কলারূপে সাধনা করিয়া ইহাদের জীবন সুখের করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ এমন অনেক পুরুষ আছে যাহাদের অঙ্গ এত স্থূল ও দীর্ঘ যে, যে কোনও নারীর পক্ষে উহা কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই শ্রেণীর পুরুষের বর্ণনা করিয়াছি। পক্ষান্তরে এমনও অনেক পুরুষ আছে যাহাদের অঙ্গ অতিশয় ক্ষুদ্র। ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্‌ডি তাঁহার "আইডিয়াল ম্যারেজ" নামক গ্রন্থে নারী পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপযোগিতার কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে ক্ষুদ্র লিঙ্গে প্রশস্ত-যোনি নারীর অঙ্গে পুলকের স্পন্দন অনুভূত হইবে না। ইহাতে যৌন-ক্রিয়া নিতান্তই একতরফা হইবে। কিন্তু কলারূপে রতিক্রিয়ার চর্চ্চা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নারী-পুরুষকে রতি-ক্রিয়ায় অতৃপ্ত রাখিতে পারে না। রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা না করিয়া মানুষ বুঝিতেই পারিবে না যে, ব্যবহারের বিভিন্নতা রতি-ক্রিয়াকে কত পুলক-প্রদ ও আনন্দদায়ক করিয়া থাকে।

সপ্তমতঃ রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা না করিয়া নির্ব্বোধ পশুর মত দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রতি-ক্রিয়া করিলে পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার হইয়া নারীর দেহ ও স্বামীর সংসারকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। ইহার প্রতীকারার্থ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য রতি-ক্রিয়ায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর আমাদের ষোল আনা প্রভাব ও ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা চাই। রতি-চর্চ্চা ব্যতীত এই ক্ষমতা-লাভ সম্ভব নহে।

অষ্টমতঃ আমাদের ইন্দ্রিয় ও শুক্রের উপর আমাদের যথেচ্ছ ক্ষমতা না থাকিলে আমরা ব্রহ্মচর্য্য-পালনের দ্বারা শুক্র-ধারণ করতঃ শরীর রক্ষা

করিতে পারি না। সেজন্য আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করা প্রয়োজন।

সংক্ষেপতঃ কলারূপে চর্চ্চা ও অভ্যাসের দ্বারা রতি-ক্রিয়াকে আমাদের ইচ্ছাধীন করার উপরই আমাদের দৈহিক ও জাগতিক কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রতি-ক্রিয়ার ন্যায় মানব-জীবনের এমন তীব্র ও প্রধানতম বৃত্তির ব্যাপারে আমরা অন্ধভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি না। এই জটীলব্যাপারে আমরা অন্ধ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াও বসিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং অন্যান্য শ্রেণীর দেহ-চর্চ্চার ন্যায় দম্পতিকে রতি-ক্রিয়া সম্বন্ধেও সবিশেষ সাধনা করিতে হইবে।

রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করিবার বিষয়টী এত জটীল, প্রয়োজনীয় এবং বিস্তৃত যে আমরা স্বতন্ত্রভাবে উহার আলোচনা করিব। এই অনুচ্ছেদে আমরা কেবল উহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করিলাম। এলিস্, ফ্রয়েড্, হ্যামিল্টন প্রভৃতি সমস্ত যৌন-বৈজ্ঞানিক রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

রতি-ক্রিয়ার প্রাথমিক অধ্যায়কে যৌন-উপগমন বা শৃঙ্গার বলা যাইতে পারে। প্রাণী জগতের প্রায় সকল স্তরের রতিক্রিয়াতেই বিরুদ্ধ-লিঙ্গের দুইটী প্রাণীর প্রয়োজন হয়। দুইটী প্রাণীর যৌন-বোধ বা রতি-বাসনা একই সময়ে সমভাবে জাগরূক হওয়া আশা করা যাইতে পারে না। সেজন্য উভয়ের মধ্যে সমান-বাসনা সৃষ্টির জন্যই শৃঙ্গার বা উপগমনের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যৌন-উপগমন বা Conjugal flirtation

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বিভিন্নরূপে শৃঙ্গার হইয়া থাকে। আবার এক মানব জাতির মধ্যেই বিভিন্ন জাতি বা সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে ও অভিনব প্রক্রিয়ায় শৃঙ্গার কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যথা স্থানে সেই সমস্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইবে। এ অনুচ্ছেদে কেবল যৌন-উপগমনের দৈহিক প্রয়োজনীয়তার কথাই বিবৃত হইবে।

শৃঙ্গার প্রাণীসমূহের মনে রতি-বাসনার ক্রম-বিকাশের উপায় মাত্র। প্রাণী-জগতে জন্তু-সমূহের মধ্যেকার শৃঙ্গার-প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

প্রাণীজগতে শৃঙ্গার

তন্মধ্যে আবার পাখী জাতির শৃঙ্গারই সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। পাখীর শিখা-উত্তোলন, সঙ্গীত, নৃত্য, ও পায়তারা প্রভৃতি শৃঙ্গারের অংশ মাত্র। এইভাবে উহারা তাহাদের স্ত্রী জাতির মধ্যে রতি-বাসনা জাগরূক করিয়া থাকে।

এই শৃঙ্গারের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে যদি আমরা একটী বিষয় অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করি। তাহা হইতেছে এই যে, অধিকাংশ প্রাণীর যৌন-বোধ পর্য্যায়শীল। যদি প্রাণী সমূহের যৌন-বোধ পর্য্যায়শীল ও সাময়িক না হইত, তবে শৃঙ্গারের কোনও প্রয়োজন হইত না।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিলাসী, নিষ্কর্ম্ম্য, অপরিশ্রমী ও বিরামভোগী হইয়াছে। তদুপরি মানুষের শক্তি-বর্দ্ধক আহার্য্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কতকটা স্বভাবতঃই আবার

মানুষের মধ্যে শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা

কতকটা অভ্যাসের দ্বারা মানুষ যৌন-বোধ ও রতি-শক্তিকে অনেকখানি নিজের ইচ্ছাচালিত করিতে

সমর্থ হইয়াছে। সেজন্য রতি-ক্রিয়ায় মানুষের শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে রতি-শক্তিতে যে যতটা শক্তিশালী, শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা তাহার ততটা কম। কারণ ইচ্ছামাত্র তাহার অঙ্গ রতিক্রিয়ার উপযোগী হইয়া উঠে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মোটা-মুটি এ কথার মধ্যে কতকটা সত্য থাকিলেও, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা যে, রতি-ক্রিয়ায় যাহারা খুব অভ্যস্ত নহে, তাহারা অত্যধিক শৃঙ্গার ব্যতীত রতি-ক্রিয়া করিতে পারে না; আবার শৃঙ্গারের দ্বারা উত্তেজনা হাসিল করিয়া তাহারা ঐ কার্য্যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

অসভ্য জাতিসমূহে শৃঙ্গারের আবশ্যকতা

মানুষের মধ্যে সভ্যতায় অনুন্নত জাতিসমূহ সভ্য জাতিসমূহের মত রতি-ক্রিয়াশীল নহে। তাহারা পশু-পক্ষীর মত রতি-ক্রিয়ায় সময় পালন করিয়া থাকে। সেজন্য পশুর মত অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে রতি-ক্রিয়ায় শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা আজিও বিদ্যমান আছে। গরু, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে আমরা রতি-ক্রিয়ায় সময়-পালন লক্ষ্য করিয়া থাকি। এক নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত ইহারা অন্য সময় কিছুতেই রতি-ক্রিয়া করে না। বৎসরের অন্য সময়ে উহাদের যৌন-বোধ একেবারে সুপ্ত থাকে। বৎসর ঘুরিয়া রতি-ক্রিয়ার সময় আসা মাত্রই উহারা দৈহিক-প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু উহাদের রতি-ক্রিয়া প্রধানতঃ দৈহিক ব্যাপার বলিয়া উহাতে শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক।

নবম অধ্যায়

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা কৃত্রিম উপায়ে স্বীয় যৌন-বোধকে স্থায়ী করিয়া ফেলিয়াছে এবং কাজেই শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তাকে অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের যৌন-বোধও যে সাময়িক এবং তাহাই যে প্রকৃতির অভিপ্রেত, তাহার প্রমাণ নারী-জাতির ঋতুস্রাব। এই হিসাবে স্ত্রীজাতি পশুজাতির আদিমতা মানিয়া চলিতেছে। অধিকাংশ যৌন-তত্ত্ববিৎগণ এ বিষয়ে একমত যে ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরেই নারী-জাতির রতি-বাসনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নারীজাতির এই ঋতুস্রাবটা কি? আগেকার দিনে মানুষের ধারণা ছিল যে, নারীর ঋতুস্রাব নারীর শরীরের উপর চন্দ্রের প্রভাবের ফল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধানের দ্বারা এই মতবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর্থেনিয়াস ও মানরে ফক্স্ প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, নারীর ঋতুস্রাব নারীদেহের উপর বৈদ্যুতিক প্রভাবের ফল! ইঁহাদের অনুসন্ধানের ফল এই যে, সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রত্যেক ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর আবহ-বিদ্যুতের গতিতে একটা কম্পন আসে; এই কম্পনের প্রভাবে নারী-দেহে ঋতুস্রাবরূপী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দেখা যায়, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চন্দ্রের ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে। কাজেই উক্ত পরিবর্ত্তন যে চন্দ্রের প্রভাব নহে, একথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। ফলে উক্ত মত-ভেদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রভেদ আছে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ঋতুস্রাবের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক মত আমি তৃতীয় অধ্যায়ে দিয়াছি।

নারীর ঋতুস্রাব

ঋতুস্রাবের দৈহিক কারণ যাহাই হউক, উহা যে নারী জাতির রতি-ক্রিয়ার সময়-জ্ঞাপক, ইহা একরূপ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। নারীর মধ্যে যদি রতি-ক্রিয়ার মানসিকতা মানিয়া লইতে হয়, তবে পুরুষের মধ্যে উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনও বিজ্ঞান-সম্মত কারণ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, মানুষের মধ্যে আজিও শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান আছে এবং অল্প-বিস্তর সকল জাতির সকল ব্যক্তির মধ্যেই শৃঙ্গারের প্রচলন আছে। তবে ব্যক্তি ও অভ্যাস-ভেদে শৃঙ্গারের দীর্ঘতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। একজনের পূর্ণ রতি-বাসনা ও শক্তি লাভের জন্য যেস্থলে আধ ঘণ্টা শৃঙ্গারের প্রয়োজন হইতে পারে, সে স্থলে আর এক জনের এক মিনিটে সে শক্তি লাভ হইতে পারে।

যৌন প্রদেশের গোপনীয়তা শৃঙ্গারের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া আগেকার লোকের ধারণা ছিল। এই ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে।

যৌন প্রদেশের গোপনীয়তা ও শৃঙ্গার

সহ-কর্ম্মীর যৌন-প্রদেশ দর্শন-স্পর্শনাদি শৃঙ্গারের অংশ বিশেষ। সুতরাং ঐ সমস্ত অঙ্গ যদি চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে এবং উহারা যদি সর্ব্বদাই স্পর্শের জন্য সহজলভ্য হয়, তবে শৃঙ্গারে উহাদের উপযোগিতা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। শিশুদের—বালক বালিকার—উলঙ্গ শরীর দেখিলে লোকের কামভাব না জাগিবার কারণও ইহাই। যে সমস্ত অসভ্য জাতি উলঙ্গ থাকে, কিম্বা জার্ম্মাণী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যে সমস্ত উলঙ্গবাদী নারী-পুরুষের গুপ্ত-অঙ্গ সমূহকে পরস্পরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া বেড়ায়, তাহারাও রতি-ক্রিয়ায় শৃঙ্গার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু

দর্শনজাত-শৃঙ্গার যে তাহাদের মধ্যে ততটা ফলদায়ক হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ইহা ব্যতীত অন্য দুইটী কারণে রতি-ক্রিয়ায় শৃঙ্গারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই দুইটী কারণের একটী পুরুষের যৌন-জড়তা, ও নারীর যৌন-ঔদাসীন্য। রতিক্রিয়ায় পুরুষের অংশ সকর্ম্মক বলিয়া এই কার্য্যে পুরুষের সক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ক্ষমতার অভাবকেই ধ্বজভঙ্গ বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লিঙ্গোত্থানের অভাবই ধ্বজভঙ্গ বটে, কিন্তু লিঙ্গোত্থান থাকা সত্ত্বেও পুরুষের আংশিক ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে। যথা, অনেক পুরুষের লিঙ্গোদ্রেক হইলেও শুক্র-তারল্য-হেতু বা অন্য কারণে তাড়া-তাড়ি শুক্র স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ অসাময়িক শুক্র-স্খলনহেতু এই শ্রেণীর পুরুষগণ নারীকে যৌন-আনন্দ-দানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এতদ্ব্যতীত এমনও অনেক পুরুষ দেখা যায়, যাহারা বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় রতি-ক্রিয়ায় সমর্থ হইলেও অবস্থা-ভেদে অক্ষম হইয়া পড়ে। নিজের স্ত্রীর সহিত বা বিশেষ পরিচিত নারীর সহিত সঙ্গমে সক্ষম হইলেও অনেক নূতন বা অপরিচিত নারীর সহিত ইহারা সঙ্গমে সম্পূর্ণ অক্ষম। প্রসিদ্ধ যৌন-বৈজ্ঞানিক হার্সফিল্ড (Hirschfeld), এ্যাব্রাহাম (Abraham), ভ্যাচেট (Vachet) প্রভৃতি অনেকে বলিয়াছেন যে, এমন পুরুষের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে, যাহারা যৌন-বৈকল্পিক প্রক্রিয়ার অবলম্বন ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে রতি-ক্রিয়া করিতে পারে না। ইঁহারা সকলেই একজন অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিকের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সে নিজের লিঙ্গে দড়ি জড়াইয়া এবং যৌন-অঙ্গ-লেহনাদি

পুরুষের যৌন-জড়তা

প্রক্রিয়াদি করিয়া তবে অনেকক্ষণে রতি-উত্তেজনা লাভ করিত। কাল, পাত্র ও অবস্থা-ভেদে পুরুষের রতি-শক্তির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এবং এই ব্যতিক্রম সময়-বিশেষে ধ্বজভঙ্গ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, ইহাতে দৈহিক ও মানসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। শারীরিক গঠন-প্রণালীর অসম্পূর্ণতা ও রোগ-জনিত স্বাভাবিক ধ্বজভঙ্গ ব্যতীত পুরুষ চাঞ্চল্য, ভীতি, অবসাদ, ক্লান্তি, শোক, ক্রোধ, ঘৃণা, মত্ততা প্রভৃতি অনেক দৈহিক ও মানসিক ক্ষণ-স্থায়ী কারণে সাময়িক-ভাবে ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে। এই সমস্ত সাময়িক কারণের অনেকগুলিই শৃঙ্গারের দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে।

পুরুষের ধ্বজভঙ্গের ন্যায় নারীর যৌন-জড়তা মানবের যৌন-আনন্দের একটী বড় পরিপন্থী। রতি-ক্রিয়ায় নারীর অংশ অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মক বলিয়া অসাবধান পুরুষের চক্ষে সাধারণতঃ নারীর এই যৌন-জড়তা ধরা পড়ে না এবং পড়ে না বলিয়াই অনেক-ক্ষেত্রে নারী কেবল পুরুষের ইচ্ছা-পূরণের কর্ত্তব্য-সাধন হিসাবে রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক-ক্ষেত্রে রতি-ক্রিয়া নারীর পক্ষে তিক্ত ও জবরদস্তী-মূলক অত্যাচার বিশেষ। এই অবস্থা যে দাম্পত্য-সুখের অনুকূল নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। রতি-ক্রিয়ায় নারীর এই জড়তা ও ঔদাসীন্য সম্বন্ধে আধুনিক রুশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশেষ গবেষণা হইয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণায় নারীর যৌন-জড়তার অনেক মূল্যবান তথ্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ যৌন-বৈজ্ঞানিক ডাঃ ষ্টিকেল (Stekel) নারী জাতির যৌন-জড়তার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

নারীর যৌন-জড়তা ঔদাসিন্য

ইঁনিও নারীর জড়তার বহু সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের গবেষণার ফল এই যে, শতকরা ৫০ জন নারীই রতি-ক্রিয়ায় বিশেষ জড়-ভাবাপন্ন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা অতিশয়োক্তি, এবং উক্ত গবেষণার মূলে ক্রটী রহিয়াছে। ডাঃ নরম্যান হেয়ারের সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সেক্সুয়াল নলেজ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে একটী সুন্দর উক্তি করা হইয়াছে। এই পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, সভ্যতা ও নারীর স্বাভাবিক লজ্জা ও শালীনতাহেতু এ বিষয়ে নারীর নিজস্ব উক্তিকে বৈজ্ঞানিক সূত্র-রূপে গ্রহণ করা নিরাপদ নহে; কারণ অনেক নারীই রতি-ক্রিয়ায় তাঁহাদের আগ্রহ ও আনন্দাতিশয্য গোপন করিয়া থাকেন এবং কৃত্রিম যৌন-জড়তাকে তাঁহাদের সতীত্বের-নিদর্শন মনে করিয়া থাকেন।

ডাঃ ষ্টিকেল প্রভৃতির প্রদত্ত সংখ্যায় আতিশয্য থাকিতে পারে, কিন্তু বহু নারী যে বস্তুতঃই রতি-ক্রিয়ায় জড়-ভাবাপন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রতি-জড় নারীগণকে তিনি মোটা-মুটি নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :

(১) সম্পূর্ণ রতি-জড়। এই শ্রেণীর নারীর রতি-বাসনাও নাই, এবং রতি-ক্রিয়ায় তাহারা আনন্দও পায় না।

(২) আংশিক রতি-জড়। এই শ্রেণীর নারীর রতি-বাসনা তীব্র নহে, কিন্তু শৃঙ্গারাদি দ্বারা রতি-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করাইতে পারিলে আনন্দ-লাভ করে।

(৩) বাসনাযুক্ত রতি-জড়। এই শ্রেণীর নারীর রতি-বাসনা খুব তীব্র। কিন্তু রতি-কার্য্যে বিন্দুমাত্র আনন্দ-লাভ করে না।

ডাঃ ষ্টিকেল এইভাবে রতি-জড় নারীকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকিলেও এই শ্রেণী-বিভাগকে সূক্ষ্ম-বিভাগ বলা যাইতে পারে না। কারণ এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট সীমা-রেখা টানা সম্ভব নহে।"

বিশেষতঃ যৌন-বোধের সম্যক অভাব কোনও নারীতেই সম্ভব হইবার কথা নহে। অবস্থা, শিক্ষা ও দৈহিক গঠন ভেদ হেতু নারীর রতি-বাসনার প্রভেদ হইতে পারে। কিন্তু নারীর যৌন-জড়তার জন্য প্রধানতঃ পুরুষই যে দায়ী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বহু পুরুষই কলা-পূর্ণ শৃঙ্গারাদি দ্বারা রতি-ক্রিয়ায় নারীর উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে এবং পুলকাবেগ-লাভে প্রবৃত্ত করিতে জানে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীদেহে কাম-কেন্দ্রের সংখ্যা বহু বলিয়া তাহার যৌন-বাসনা পুরুষ অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। সুতরাং কলাপূর্ণ শৃঙ্গরাদি দ্বারা তাহার কামোত্তেজনাকে কেন্দ্রীভূত করা পুরুষের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য-ক্রটীর জন্য প্রধানতঃ পুরুষই দায়ী বলিয়া বহু যৌন-বৈজ্ঞানিক বিশেষতঃ ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্‌ ও নরম্যান হেয়ার দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষতঃ ঋষি বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্রে' এবং কল্যাণমল্ল তাঁহার 'অনঙ্গ-রঙ্গে' এই জন্যই শৃঙ্গারের প্রতি এমন জোর দিয়াছেন। বিনা শৃঙ্গারে রতি-ক্রিয়াকে ইঁহারা বলাৎকার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুখের বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্য যৌন-বৈজ্ঞানিকগণের অনুকরণে ইদানীং শৃঙ্গারকে কলা-রূপে চর্চ্চা করিবার দিকে অবহিত হইয়াছেন।

নারীর কাম-কেন্দ্র বহু বিস্তৃত বলিয়া তাহার যৌন-উত্তেজনা জাগ্রত করিবার জন্য নানাপ্রকার শৃঙ্গারের প্রয়োজন আছে। একথা পাঠকগণ

পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা শৃঙ্গারের সম্যক ব্যাখ্যা নহে। মৈথুন-ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা সাধনোদ্দেশ্য ব্যতীত শৃঙ্গারের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা আছে। শৃঙ্গার নিজেই অফুরন্ত-আনন্দ ও পুলক দান করিয়া থাকে।

শৃঙ্গারে নারী-পুরুষ পরস্পরের দেহের সমস্ত অঙ্গই কাজে লাগাইতে পারে। কোন্ অঙ্গের শৃঙ্গার করিয়া কত-খানি পুলক লাভ করিতে পারে,

শৃঙ্গারে রুচিভেদ

তাহা অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক নারী-পুরুষই বুঝিয়া লইতে পারে। ব্যক্তিভেদে ইহার রূপ ও প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইবেই। ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতা ও রুচির বিভিন্নতা ব্যতীত সংস্কার ও শিক্ষা-সঞ্জাত কতকগুলি কৃত্রিম মনোবৃত্তি মানুষের শৃঙ্গার ও রতিক্রিয়াকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ফরাসী যৌন-সাহিত্যিক রেনী গাঁইও তদীয় "লা লেজিডিমোতি দ্যা অ্যাকটাস্ সেক্শুয়েল্স্" নামক বিখ্যাত যৌন-বিজ্ঞান গ্রন্থে মানুষের যৌন-কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, মানুষের অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার তাহার স্বাভাবিক যৌন-বাসনার সম্যক তৃপ্তি সাধনের কতকগুলি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পরের অঙ্গ-লেহন শৃঙ্গারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ এবং এইরূপ বিশেষ বিশেষ প্রণালীর শৃঙ্গারে দম্পতির একাত্মতা ও একদেহত্ব-জ্ঞান জন্মে। পরস্পরের প্রতি মমত্ব-বোধ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মানুষ কতকগুলি প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ ঘৃণার্হ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে।

মসিয়ে গাঁইও যাহাই বলুন, মানুষের আদিম মনোবৃত্তিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি বলিতে পারি না। মানুষের জন্ম-গত স্বাভাবিক যে

গুণ বা মনোভাব তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর শিক্ষা-গত যাহা-তাহাই অস্বাভাবিক সুতরাং নিন্দনীয়, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। মানুষের অনেক সদ্‌গুণ-রাজিই শিক্ষা-গত, কৃষ্টি-লব্ধ ও অভ্যাস-সম্ভাত। ঐ সমস্ত সদ্‌গুণকে মসিয়ে নিন্দা করিতে যদি রাজী না হন, তবে যে সমস্ত শিক্ষা-গত মনোবৃত্তি মানুষের যৌন-রুচিকে উন্নত ও সুন্দর করিয়াছে, তাহাদিগকে নিন্দা করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ?

আর যৌক্তিক হউক অযৌক্তিক হউক জোর করিয়া সংস্কার ভাঙ্গিয়া মানুষ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কারণ আনন্দ আগ্রহ-জাত।

আনন্দে সংস্কারের স্থান

কোনও কাজে আগ্রহ না থাকিলে অপরের নিকট তাহা যতই পুলকপ্রদ হউক না কেন, কর্ত্তা সে কাজ করিয়া আনন্দ পাইবে না। জ্ঞাতসারে মানুষ সংস্কারের বিরুদ্ধে খুব সুখাদ্যও খাইতে পারে না। শূকরের মাংসের বিরুদ্ধে যাহাদের সংস্কারগত বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ঐ মাংস খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহারা অতিশয় তৃপ্তির সহিত তাহা ভক্ষণ করিয়াছে ; কিন্তু খাওয়ার পর যেই মাত্র তাহাদের কাছে সত্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের উদ্গারের উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মানুষের রুচির উপর সংস্কারের প্রচণ্ড প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ডাক্তার ফোরেলও এই কথাই বলিয়াছেন যে এইরূপ চুম্বন বা লেহন পরস্পরের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর না হইলেও উহাকে অভ্যাসে পরিণত করা উচিত নহে।

ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচিই সর্ব্বাপেক্ষা

বড় উপদেষ্টা। যাহার যে বিষয়ে অভিরুচি ও প্রবল আগ্রহ অপরের পক্ষে যতই ঘৃণ্য ও অস্বাস্থ্যকর হউক না কেন, তাহার পক্ষে উহা মোটেই ঘৃণ্য ও অস্বাভাবিক নহে। হ্যাভলক এলিস ও ডাঃ ফ্রয়েড এই ধরণের কথাই বলিয়াছেন। এলিস বলিয়াছেন, প্রেমের আবেগ-সঞ্জাত কার্য্যকলাপকে সাধারণ ন্যায়-শাস্ত্রের যুক্তি দিয়া বিচার করা চলে না। সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান দিয়াও উহার বিচার হইতে পারে না। ফলতঃ মানুষকে এই সমস্ত প্রক্রিয়া শিখাইতে হয় না। মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতেই এ সমস্তের জ্ঞানলাভ করে। ডাঃ হ্যামিল্টন গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অধিকাংশ সুখী-দম্পতির মধ্যে বহু শৃঙ্গার-প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে; তবে লজ্জা বশতঃ অনেকে অনেকটা স্বীকার করেন না।

আনন্দে ব্যক্তিগত রুচির স্থান

নারীর ভগাঙ্কুর নারীর শ্রেষ্ঠতম কাম-কেন্দ্র এবং উহার ক্রীড়া ব্যতীত কোনও শৃঙ্গারই সম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। ডাঃ ব্রায়ন রবিন-সন বলিয়াছেন "নারীর ভগাঙ্কুর নারী দেহ-রূপী প্রাসাদের সদর দারস্থ বৈদ্যুতিক কলিং-বেল।" বৈদ্যুতিক কলিং-বেলে আঘাত করিলে যেমন সমস্ত প্রাসাদ ধ্বনিত হইয়া সমস্ত প্রাসাদবাসী সচকিত হয়, তেমনই ভগাঙ্কুরে আঘাত করিলে নারী-দেহের সমস্ত কাম-চৈতন্য মাথানাড়া দিয়া উঠে।

শৃঙ্গারে ভগাঙ্কুর

শৃঙ্গারের জন্য নারী-পুরুষ পরস্পরের কামকেন্দ্র সমূহের সম্যক-সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সমস্ত কাম-কেন্দ্রে রতি-বাসনাকে উত্তেজিত করিবার জন্য সহস্র উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাৎস্যা-য়নের কাম-শাস্ত্রে এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে চৌষট্টি ভাগে

চৌষট্টী শৃঙ্গার

বিভক্ত করা হইয়াছে। সেজন্য রতি-কার্য্যকে চতুঃষষ্টির-ক্রিয়া ! বলিয়া ভারতীয় সমস্ত যৌন-শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চৌষট্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে আলিঙ্গন, চুম্বন, লেহন, চুলকান, দংশন, উপবেশন ও দাঁড়ান প্রভৃতি আটটীই প্রধান। এই আটটী প্রক্রিয়ার আবার স্পর্শণ, ঘর্ষণ, প্রচাপন প্রভৃতি আটটী উপ-প্রক্রিয়া আছে। ইহার মধ্যে চুম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত। সাধারণতঃ মানুষ গালে, ঠোঁটে, গলায়, স্তনে চুম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু চুম্বন এতই বহুল প্রচারিত যে ইহার মধ্যে অভিনবত্ব না দিলে চুম্বন নিতান্তই যন্ত্রচালিতবৎ আবেগ-হীন কার্য্যে পরিণত হয়।

সঙ্গমের দৈহিক পরিক্রম।

রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে অধ্যায়ন ও চর্চ্চা করিতে হইলে রতি-ক্রিয়ার দৈহিক পরিক্রম বুঝিতে হইবে। ডাঃ ফোরেল Mechanism of coitus শীর্ষক অনুচ্ছেদে রতি-ক্রিয়ার যে দৈহিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার দিক হইতে উহাই আমাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি লিখিয়াছেন—নারী-পুরুষের আঙ্গিক-মিলনের পর উভয়ের বিশেষতঃ পুরুষের স্বচ্ছন্দ অঙ্গ-চালনা উভয়ের জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাতে পুরুষের লিঙ্গমণি ও স্ত্রীর ভগাঙ্কুরে কামোন্মাদনা সৃষ্টি হইয়া তাহা উভয়ের সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই উন্মাদনার চরম বিকাশে পুরুষের শুক্র স্খলন এবং নারীর তদনুরূপ পুলকানুভব হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারীর কামকেন্দ্র বহু। তন্মধ্যে তার ভগাঙ্কুরই প্রধান। ভগঙ্কুরের পরেই স্তনের বোঁট', ভগ-দেশ বিশেষতঃ কামাদ্রি এবং জরায়ু গ্রীবাকেই নারীর শ্রেষ্ঠ কামকেন্দ্র বলা যাইতে পারে।

রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের ন্যায় নারীর শুক্র-স্খলন হয় না। তবে শুক্র-স্খালনের সময় পুরুষ যে সার্ব্বাঙ্গিক আবেগ বোধ করে, রতি-ক্রিয়ায় নারীরও তেমনই তীব্র আবেগ-ময় একটী স্তর আছে। নারীর দেহে ও মনে যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে নারীর যোনিনালীর বিভিন্ন মাংস-গ্রন্থি হইতে একপ্রকার রস নিঃস্রাব হইয়া থাকে। এই উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যখন নারী-দেহের সর্ব্বত্র এক অব্যক্ত আবেগের সৃষ্টি হয় তখনই সে পুরুষের শুক্র-স্খালনের পুলকের অনুরূপ এক পুলক অনুভব করে। নারী-পুরুষের এই পারস্পরিক নৈকট্যের তীব্রতাই সন্তান-সৃষ্টির মূলীভূত-শক্তিশালী কারণ। এই উত্তেজনা শেষে নারী-পুরুষ উভয়ের দেহ পুলক-ভরে শিথিল হইয়া যায় এবং উভয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছি। তাহাতে পাঠক দেখিয়াছেন যে, রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করিবার দুইটা দিক আছে—একটী রতি-পুলকের গভীরতা, অপরটী রতি-পুলকের বিস্তৃতি। রতি-ক্রিয়ার গভীরতা দ্বারা আমি বুঝাইতে চাই এই যে, আমরা কি উপায় অবলম্বন করিলে রতি-ক্রিয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র পুলক-প্রদ করিতে পারি। আর রতি-ক্রিয়ার বিস্তৃতি অর্থ এই যে, কি উপায় অবলম্বন করিতে আমরা আমাদের সেই পুলক-প্রদ রতি-ক্রিয়াকে দীর্ঘদিন স্থায়ী করিতে পারি।

রতিপুলকের গভীরতা ও বিস্তৃতি

রতি-পুলকের গভীরতা লাভের জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে যাহা সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা হইতেছে, রতি-ক্রিয়ার একঘেয়েমী দূরীকরণ।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে দুইটী নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি শুধু বাধ্যতামূলক ও নীতিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তব্য-বোধে নহে, পরন্তু প্রেম ও আবেগপূর্ণ আকর্ষণ লইয়া ও পরস্পরের দৈহিক মিলনে যথার্থ তৃপ্তিলাভ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল একত্রে যৌন-জীবন যাপন করিতে হইবে। অধ্যাপক মিচেল ও ডাঃ ফোরেল বলিয়াছেন একঘেয়েমী ও অভিনবত্ব-হীনতা প্রেমের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। সুতরাং যে সমস্ত উপায় বা প্রক্রিয়া দ্বারা দম্পতির যৌন-জীবনকে নিত্য নূতন রূপ দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কোনটীই মামুলী নীতিজ্ঞান বা সংস্কারবশে নিন্দার্হ মনে করিয়া বাদ দেওয়া উচিত নহে। এ বিষয়ে বাল্‌জাকের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছেন, **"To grasp quickly the subtleties of pleasure, to develop them, to give them a new style and an original expression, therein lies a husband's genius**—অর্থাৎ রতিপুলকের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করা, উহাদের কর্ষণ এবং নূতন উপায় এবং অভিনব ভাবধারার প্রবর্ত্তন—ইহাতেই স্বামীর কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিহিত রহিয়াছে।

নিছক দৈহিক মিলনই রতি-ক্রিয়ার সবটুকু নহে। তাহা যদি হইত, তবে রতি-ক্রিয়া অতি অল্পদিনেই একঘেয়ে ও স্বাস্থ্য-হানিজনক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং উহা রতি-ক্রিয়ার একটা স্তর মাত্র। মৈথুন বা রতি-ক্রিয়া ঐরূপ বহু স্তরের সমষ্টি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, নারী-পুরুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত যৌন-প্রদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমস্ত প্রদেশের মিলন যথা স্পর্শন, চুম্বন, মর্দ্দন, প্রভৃতি মৈথুনের পুলক-প্রদ বিভিন্ন স্তর মাত্র। এই সমস্ত মৈথুন-স্তরের

বিশেষ নাম শৃঙ্গার। শৃঙ্গারের সবিস্তার আলোচনা আমি একটু পূর্ব্বেই করিয়াছি।

ডাঃ নরম্যান হেয়ার-সম্পাদিত "এনসাইক্লোপেডিয়া অফ্ সেক্সুয়াল নলেজ" নামক আধুনিকতম পুস্তকে রতি-ক্রিয়ার বিষদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ ভেন্ ডি ভেল্ডি তাঁহার আইডিয়েল ম্যারেজ" নামক পুস্তকেও এ বিষয়ে খোলা-খুলিভাবে দম্পতিকে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় পণ্ডিতেরা—বাৎস্যায়ন, কল্লানমল্ল, প্রভৃতি,—আরবীয়, মিসরীয় পণ্ডিতেরা—সকলেই রতি-ক্রিয়াকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক স্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রতি-ক্রিয়ায় এইরূপ স্তর বিভাগের কারণ ইহাই ছিল যে সাধারণ লোকে সম্পুর্ণ ক্রিয়াটীকে একই কাজ মনে করিয়া যেমন-তেমন ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকিত। পুরুষের প্রাধান্যহেতু ও নারীর লজ্জাশীলতার দরুন উভয়-সম্পন্ন ক্রিয়াটী নিতান্তই একতরফা হইয়া এবং রহিয়া যাইত। পরস্পরের দৈহিক মিলনে যথার্থ তৃপ্তি-লাভ—স্ত্রীর-পক্ষে দুঃসাধ্য। আজিও শিক্ষিত ও সুসভ্য জগতে নারী-মনোভাবের প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্য ও অবহেলা আগেকার মতই রহিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ মহিলা-ডাক্তার মেরী ষ্টোপস্ দুঃখ করিয়াছেন। বিবাহিত জীবনকে সুখময় করিতে হইলে রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করিতে হইবে বলিয়া আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সঙ্গমের বিভিন্ন স্তর

ঋষি বাৎস্যায়ন রতি-কার্য্যকে মোটা-মোটি ভাবে পাঁচটী স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন:—যথা:—(১) স্পর্শণ, (২) মন্থন, (৩) প্রবেশ, (৪) প্রচাপন, ও (৫) ঘর্ষণ। এই সকল স্তরের বিষদ-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি উপদেশ

দিয়াছেন যে পুরুষ ব্যস্ত-ত্রস্ততা পরিহার করিয়া স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে। শৃঙ্গারের আবশ্যকতা আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। শৃঙ্গার রতি-ক্রিয়ার প্রাথমিক অধ্যায় হইলেও—আরব্ধ-রতিকার্য্যেও উহা—অপরিহার্য্য। স্বামী-স্ত্রীর মনোভাব অধ্যয়ন করিতে তৎপর থাকিলে নিশ্চয়ই ধরিতে পারিবে কিসে তাহার চরম পুলক মুহূর্ত্ত—আগাইয়া আনিবে।

ডাঃ ভেন ডি ভেল্ডি রতি-ক্রিয়াকে প্রধানতঃ চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শৃঙ্গারের দ্বারা স্ত্রীকে রতি-কার্য্যে উন্মুখ করা এবং উহার জন্য প্রস্তুত করাই প্রথম স্তর।

অন্যান্য স্তরের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের চরম পুলক-লাভই উল্লেখ-যোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্ত্রীর চরম পুলক-লাভ সহজ-সাধ্য নহে। পুরুষ

স্ত্রীর চরম পুলক লাভ

সকর্ম্মক হওয়ায় স্ত্রালোকের কামভাব ধীরে ধীরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে পুরুষ সচেষ্ট না থাকিলে স্ত্রীর সন্তোষলাভ হইবে না। আমি স্ত্রীলোকের যৌন-ঔদাসীন্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছি নানা কারণে উহাদের পূর্ণ রতি-তৃপ্তিলাভ হয় না। স্ত্রীর দৈহিক ধীর-গামীতার প্রতিষেধক-রূপ পুরুষকে অধ্যয়ন-শীলতা অবলম্বন করিয়া আরব্ধ রতি-ক্রিয়াকে অধিকতর মধুর করিতে তৃপ্তিকর শৃঙ্গারের সাহায্য লইতে হইবে। মানসিক ঔদাসান্যের প্রতিষেধক-রূপে স্ত্রীকে অসহযোগীতা বর্জ্জন করিয়া সকর্ম্মক হইতে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। ডাঃ ষ্টিকেল একজন রমণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যিনি রতি-ক্রিয়াকে বিধাতার অভিশপ্ত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রতি রতি-ক্রিয়ার পরক্ষণেই ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় বসিয়া

যাইতেন। তাঁহাকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া—এবং ধর্ম্মপুস্তক হইতে উদ্ধৃত আলোচনা শুনাইয়া তবে তাঁহার মনোভাবের সংস্কার করা হয়। অনেক স্ত্রীলোক ভুল ধারণা পোষণ করেন এই বলিয়া যে রতি-ক্রিয়ায় তাঁহাদের চরম পুলক লাভ না হইলে আর গর্ভ-সঞ্চার হইবে না। প্রাচীন হেকিমী-গ্রন্থ এই ভুল ধারণার জন্য অনেক অংশে দায়ী। এই সকল মহিলারা শুধু গর্ভাবস্থায়ই রতি-ক্রিয়ায় সহযোগীতা করেন। অন্য সময়ে কেবল বিরুদ্ধতাই করিয়া থাকেন, এই ধারণা নিতান্তই অমূলক।

স্বামীস্ত্রীর এই চরম মিলনের উপরই বিবাহিত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে একথা উভয়কেই মনে রাখিতে হইবে। শেখ নেফজাবী তাঁহার "সুগন্ধি কানন" নামক পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন ভগবানের অভিপ্রেত এই প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান কথা বলিয়াছেন।

স্ত্রীকে মনোনিবেশ সহকারে সহযোগীতা করিতে হইবে। স্বামীকে কতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এবং আমাদের আলোচ্য প্রক্রিয়ায় বীর্য্যধারণ করিতে হইবে। উভয়ের এক সময়ে তৃপ্তি লাভই দম্পতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

রতি-ক্রিয়ার সময়ে উত্তেজক গল্প বলিলে স্ত্রীর পক্ষে চরম পুলক লাভ সহজ-সাধ্য হয় বলিয়া অনেকের অভিমত। এই ধারণায় অনেকে অশ্লীল গল্পমালা বলিয়া এক অধ্যায়ই তাহাদের যৌন-শাস্ত্রে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ফরাসী ভাষায় ছোট-খাটো নাটক, নভেল, পুস্তিকা, গল্পমালারও অভাব নাই। আরবী ভাষায়—"বৃদ্ধের যৌবনে প্রত্যাবর্ত্তন" শীর্ষক পুস্তকে এইরূপ বহু গল্পের উল্লেখ আছে। হস্ত-লিখিত "লজ্জতন্নেছা" "বাহারে আয়েশ" "কোক শাস্ত্রে"ও এইসকলের উল্লেখ দেখা যায়।

বাস্তবিক পক্ষে এ সকলের কার্য্যকরীতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যৌন-বোধের দৈহিকতা এবং মনের সহিত সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি। এ বিষয়ে গল্প-মালার উদ্ভাবনে দম্পতির কল্পনা-শক্তিই যথেষ্ট। বহি-পুস্তকের দরকার হওয়ার কারণ দেখি না।

পুরুষের শুক্র-স্খলনই তাহার চরম পুলক-লাভের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। স্ত্রীর চরম মুহূর্ত্তের চিহ্ন তত সুস্পষ্ট নহে বলিয়াই অনেক সময়ে সমবেদনা-শীল স্বামীও এ বিষয়ে অচেতন থাকে। সাধারণ লোক ত এ বিষয়ে বেশীর ভাগে উদসীনই থাকে। বাৎস্যায়ন প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই চরম মুহূর্ত্তের লক্ষণাবলী দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের উক্তিতে অবৈজ্ঞানিক বহু সূত্রও স্থান পাইয়াছে বলিয়া আমরা এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কতগুলি সূত্র দিতেছি।

স্ত্রীর রতি-পুলকলাভের শেষ মুহূর্ত্তে তাহার স্ত্রী-অঙ্গে একপ্রকার স্পন্দন অনুভূত হয়। ইহা ব্যতীত তাহার হৃদ্-যন্ত্রের চাপবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, তাহার শরীরের তাপ এবং রক্তের চাপ বাড়িয়া যায়, চক্ষুর তারা প্রসারিত, শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হয় এবং সহসা তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া সে অস্ফুট ক্রন্দনোন্মুখও হইতে পারে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই সে নিদ্রায় গা ঢালিয়া দেয়। এই সকল লক্ষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। কিন্তু সত্যিকার দম্পতির লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয় না। তাহাদের মনোভাবের অসঙ্কোচ আদান প্রদান সর্ব্ববিষয়েই বাঞ্ছনীয়—এ বিষয়েও বটে! সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী ক্লান্তিবোধ করিলেও বিমর্ষতাবোধ করে না। প্রত্যেক রতিক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সহচররূপে গ্লানি আসে বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা নিতান্তই অমূলক। স্বামী-স্ত্রীর একাত্ম ও মমত্ববোধই

উহার সহচর। সঙ্গমের শেষেও পারস্পরিক আকর্ষণ বজায় রাখা এবং পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত।

ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ রতিক্রিয়ার প্রারম্ভ ও উপসংহারে দম্পতির সাবধানতাকে কলারূপে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "এণ্ডিওরিং প্যাশন" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে রতি-ক্রিয়ার উপসংহারে দম্পতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় যোজনা করিয়াছেন। তিনি দুইটী দম্পতির তুলনা করিয়া রতি-ক্রিয়ার শেষ-স্তরের কলা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একটীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—ইঁহারা পরস্পরকে খুব ভালবাসেন; উভয়ের রতি-শক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু রতি-ক্রিয়ার উপসংহারে সকল সমাপ্ত হইল মনে করিয়া পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে নিদ্রা যান। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উভয়ে অবসাদ বোধ করেন, কেহ কাহারও প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না। সাংসারিক সামান্য ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে রাগারাগি হয়।

ষ্টোপ্‌সের দৃষ্টান্ত

পক্ষান্তরে অপর দম্পতি রতি-ক্রিয়ার উপসংহারে পরস্পর হইতে বিভক্ত হইয়া পড়েন না। উপরন্তু তাঁহারা সংযুক্ত ও আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় পাশা-পাশি নিদ্রা যান। এই ভাবে রাত্রি যাপন করিবার পর প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের সময় দম্পতির কার্য্য দেখিলে বস্তুতঃই প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। নিদ্রা ভঙ্গের পর স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরকে চুম্বন করিয়া সারা দিন যুব-জনোচিত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে এবং হাস্য-রসালাপে সারা দিন অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়া থাকে। এই দম্পতি দশ বৎসর এইভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং স্ত্রীটী ডাঃ ষ্টোপসের নিকট

গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীকে তিনি কখনও মেজাজ গরম করিতে দেখেন নাই।

সত্য ঘটনা হইতে এইরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া ডাঃ ষ্টোপ্‌স অবশেষে লিখিয়াছেন "রতিক্রিয়ার উপসংহারে উপরোক্তরূপে অভিন্ন-ভাবে নিদ্রা যাওয়া স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও দাম্পত্য-সুখের জন্য কত প্রয়োজনীয় তাহা যদি সকলে বুঝিত, তবে দাম্পত্য-জীবনে এক আনন্দময় বিপ্লবের সৃষ্টি হইত।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সঙ্গমের নানা স্তরে স্বামী-স্ত্রীর কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ হইলে বুঝিতে হইবে, রতি-ক্রিয়ার আসন উভয়ের উপযুক্ত হয় নাই। শুধু এই কারণেও নহে, অন্যান্য বহু কারণে রতি-ক্রিয়ার আসন নির্দ্ধারণ রতি-কলার একটী অতি প্রয়োজনীয় অংশ। অনেক স্থলে রতি-ক্রিয়ার নিত্য নূতনত্ব অনুভব করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আসন গ্রহণ করা উচিত। ভ্যান ডি ভেলডী বলিয়াছেন, The husbands seldom realise that the monotony of the marriage-bed may be relieved by variations. Even if they do realise this they often put it indignantly aside as 'licentious'" অর্থাৎ দুর্ভাগ্য-বশতঃ অনেক স্বামীই ইহা জানেন না যে, রতি-বৈচিত্র্য দ্বারা দাম্পত্য-জীবনের অনেকখানি একঘেয়েমী দূর করা যাইতে পারে। যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারাও রতি-বৈচিত্র্যকে পাপ লালসা বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহ-জীবনের একঘেয়েমী দূর করিয়া উহাতে অভিনবত্ব দান করতঃ বিবাহ-জীবনকে মধুর করিয়া তোলা প্রত্যেক সমাজ কল্যাণকামীর

আসন

অবশ্য-কর্ত্তব্য। বিবাহ-জীবনে রতি-ক্রিয়াকে শাস্ত্র, সংস্কার ও নীতিবাদ দ্বারা একঘেয়ে করিয়া তুলিয়া মানুষ দাম্পত্য-জীবনকে কতটা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে চিন্তাশীল ও দূরদর্শী সমাজ-কল্যাণ-কামীগণ অবশ্যই তাহা বুঝিতেছেন। যৌন-প্রদেশসমূহ চুম্বন ও মর্দ্দন প্রভৃতি যৌন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা সত্য, আসনের বিভিন্নতা সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই সত্য।

অভিনবত্বের প্রয়োজন

ডাঃ ফোরেল বিবাহ-জীবনের একঘেয়েমী দূর করিবার জন্য এমনও পরামর্শ দিয়াছেন যে, যদি একঘেয়েমীর জন্য স্বামীর মনোভাব স্ত্রীর প্রতি উদাসীন বা তিক্ত হইয়া উঠে, তবে স্ত্রীকে বিভিন্ন বেশে সাজাইয়া মনকে ফাঁকি দিয়া হইলেও বিবাহ-জীবনে অভিনবত্ব আনয়ন করিতে হইবে। ডাঃ এলিস বলিয়াছেন **It is some time erroneously supposed that there is only one normal posture of coitus. It is important to bear in mind that whatever gives satisfaction to both sides is good, right and normal.**" অর্থাৎ অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, রতি-ক্রিয়ার একটী মাত্র স্বাভাবিক আসন হইতে পারে; অন্য সমস্ত আসনই অস্বাভাবিক। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যাহাতে দম্পতি সুখ পায়, তাহাই স্বাভাবিক। সুতরাং রতি-ক্রিয়ার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বলিয়া বাঁধা ধরা নিয়ম কিছু থাকিতে পারে না। দম্পতি যাহাতে এবং যে প্রকারে আনন্দ পায় এবং যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য-হানি না হয়, তাহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পুরুষের বহু-পত্নীত্ব-বাসনাকে সংযত রাখিবার জন্য রতি-প্রক্রিয়ার বহু-প্রকারত্ব কত প্রয়োজন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক ব্যাল্‌জাক তাঁহার 'ফিজিওলজি অব

ম্যারেজ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—If differences exist between one moment of pleasure and another, a man may remain satisfied with one woman. অর্থাৎ যদি রতি-কার্য্যে বৈচিত্র্য থাকে, তবেই এক পুরুষ এক নারী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। ডাঃ মিচেল পুরুষের এই মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের জন্য একটী ফরাসী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ : এক স্বামী তাহার রঙ্গময়ী স্ত্রী সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছে—I have in her many mistresses and at every moment I enjoy the merit of constancy and the pleasure of infidelity. ইহা পুরুষ মনোবৃত্তির একটী নিখুঁত ফটোগ্রাফ।

আসনের বিভিন্নতার দৈহিক প্রয়োজন

শুধু রতি-কার্য্যের একঘেয়েমী হ্রাস করিবার জন্যই বিভিন্ন আসন প্রয়োজন, তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে ইহা দম্পতির দৈহিক কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। সেজন্য আমরা এখানে রতি-আসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সাধারণ আসন বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহাই অন্যতম স্বাভাবিক আসন এরূপ মনে করার পক্ষে কোন সুযুক্তি নাই। লিঙ্গের সমতা বিধান করিতে অন্য কোন আসনের প্রয়োজন হইতে পারে এবং প্রায়শঃই হইয়া থাকে। গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত সাধারণ আসনে সঙ্গম করা যাইতে পারে না; কারণ উহাতে জরায়ুতে আঘাত লাগা ছাড়াও স্ত্রীর পেটের উপর স্বামীর চাপ পড়ায় ভ্রূণের অনিষ্ট হইতে পারে। অথচ এই সমস্ত দৈহিক প্রয়োজনের কথা জানিয়াও অনেকে অন্য কোন আসন গ্রহণ করাকে অন্যায় বা পাপ মনে করে। ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ দুঃখ করিয়া

বলিয়াছেন যে দৈহিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রেও শিক্ষিত পুরুষ আসনে. বিভিন্নতা বুঝিতে পারে না, ইহা তাঁহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ একটি মহিলা সত্য-সত্যই তাঁহার নিকট বলিয়াছেন যে, স্বামীর শরীরের চাপে অনেক সময়ে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন, তবু স্বামী পাপের ভয়ে অন্য কোনও আসনে সঙ্গম করিতে রাজী হন না। উভয়ের দৈহিক ও মানসিক আনন্দ দানই রতি-ক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। অথচ স্বামী স্ত্রীকে অসহ্য বেদনা দিয়া, তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া, নিজের সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, নিজের দেহের ক্ষুধা মিটাইবে, ইহাকে পাশবিকতা ছাড়া আর কি বলিব ?

সুতরাং রতিক্রিয়ায় অভিনবত্ব দান করিয়া দাম্পত্য-জীবন সরস করিবার জন্য এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক কল্যাণের জন্য এই উভয় কারণেই রতি-ক্রিয়ার বিভিন্ন আসন পরিগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, আদি-কাল হইতে বিভিন্ন আসনের প্রচলন আছে। রতি-ক্রিয়াকে কলারূপে চর্চ্চা করিতে গিয়াই মানুষ এই সমস্ত প্রমোদের উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে আরও বহু অভিনব-প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রায়োজনের খাতিরে মানুষ যাহা কিছু আবিষ্কার করিবে- সে সমস্তই স্বাভাবিক-প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবে। প্রসিদ্ধ স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডিকিনসন বলিয়াছেন—A woman should be assured that there is nothing in the fullest sweep of passion that is incompatible with her highest ideals of spiritual love, and that all mutual intimacy of behaviour

is right between husband and wife. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি প্রেমের তীব্রতায় পরস্পরের দেহের যে ব্যবহারই করুক না কেন, তাহা দোষের হইতে পারে না।

ভারতীয়,আরবীয় প্রভৃতি প্রাচ্য যৌন-শাস্ত্রে এ বিষয়ে বহু গবেষণা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ এতদ্দেশীয় যৌন-শাস্ত্রে ১৫১ রকমের আসন প্রচলিত থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

১৫১ আসন

আসন কথায় বরাবরই একটা অহেতুক তাৎপর্য্যের আতিশয্য ছিল এবং আছে বলিয়া—মনে হয়। এ বিষয়ে এক দিকে হইয়াছে কাল্পনিক উক্তির বাড়া-বাড়ি—অন্য দিকে হইয়াছে লোকের কৌতূহল-বৃদ্ধি। প্রাচীনতম পুস্তক হইতে—এক-এক গ্রন্থে দুই-চারিটি করিয়া বাড়িয়া-বাড়িয়া আসনের সংখ্যার কেবল উর্দ্ধ-গতিই হইয়াছে। বস্তুতঃ আসন বলিতে কি বুঝায় এবং উহার নিয়ন্ত্রা কে হইবে ইহাই অনুধাবন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এ-বিষয়ে সংখ্যা নির্দ্দেশ যেমন হাস্য-জনক, পুস্তক দেখিয়া বা দীক্ষা লইয়া প্রক্রিয়া-পালনও তেমনই অনাবশ্যক। আসন বলিতে যদি আমরা রতি-ক্রিয়ায় দম্পতির পারস্পরিক অবস্থা-বিশেষ বুঝি, তাহা হইলে উহা অসংখ্য বলিলেও ভুল হইবে না। মূল কথা আঙ্গিক মিলন-সংস্থাপন—ইহা কত প্রকারে হইতে পারে সে সংখ্যা-নিরূপনে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

সাধারণ আসন

আমরা মোটা-মুটি কয়েকটী মূল-সূত্রের উল্লেখ করিযাই ক্ষান্ত হইব।

প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রী সামনা-সামনি, বা বিপরীত-মুখী থাকিয়া রতি-ক্রিয়া করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—উহারা উপর-নীচ বা পাশা-পাশি অবস্থায় রতি-ক্রিয়া করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ—উহারা শায়িত, উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় রতি-ক্রিয়া করিতে পারে।

এই সকল উপায়ে আবার হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক অবস্থা ভেদে নূতন-নূতন আসন সংগঠিত হইতে পারে।

সাধারণ আসন বলিতে আমরা—স্ত্রীর চিৎ অবস্থায় থাকা ও স্বামীর উপরে অবস্থান বুঝি। ইহাই সহজ, বহুল প্রচলিত এবং সকলের চেয়ে প্রশস্ততম আসন। দৈহিক ও আত্মিক নৈকট্য-স্থাপন করে বলিয়া অবস্থা-বিশেষ ব্যতিরেকে এই আসনে রতি-ক্রিয়াই দম্পতির অবলম্বনীয়।

এই আসন ভিন্ন অন্য কোনটাই প্রশস্ত নয় বলিবার মত অযৌক্তিক উক্তি আমরা করিতে পারি না। কারণ এই আসনে গর্ভবতী স্ত্রীর বিশেষ অসুবিধা এমন কি অনিষ্ট হইতে পারে। গর্ভবতী স্ত্রীর পক্ষে পাশাপাশি ভাবে বা পশ্চাৎদিক হইতে রতিক্রিয়া প্রশস্ত।

মোট কথা—এই সকল অবস্থা-বিশেষের সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনেই আবার নূতন-নূতন প্রক্রিয়া ও উপায় আবিস্কৃত হইয়া থাকে। তবে প্রত্যেক নূতন অবস্থা-বিশেষই যে প্রশস্ত তাহা নহে। আবার এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কোনটিই নাই যাহা মারাত্মক হইতে পারে। এ কথা জোর করিয়াই বলিবার প্রয়োজন আছে। কারণ অনেকের বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে এই বলিয়া যে সাধারণ আসন ব্যতিরেকে প্রত্যেকটিই শরীরের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। প্রাচ্য দেশের বিশেষতঃ ইউনানী পুস্তকে স্ত্রীর স্বামীর উপরে আসীন-আবস্থায় রতি-ক্রিয়ায় বন্ধ্যাত্ব

আনয়ন করে বলিয়া বিষম ভয় দেখান হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এ প্রক্রিয়ারও বহুল প্রচলন আছে। এ প্রক্রিয়ার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, তন্মধ্যে স্ত্রীকে সকর্ম্মক হইতে দেওয়া এবং উহার চরম পুলকভাবে সাহায্য করাই প্রধান। ইহাতে পুরুষের অধিক-ক্ষণ বীর্য্য-ধারণ করাও সম্ভব হয় এবং স্ত্রীর গর্ভ-ধারণের-সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

বস্তুতঃ—আসনের নিয়ন্ত্রা আমাদের মতে দম্পতি, বহি-পুস্তক বা দীক্ষা-গুরু নহে। অভিনবত্বের খাতিরে তাহাদিগকে আসনের বিভিন্নতা অবলম্বন করিতে হইলেও দম্পতি লক্ষ্য করিয়া গেলে সহজেই ধরিতে পারিবে কোন কোন আসনে অসুবিধা কম এবং উপযোগীতা বেশী।

রতিক্রিয়ার পরিমাণ ও ব্যবধান সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা সন্তানোৎপাদনকেই রতি-ক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা একটী দম্পতির জীবনে ৩।৪ বারের অধিক রতি-ক্রিয়া নিষেধ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহাদের মতবাদ আমরা এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারি। কিন্তু যে সমস্ত যৌন-শাস্ত্রকার রতি-ক্রিয়াকে মানুষের দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই বিষয়ে গুরুতর মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে একটা কথা আছে "মাসে এক, বছরে বার, ইহার কম যত পার।" ইহা শুধুমাত্র প্রবচন নহে, ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ পাওয়া গিয়া থাকে। শুধু ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রকার কেন প্রাচীন-পৃথিবীর সমস্ত দেশের পণ্ডিতগণই এ বিষয়ে অনুরূপ মত-বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঋষি বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া, গ্রীসের

পরিমান ও ব্যবধান

সলোন, জার্ম্মানীর লুথার পর্য্যন্ত সকলে প্রায় একরূপ মত-বাদ পোষণ করিতেন। ইঁহারা উপরে সপ্তাহে দুই-বার পর্য্যন্ত অনুমতি দিয়াছেন। জরোয়াস্তার ৯বার, সলোন ১০বার এবং সক্রেটিস ১০বার রতি-কার্য্য করিবার অনুমতি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে হ্যাভ্‌লক এলিস বলিয়াছেন যে আরাগণের রাণী আদেশ করিয়াছিলেন প্রত্যেক স্বামীকে দৈনিক অন্ততঃ ছয়-বার করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিতে হইবে। এই আদেশে আরাগণের রাণী মহোদয়ার নিজের রতি-বাসনার তীব্রতাই প্রতিফলিত হইয়াছে। দোষ আরাগণের রাণীর একার নহে। যে সমস্ত শাস্ত্র-কার সর্ব্ব-সাধারণের জন্য মাসিক বা বার্ষিক বন্দোবস্ত করিয়া সাধারণ আদেশজারী করিয়াছেন, তাঁহারাও আরাগণের রাণীর মতই অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। পুরাকালে যে সমস্ত মনীষী মানুষের জন্য বৎসরে ছ'মাসে এক আধবার রতিক্রিয়ার অনুমোদন করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, রতি-ক্রিয়ার অল্পতা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবনলাভের উপায়। কারণ আমরা প্রকৃতিতে লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী দীর্ঘকাল অন্তর রতি-ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহারা অতিশয়-দীর্ঘায়ু, সবল ও বৃহদায়তন হইয়া থাকে ; এবং হাঁস, মুরগী, কবুতর, চড়ুই, এবং কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী ঘন ঘন রতিক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহারা অল্পায়ু, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রায়তন হইয়া থাকে। এই অবস্থার কার্য্য-কারণ-পরম্পরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা রতি-ক্রিয়ার অল্পতা ও আধিক্যকেই স্বাস্থ্য ও আয়ুর পার্থক্য-বিধানের কারণ মনে করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না।

কিন্তু মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা জানিতে পারিয়াছে যে, মানুষের

অবস্থা, স্বাস্থ্য, দৈহিক-গঠন, পারিপার্শ্বিকতা, আহার্য্য—ভেদে তাহাদের রতি-বাসনার গুরুতর প্রভেদ হইয়া থাকে। একজনের পক্ষে যাহা তৃপ্তি-দায়ক, অপরের পক্ষে তাহা অত্যাচার; আবার একজনের পক্ষে যাহা অত্যাচার, অপরের পক্ষে তাহা একেবারে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ তাঁহার "এণ্ডিওরিং প্যাশন" নামক গ্রন্থে একজন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পুরুষের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ ভদ্রলোক দুই বৎসরে একবার স্ত্রী-সহবাস করিয়া থাকেন এবং ইহাকেই তিনি স্বাভাবিক ও যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার চেয়ে বেশী রতি-কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তিনি জঘন্য ব্যাভিচারী মনে করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ডাঃ ষ্টোপসের এক প্রিয়তমা বন্ধুর স্বামী তাঁহার উক্ত বন্ধুর সহিত তাঁহার বিবাহিত জীবনের সমস্ত সময়ে বৎসরের ৩৬৫ দিনের প্রত্যেক দিন তিন-বার করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিয়াছেন। এই ভদ্রলোকটী উড়ো-জাহাজ দুর্ঘটনায় যৌবনেই মারা গিয়াছেন। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন দৈনিক তিন বারের একটী বারও তিনি নষ্ট হইতে দেন নাই। ডাঃ ষ্টোপসের উক্ত বন্ধু বলিয়াছেন যে, যদি কোনও কারণে মাধ্যাহ্নিক রতি-ক্রিয়ায় এক আধটু দেরী হইত (প্রাতের ও রাত্রের সঙ্গমে কোনও দিন সময়ের ব্যতিক্রম হয় নাই) তবে তাঁহার স্বামী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। এই স্বামীটী সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, খোশ-মেজাজী, ও প্রতিভাপন্ন-লোক ছিলেন এবং বহু গঠনমূলক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

উপরোল্লিখিত দুইটী ভদ্রলোকই স্বাভাবিক মানুষ এবং আদর্শ নাগরিক। কিন্তু তাঁহাদের যৌন-জীবনের পার্থক্য কত বেশী! ডাঃ

ষ্টোপস ১৯২৮ সনে এক সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া উপরোক্ত দুইটী অসাধারণ পুরুষের কথা যথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। সভাশেষে একটী মধ্যবয়ষ্কা মহিলা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আপনি দৈনিক তিন-বারের কথা বলায় আমার একটা মস্ত চিন্তা দূর হইল। কারণ আমার স্বামীর অভ্যাস তাই। আমি নিজে অতটা সহ্য করিতে পারি না বলিয়া স্বামীর কার্য্যকে আমি এতদিন অস্বাভাবিক বাড়া-বাড়ি মনে করিয়া আসিয়াছি।"

সুতরাং সমস্ত মানুষের জন্য একটী সাধারণ নিয়ম করা চলে না। এ বিষয়ে দম্পতির শক্তি ও অভিরুচিই একমাত্র মাপকাঠি এবং কোনও প্রকার অত্যাচার হইতেছে কিনা, স্বাস্থ্যই তাহার কষ্টি-পাথর। ডাঃ রোবী তাঁহার দীর্ঘ-দিনের বহুদর্শিতার ফলস্বরূপ এ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছেন, ৩৫ বৎসরের নীচে সপ্তাহে ৫।৬ বার ; ৩৫ হইতে ৫৫ বৎসর সপ্তাহে ২ হইতে ৪ বার ; ৫৫ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার। অসাধারণ লোকের কথা বাদ দিয়া সাধারণ মানুষের জন্যই ডাঃ রোবী এই নিয়মের কথা বলিয়াছেন।

সাধারণ বিধি অসম্ভব

কিন্তু আমরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র নিয়মের পক্ষপাতী নহি। সমস্তই নির্ভর করিবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সামর্থ্য ও আবশ্যকতার উপর। রতি-ক্রিয়ায় স্বামী কর্ত্তা এবং স্ত্রী কর্ম্ম বলিয়া সমস্ত রতিকার্য্যই পুরুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। স্ত্রীর অক্ষমতা-অনিচ্ছাতেও রতি-ক্রিয়া চলিতে পারে। কিন্তু পুরুষের অক্ষমতা-অনিচ্ছায় উহা চলিতে পারে না। সুতরাং পুরুষের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাহাকে স্ত্রীর

মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্বামী যদি স্ত্রীর বাসনা পূর্ণ করিতে না পারে, তবে সেক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে অ-সুখের কীট প্রবেশ করে। ইহা ছাড়া পুরুষের নিজের বাসনা-মুহূর্ত্ত ত আছেই। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বাসনা ও সামর্থ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যে পরিমাণ ও ব্যবধান নির্দ্ধারিত হইবে, প্রত্যেক দম্পতির জন্য তাহাই স্বাভাবিক। ইহা অপেক্ষা 'স্বাভাবিকে'র আর কোনও উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবও নহে—উচিতও নহে।

ডাঃ ষ্টোপ্‌স্ স্বামীস্ত্রীর যৌন-বাসনা উদ্রেকের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যথা-স্থানে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ মতবাদ অনুসারে দেখা যায় যে, নারী-জীবনে মাসে দুইবার করিয়া যৌন-বাসনা উদিত হয়। একবার ঋতু-স্রাবের পূর্ব্বে, একবার ঋতু-স্রাবের পরে। এই হিসাবে সাধারণতঃ প্রত্যেক চৌদ্দ দিন অন্তর নারীর একবার করিয়া সহবাসেচ্ছা প্রবল হয়। এই উত্তেজনা নারীর স্বাস্থ্য ও শক্তি ভেদে ৩।৪ দিন হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক পেরিকোর্ট দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল পুরুষের নাড়ীর গতির চার্ট তৈয়ার করিয়া মানুষের নাড়ী-তরঙ্গের গতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। ডাঃ ফ্রাঙ্কের ঐ গবেষণা হইতে ডাঃ ষ্টোপস্ পুরুষের রতি-বাসনার গতি নির্দ্ধারণের মূল সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে এই অনুমিত হয় যে, পুরুষের মধ্যেও নারীর ন্যায় পাক্ষিক রতি-তরঙ্গ বিদ্যমান আছে। ডাঃ ষ্টোপ্‌স্ বলিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত গবেষণার ফলও ঐ সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর

করিয়া ডাঃ ষ্টোপ্স্ রতি-ক্রিয়ার এই সাধারণ নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ক্রমা-গত ৩।৪ দিন প্রতি রাত্রিতে সঙ্গম করিয়া সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম করতঃ পুনরায় ঐভাবে ক্রমাগত কয়েক দিন রতি-ক্রিয়া করা উচিত। এই সময় নির্দ্ধারণে নারীর রতি-তরঙ্গের সহিত পুরুষের রতি-তরঙ্গের সামঞ্জস্য সাধিত হইলে তাহারা আদর্শ দম্পতিতে গণ্য হইবে। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এ বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব বলিয়াই বহু যৌন-বৈজ্ঞানিকের অভিমত।

পুলকাবেগ

সঙ্গমের পরিমাণ ও ব্যবধানের সঙ্গে আর একটী বিষয় আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা এই যে, প্রত্যেকবারের রতি-ক্রিয়ায় নারী-পুরুষের কতবার পুলকাবেগ লাভ হইয়া থাকে। পুরুষের শুক্র-স্খলনের দ্বারাই পুলকাবেগ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষ প্রতিবারের সঙ্গমে একবার মাত্র পুলকাবেগ লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক বার শুক্রস্খলন করিয়া পুরুষ খুব রতি-শক্তিশালী হইলেও প্রতি রাত্রে ৩।৪ বারের অধিক সঙ্গম করিতে পারে না। ডাঃ ষ্টোপ্স্ একজন পুরুষের কথা বলিয়াছেন, ইনি প্রত্যেক বার শুক্রক্ষয় করিয়া এক রাত্রে ১৮ বার সহবাস করিয়াছেন। ইহা একাধিক দিক হইতে অস্বাভাবিক বা অন্ততঃ অসাধারণ। এই পৌন-পৌনিকতা স্ত্রীর পক্ষে কিছুতেই পুলক-প্রদ হইতে পারে না। মাত্র ১০ মিনিটে শুক্রস্খলন করা পুরুষের পক্ষে অতিব্যস্ততারই পরিচায়ক। যাহা হউক, সঙ্গমের স্থায়িত্ব-কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এবিষয়ে আমাদের মতামত ও গবেষণার ফলের উল্লেখ করিব। দ্বিতীয়তঃ ১৮ বারে উক্ত পুরুষ যে পরিমাণ শুক্রস্খলন করিয়াছেন, উহাতে যে কোনও পুরুষের স্বাস্থ্য-হানি হইতে পারে।

পুলকাবেগ লাভ করা সম্বন্ধে পুরুষ সম্বন্ধে যে কথা সত্য, নারী সম্বন্ধে সে কথা সত্য নহে। পুরুষ বীর্য্য-স্তম্ভনের দ্বারা রতি-ক্রিয়াকে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা স্থায়ী করিতে পারিলেও এই সময়ের মধ্যে নারী ৩।৪ বার পুলকাবেগ লাভ করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে একই বারের রতি-কার্য্যে নারী একাধিক-বার পুলকাবেগ লাভ করিতে পারে। তবে নারীর এই পুলকাবেগ প্রধানতঃ পুরুষের কার্য্যতার উপর নির্ভর করে। যে পুরুষ বেশীক্ষণ বীর্য্যধারণে অসমর্থ, সে ঘন ঘন উত্তেজনা লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ সঙ্গম করিলেও স্ত্রীর পুলকাবেগ লাভে অসুবিধা হয়। কারণ প্রত্যেক সঙ্গমের মধ্যে যে বিরতি ঘটে, এই বিরতি-কালে স্ত্রীর উত্তেজনা হ্রাস-প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং রতি-ক্রিয়াকে বারে না বাড়াইয়া উহার স্থায়িত্ব-কাল বৃদ্ধির দিকেই রতি-কলাবিৎগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই মতের পরিপোষকতায় আমরা ডাঃ নরম্যান হেয়ার-সম্পাদিত যৌন-গ্রন্থ হইতে এই উক্তিটী উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না।

"It is not a question of mere virility either; there are sexual athletes who in the course of one night can establish impressive numerical racords, while leaving the woman unsatisfied; conversely, rather weakly endowed men may satisfy their mate completely, because where sex is concerned, it is not quantity but quality that counts."

ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র ও যৌন-শাস্ত্রবিৎগণের রতি-কালের স্থায়িত্ব

কাল সম্বন্ধে ধারণা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, রতি-কালের স্থায়িত্ব সাধারণতঃ তিন মিনিট। দু'এক জন রতি-কলা-বিৎ আধ ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্টা কাল সঙ্গম করিতে পারেন বলিয়া শ্রুতি-মণ্ডলীর বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় আমাদের প্রাচ্য দেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে রতি-ক্রিয়াকে কলা হিসাবে যে ভাবে চর্চ্চা করা হইয়াছে এবং বীর্য্য-ধারণ, বীর্য্য-স্তম্ভনের যে সাধনা করা হইয়াছে, ইউরোপ অঞ্চলে আজও তাহা হয় নাই। আমরা বলিয়াছি সঙ্গমের পৌনঃপৌনিকতা অপেক্ষা রতি-কার্য্যের স্থায়িত্বই নারীর পুলকাবেগ লাভে অধিক সহায়তা করিয়া থাকে। ইউরোপীয় শীত প্রধান দেশ সমূহে নারীর যৌন-উত্তেজনা স্বভাবতঃই দেরীতে উদ্রিত হয়। কাজেই তিন চারি মিনিটে পুরুষের শুক্র-স্খলিত হইয়া গেলে নারীর পুলকাবেগ ত দূরের কথা তাহার যৌন-উত্তেজনা লাভের বহু পূর্ব্বেই পুরুষ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই জন্যই বোধ হয় ইউরোপীয় পুরুষগণ মোটামুটী প্রাচ্যের পুরুষ অপেক্ষা কর্ম্মক্ষম ও শক্তিশালী হইয়াও বীর্য্য-ধারণ ক্ষমতায় উহাদের চেয়ে নিস্তেজ হইয়া থাকে। ইউরোপ অঞ্চলে দাম্পত্য-জীবনের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহের ইহাও একটী কারণ নয়, তাহা কে বলিতে পারে?

রতি-কালের স্থায়িত্ব

কিন্তু প্রাচ্যদেশে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে বীর্য্যস্তম্ভনকে কলারূপে অধ্যয়ন করা হইয়াছে এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বীর্য্যস্তম্ভনের বিশেষ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত নানা প্রকার যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উর্দ্ধরেতঃ হওয়ার সাধনা আমাদের দেশে বহু প্রচলিত ছিল ও আছে।

বীর্য্যস্তম্ভনের যৌগিক সাধনা

আমাদের দেশীয় যোগিগণ কুল-কণ্ডলিনী তন্ত্রের সাধনা দ্বারা আপন দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার পারস্পরিকতা সম্বন্ধে এমন সব যৌগিক জ্ঞান আয়ত্ব করিয়াছিলেন যে তাঁহারা দেহের সমস্ত শক্তি, মনের সমস্ত বাসনা, এমন কি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুক্রকে তাঁহারা ব্রহ্মতেজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মশক্তিকে রক্ষা করিবার সকল প্রকার সাধনা তাঁহারা করিয়াছেন। এই সমস্ত সাধনার কথা যথাস্থানে আমরা বিবৃত করিব। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যৌগিক সাধনা দ্বারা ঋষিগণ শুক্র-ধারণে অসাধারণ ক্ষমতা আয়ত্ব করিয়াছিলন। মুনি-ঋষির কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশে এমন লোক আজিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সঙ্গম-ক্রিয়াকে বহুক্ষণ স্থায়ী রাখিতে পারে। কোনও প্রকার বীর্য্যস্তম্ভনের ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র যৌগিক সাধনা দ্বারাই এই শক্তি আয়ত্ব করা যাইতে পারে। যৌগিক-সাধনার কথা শুনিয়া ভয় পাইবার বিশেষ কারণ নাই। যৌগিক সাধনা ব্যায়ামের অভ্যাস মাত্র, এবং বিশেষ কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ অভ্যাসও নহে। যথাস্থানে আমি এ সব কথা বলিব। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ অভ্যাসের দ্বারা অতি অল্প দিনেই পুরুষ যতক্ষণ ইচ্ছা বীর্য্য-ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। দাম্পত্য জীবনকে সুখী রাখিবার জন্য স্ত্রীকে তৃপ্তি-দানের জন্য ইহা আবশ্যক। কারণ কোনও স্ত্রীই সাধারণতঃ অল্পক্ষণে পুলকাবেগ লাভ করে না এবং পুলকাবেগ লাভ না করিতে পারিলে স্ত্রীলোক তৃপ্ত হয় না। সুতরাং স্ত্রীকে যৌন-তৃপ্তি দিতে গেলে পুরুষের পক্ষে তাহার রতি-ক্রিয়াকে আবশ্যক মত দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইবেই।

নিতান্ত স্বাস্থ্যনৈতিক কারণে কোনও কোনও অবস্থাতে রতিকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবের সময়ই প্রধান।

নিষিদ্ধ সঙ্গম

ঋতুস্রাবের সময় রতিক্রিয়া করিলে নারী-পুরুষের উভয়েরই দৈহিক অনিষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু নারীরই অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে নারীর ঋতুস্রাব প্রভৃতি জরায়ু-ঘটিত জটীল ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হেনরী কিশ্ বলিয়াছেন যে, ঋতুস্রাবের সময় রতিক্রিয়া করিলে সে রতিক্রিয়ায় সন্তান হইলে এই সঙ্গম-জাত সন্তান নানা প্রকার জটীল ব্যাধিগ্রস্থ হইতে বাধ্য। এই জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে ঋতুস্রাবের সময় সঙ্গমকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রসবের পরবর্ত্তী ৪ হইতে ৬ সপ্তাহকাল রতি-ক্রিয়া হইতে বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইসলামে ৪০ দিন পালনের যে ব্যবস্থা আছে উহাই প্রশস্ত সীমানির্দ্দেশ বলিয়া মনে হয়। ডাঃ ফোরেল ৬ সপ্তাহ্কাল পালনের পরামর্শ দিয়াছেন।

এই দুই অবস্থা অর্থাৎ ঋতুস্রাব ও প্রসবকাল ব্যতিরেকে রতি-ক্রিয়ায় আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-সম্মত বাধা নাই। এতদ্ব্যতীত মাত্র স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রতি-কার্য্যে বিরত হওয়া উচিত। দম্পতির কাহারও মাতাল অবস্থায়, শোকে, অসুখে, বিরক্তিতে অতিরিক্ত ক্রোধ, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময়ে রতিক্রিয়া করা অনুচিত। ইহাতে শারীরিক মানসিক উভয় প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

এতটুকু বলিলেই এই অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইত বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের দেশে বহু অমূলক বাধা নিষেধের বাড়াবাড়ি

দেখা যায়। শাস্ত্র, লোকাচার ইত্যাদি সকলেই দম্পতির কার্য্য-কলাপের উপরে বহু নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া বসিয়া আছে। শুধু তাহাই নহে, কোন্ আজ্ঞা ভঙ্গ করিলে শাস্তির পরিমাণ কি হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সূর্য্য-গ্রহণ, চন্দ্র-গ্রহণের সময়ে, রতি-ক্রিয়া নিষিদ্ধ এবং এই সমস্ত সময়ে রতিক্রিয়া করিলে তাহার ফলে সন্তান হইলেও ঐ সন্তান জটীল ব্যধিগ্রস্ত ও অঙ্গহীন হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন্ প্রকার রমনীতে কোন্‌ভাবে ও দিনে উপগত হওয়া উচিত এবং অনুচিত ইহা লইয়া উক্তির ছড়াছড়ি এবং শাস্তির বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে।

কোন কোন জাতির মধ্যে গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পর দুই বৎসরকাল স্ত্রী 'অপবিত্রা' বলিয়া গণ্য হয় এবং রতিক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিরতা থাকে। মোট কথা, অহেতুক কু-সংস্কার প্রায় পৃথিবীর সকল জায়গায়ই দম্পতি-জীবনের সুখ ও পূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে এবং হইতেছে।

আমাদের মতে দম্পতির শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ব্যতিরেকে কেবল উক্ত দুই অবস্থার রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই মতের পরিপোষকতায় আমারা ডাঃ ফোরেলের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—If our monogamous marrige is to be natural and not satisfied with words and illusions, it is necessary for sexual intercourse to be intimate and constant, and it should only be interrupted for short intervals, corresponding to the natural wants of the two conjoints, adapted to each other by mutual concessions.

প্রাচীন যৌন-বিশেষজ্ঞগণের একটা অভিমত দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, গর্ভাবস্থায় রতিক্রিয়া করা উচিত নহে। কিন্তু আধুনিক যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ একথা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, গর্ভাবস্থায় সঙ্গম করা যাইতে পারে। ইহার দুইটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমতঃ আমরা সকলেই এক বিবাহের পক্ষপাতী। দাম্পত্য সম্পর্কের বাহিরে রতি-ক্রিয়াকে আমরা সকল দিক হইতে নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় ১০ মাস স্বামীর পক্ষে যৌন-নিবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু দু'এক বৎসর পর পর একাদিক্রমে এক বৎসর কাল রতি-ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র। সাধারণ রতি-শক্তিশালী পুরুষই ইহা পারিবে না; অতিরিক্ত মাত্রায় রতি-শক্তিশালী পুরুষের ত কথাই নাই। অতএব গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া নিষিদ্ধ করিতে গেলে পুরুষের পক্ষে যৌন-নিষ্ঠা পালন করাকে অনাবশ্যকভাবে কঠিন করা হয়। দাম্পত্য-সুখের পক্ষে ইহা প্রবল প্রতিবন্ধকতা করিবে।

গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ নারীর পক্ষেই দেখা গিয়া থাকে যে গর্ভাবস্থায় তাহাদের রতি-বাসনা অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় তাহাদের রতি-বাসনা পুর্ণ না করা স্বামীর পক্ষে কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি হইবে।

কোনও কোনও যৌন-বৈজ্ঞানিক গর্ভাবস্থায় যথেচ্ছা রতি-ক্রিয়া করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, গর্ভাবস্থায় সঙ্গম করা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। কারণ এই সময়ে গর্ভ হওয়ার আশঙ্কা

না থাকায় নারী-পুরুষ নির্ভয়ে ও নিরাপদে সঙ্গম করিতে পারে। এই সময় জন্ম-নিরোধক রবার নলের মধ্যে অথবা বাহিরে শুক্র-স্খলন করিবার আবশ্যকতা থাকে না। ফলে এই সময়েই পুরুষের শুক্র-শোষণে নারী-দেহের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে। উপরোক্ত কারণ সমুহে গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়ার আবশ্যকতা আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত রতি-ক্রিয়ায় যে ভ্রূণের এমন কি গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার শেষ দিকে যখন ভ্রূণ আকারে বড় হইয়া উঠে, তখন রতিক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলা অতীব প্রয়োজন।

অবশ্য ব্যক্তিভেদে এই সময়ে রতি-ক্রিয়ার পরিমাণ-ভেদ হইবেই। কিন্তু মোটামুটি সাধারণভাবে এ-কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া খুবই কমাইয়া ফেলিতে হইবে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক পুরুষই এই অবস্থায় নারীর মনোভাব ও দেহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রখিয়া চলিবে। স্ত্রী যদি রতি-ক্রিয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখায়, তবে তাহার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে। কারণ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর মনোবাসনা অপূর্ণ রাখা কিম্বা তাহাকে কোনও কারণে বিষণ্ণ বা অসুখী থাকিতে দেওয়া উচিত হইবে না। সেজন্য হ্যাভলক এলিস, এলেন কী, মেরী ষ্টোপস্ সকলেই গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া সম্বন্ধে পুরুষকে খুব সাবধান ও সহৃদয় হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ডাঃ মেরী ষ্টোপস নিজে নারী, এবং নারী-মনোবৃত্তি নিয়া

খুবই ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন বলিয়া আমরা এ বিষয়ে তাঁহার মতকেই প্রাধান্য দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, সাধারণতঃ সকল নারীই গর্ভাবস্থার কোনও এক সময়ে রতি-ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে কিছুতেই স্ত্রী-সম্ভোগ করা উচিত নহে।

গর্ভাবস্থায় সহবাস করা গেলেও সাধারণ আসনে কিছুতেই রতি-ক্রিয়া করা উচিত নহে। যাহাতে জরায়ুতে আঘাত লাগে এবং নারীর পেটের উপর চাপ পড়ে গর্ভাবস্থায় এইরূপ আসন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। গর্ভাবস্থায় নারীর পশ্চাৎ হইতে বা পাশ ফিরিয়া রতি-ক্রিয়া করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ডাঃ মেরী ষ্টোপস্ অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়া খুব জোরের সহিত এই আসনটী সমর্থন করিয়াছেন।

আমাদের দেশের অনেকে দিনের বেলায় রতি-ক্রিয়া করাকে অন্যায় মনে করিয়া থাকেন। ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভারতীয় প্রাচীন যৌন-শাস্ত্রকারগণ ইহাকে প্রশস্ত রতি-ক্রিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নারী-শ্রেষ্ঠ পদ্মিনীর এক বিশেষত্ব এই যে, সে রাত্রি অপেক্ষা দিনের বেলা রতি-ক্রিয়া করিতে ভালবাসে। ডাঃ ফোরেল, মেরী ষ্টোপ স্ ইঁহারা সকলেই এই মতের পরিপোষক। রাত্রি দিন সম্বন্ধে ইঁহারা খুব দৃঢ় মত পোষণ না করিলেও ইঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, অন্ধকার অপেক্ষা আলোতে রতি-ক্রিয়ার অনেক বেশী উপকারিতা। পরস্পরের মুখের পুলক-জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারায় উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ এবং ডাঃ ফোরেলের মত এই যে, তদনুরূপ সহবাস-জাত সন্তান রূপে-গুণে গুণবান হইবে। ইঁহাদের দৃঢ় অভিমত

দিবাভাগে রতি-ক্রিয়া

'এই যে, জাতকের জন্মক্ষণের সহিত এবং প্রসূতির পারিপার্শ্বিকতা-জাত মনোবৃত্তির উপর জাতকের রূপ ও গুণ অনেকখানি নির্ভর করে। মানব-মনের উপর আলো ও অন্ধকারের ক্রিয়ার বিভিন্নতা তাহাদের সন্তানের জীবনে প্রতিফলিত হইবে, ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে, বরং খুবই সম্ভব। সুতরাং দিনের বেলা রতি-ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে বিরুদ্ধভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা নিতান্তই কুসংস্কার-জাত।

রতিশক্তি মানবের দৈহিক একটা শক্তি। অন্যান্য অঙ্গের শক্তি, আকার ও সুস্থতার ন্যায় যৌন-অঙ্গের শক্তি, আকার ও সুস্থতা কর্ষনের দ্বারা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আমরা যেমন বুকডন, বৈঠকী, ডামবেল, মুগুর প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যায়াম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ও সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারি, আমাদের জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও অবিকল এ কথাই—সত্য।

রতি-সৃষ্টি

ইহাতে তেমন অন্যায় কিছুই নাই। আমরা হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি বিভিন্ন অভ্যাসের দ্বারা উন্নত, শক্তিশালী ও সুন্দর করিতে পারি; তবে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া আমাদের যৌন-অঙ্গ সমূহ কেন অধিকতর শক্তিশালী ও সবল করিতে পারিব না, তাহার কি কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?

অন্যান্য অঙ্গ যেমন আমরা ব্যায়াম ও ঔষধ প্রয়োগ উভয় প্রকারে শক্তিশালী করিতে পারি, আমাদের যৌন-অঙ্গ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। আমরা কয়েক প্রকারের অভ্যাসের দ্বারা আমাদের রতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারি। এই সমস্ত অভ্যাসকে যৌগিক অভ্যাস বলে। ভারতীয় যৌন-

শাস্ত্রকারগণ বহু সাধনার দ্বারা এই সমস্ত যৌগিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যৌন-অঙ্গের দৃঢ়তা, সবলতা ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য প্রাচ্য যৌন-শাস্ত্রকারগণ বহু সাধনার দ্বারা অনেক প্রকার ঔষধও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মানুষের রতিশক্তির উপর তাহার জীবনের সুখের অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যৌগিক অভ্যাসে ও ঔষধ প্রয়োগে আমাদের রতিশক্তির কর্ষণ করা মানুষের দৈহিক, সামাজিক ও দাম্পত্য-কল্যাণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেজন্য আমরা এই অধ্যায়ে তাহার সম্যক আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের কয়েকটী বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার।

আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের রতিশক্তি যে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, এ কথা বুঝাইবার জন্য অধিক বক্তৃতার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। যাহারা নীরোগ, যাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল, তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ যৌন-দুর্ব্বলতা বিদ্যমান নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যবান দু'চারজন লোকের মধ্যে যে রতি-দৌর্ব্বল্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা যৌন-শালীনতা প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান-গত অসাধারণ বিকল্প মাত্র। সামান্য চেষ্টাতেই ঐপ্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করা সম্ভব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান লোককে রতিশক্তিতে দুর্ব্বল হইতে দেখা যায় না।

এখন কথা এই যে, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় কি কি? যৌন-স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ উপায় বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য। আমাদের দেশীয় প্রাচীন প্রথানুসারে প্রত্যেক পুরুষকে বাল্যে গুরু-গৃহে শিক্ষালাভ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত। এই ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও ব্যক্তিত্ববাদের যুগে এই প্রথা অচল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার

আনুষঙ্গিক অতি প্রয়োজনীয় অনেক সংস্কার হয় নাই। বর্ত্তমান কালোপযোগী যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ছেলে-মেয়েকে শৈশব হইতেই যৌন-সংযমে অভ্যস্ত করিতে হইবে। বাল্যকালে যৌন-সংযমের দ্বারা দেহের অস্থিমজ্জা ও শুক্রকে পরিপক্ক করিবার পর মানুষ রতিক্রিয়ায় রত হইলে তদ্দ্বারা মানুষের দৈহিক কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না। বরং ঐ-অবস্থায় সে নিজের রতিশক্তিকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারে। বাল্যে হস্ত-মৈথুন, সম-মৈথুন প্রভৃতি কুক্রিয়ার দ্বারা অপক্ক অস্থিমজ্জা ও শুক্রকে নষ্ট করিয়া আমাদের দেশের বালক-বালিকাগণ অঙ্কুরে স্বাস্থ্য-নাশ করিতেছে। এই সকল অভ্যাসের ফলে আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শুক্রতারল্য প্রভৃতি ব্যাধি এত অধিক-মাত্রায় দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত রোগের দরুন, আমাদের দেশের কত দাম্পত্য-জীবন যে বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্বা করিবে ?

ত্বকচ্ছেদ

সাধারণতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যতীত রতি-কর্ষণের জন্য কতকগুলি দৈহিক উপযোগিতা আবশ্যক। এই সমস্ত উপযোগিতা রতি-ক্রিয়ার কৃষ্টি-সাধনায় বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই উপযোগিতার মধ্যে ত্বকচ্ছেদ সর্ব্বপ্রধান।

পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগের খানিকটা চর্ম্ম লিঙ্গমণিকে আবৃত করিয়া রাখে। এই আবরক চর্ম্ম লিঙ্গমণি আবৃত করিয়াও খানিকটা সম্মুখের দিকে ঝুলিয়া থাকে। প্রস্রাব করিলে প্রস্রাবের খানিকটা এই চর্ম্মের পরতের মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকে বলিয়া ইহাতে নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে ; সেজন্য অনেকে এই চর্ম্মচ্ছেদ করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু সেকথা আমাদের বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এখানে

এই যে এই আবরক চর্ম্মের দ্বারা আমাদের যৌন-ক্ষমতা কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উল্টা মুদ্রা প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়ের রোগে এই আবরক চর্ম্ম চিকিৎসকগণ অনেক সময় ছেদন করিয়া ফেলেন বটে, কিন্তু দু'একটী সভ্যজাতি ব্যতীত অন্য সমস্ত সভ্যজাতিই এই চর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন না। কিন্তু ডাঃ ফোরেল ও এলিস প্রমুখ পণ্ডিতগণ শৈশবে সমস্ত পুরুষের তকচ্ছেদ করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। ইঁহারা যদিও সাধারণ স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিচার করিয়াই ত্বকচ্ছেদের উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি এ কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তকচ্ছেদের দ্বারা পুরুষের রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, লিঙ্গমণি উক্ত আবরক চর্ম্মে সর্ব্বদা আবৃত থাকে বলিয়া উহা অত্যন্ত কোমল ও স্পর্শ-চেতন হইয়া থাকে। এই কোমলতা ও স্পর্শ-চৈতন্য-হেতু রতিকালে অতি শীঘ্র শুক্র স্খলিত হইয়া যায়। অথচ যাহাদের আবরক চর্ম্মচ্ছেদন হেতু লিঙ্গমণি অনাবৃত থাকে তাহাদের লিঙ্গমণির সহিত সর্ব্বদা পরিধেয় বস্ত্রের ঘর্ষণহেতু লিঙ্গমণি ঈষৎ শক্ত ও খানিকটা স্পর্শ-চৈতন্যহীন হইয়া থাকে। ফলে সহজে পুলকাবেগের আতিশয্য হয় না। কাজেই শুক্রও সহজে স্খলিত হয় না। সেই জন্যই যে সমস্ত পুরুষের ত্বকচ্ছেদ হইয়াছে, তাহারা অধিকক্ষণ বীর্য্যধারণ করিতে পারে। ডাঃ ফোরেল ও মিঃ গেম্বার্স বলিয়াছেন যে, মুসলমান ও ইহুদীরা সার্ব্বজনীন ভাবে ত্বকচ্ছেদ প্রথা পালন করিয়া যান বলিয়াই উহাদের পুরুষরা সাধারণতঃ রতিশক্তিতে অধিক শক্তিশালী ও তাঁহাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব খুব কমই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ত্বকচ্ছেদ একটী অতি সহজ প্রক্রিয়া মাত্র। ইহাতে খুব বড়

ডাক্তারের কোনও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং রতি-কর্ষণের উপযোগী দৈহিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য ত্বকচ্ছেদ অতীব প্রয়োজনীয়।

রতি-কর্ষণের আরএকটী দৈহিক উপযোগিতা যৌন-কেশ মুণ্ডন। আমাদের ভারতবর্ষে হিন্দুদের অনেকেই এবং মুসলমানরা সকলেই যৌন-কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলে। রতি-ক্রিয়ায় উপযোগিতা লাভের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষার দিক হইতে যৌন-কেশ সমূহ মুণ্ডন করার অতীব প্রয়োজন ত আছেই, তদুপরি যৌন-ক্ষমতার দিক হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত কম নহে। হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্র ও আরবীয় যৌন-শাস্ত্র অনুসারে ক্ষুর দ্বারা যৌন-কেশ মুণ্ডন করিলে তাহাতে ঐ স্থানের চর্ম্ম সতেজ থাকে। কিন্তু লোম-নাশক চূর্ণ ও সাবান দ্বারা যৌনকেশ দূর করিলে চর্ম্মের উপরোক্ত সতেজতা আর তেমন থাকে না। মিঃ গেম্বার্সের মত এই যে, যাহারা নিয়মিতভাবে যৌন-কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলে, তাহারা বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রতি-শক্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়া থাকে। যৌন-কেশ মুণ্ডন না করিলে নারী-পুরুষের পরিচ্ছন্নতায় ব্যাঘাত জন্মে। শুধু তাহাই নহে। যৌন-কেশ স্বামী-স্ত্রীর সম্পূর্ণ স্পর্শ-মিলনের মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। আশানুরূপ দৈহিক উপযোগিতা লাভের জন্য সকলেরই যৌন-কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলা উচিত।

যৌন-কেশ মুণ্ডন

রতি-শক্তির কৃষ্টি-সাধন করিতে হইলে উপরোক্তরূপে শারীরিক উপযোগিতা লাভ করিতে হইবে। অতঃপর দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে এই সাধনা করিতে পারা যায়। প্রথম প্রক্রিয়া যৌগিক অর্থাৎ কতিপয় দৈহিক কসরৎ, দ্বিতীয়তঃ বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের ঔষধ ব্যবহার।

আমরা প্রথমতঃ যৌগিক প্রক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিব। ভারতীয়

ও আরব-পারস্যের যৌন-শাস্ত্রকারগণ এই উভয় প্রকারের প্রক্রিয়ার বিশেষ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বু-আলী সিনা মোহাম্মদ বাকেরজী, শেখ ইনায়েৎ উল্লা, প্রভৃতি যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ ফারসী ভাষায় এবং দত্তাত্রেয় মুনি, সদাশিব প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় যৌগিক সাধনা সম্বন্ধে বহু প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। মোহাম্মদ বাকের তদীয় 'কিমিয়ায়ে আস্‌রাৎ' গ্রন্থে, সদাশিবাচার্য্য উঁহার শিব-সংহিতা গ্রন্থে, দত্তাত্রেয় মুণি তাঁহার অবধূত গীতায় বীর্য্যস্তম্ভনের চমৎকার চমৎকার প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ফারসী গ্রন্থে ও সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে আশ্চর্য্যরকম সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়।

রতি-শক্তির যৌগিক প্রক্রিয়া

এই সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসারে গুহ্যদ্বার ঘন ঘন প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে হয়। যাহাতে সশব্দে অপান নিঃসরণ না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন-প্রসারণ কার্য্য যথাসম্ভব প্রত্যহ যতবার ইচ্ছা ততবার অভ্যাস করিতে হয়। ভারতীয় যৌগিক প্রণালীতে এই প্রক্রিয়াসমূহকে 'মুদ্রা' সাধন বলে। এই প্রক্রিয়ার মূল কথা বায়ু সঞ্চালনকে শরীরের সঙ্কোচন-বিকোচন দ্বারা ইচ্ছামত পরিচালনা করা। অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ুর সহিত অপান বায়ুর যোগ সাধন করা যাইতে পারে। 'মুদ্রা'সমূহের মধ্যে শক্তিচালনী মুদ্রাই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জন্য উপযোগী। শক্তিচালনী মুদ্রা অভ্যাস করিতে হইলে নির্জ্জন স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় এক পায়ের গোড়ালী দ্বারা গুহ্যদ্বার খুব চাপিয়া বসিয়া অপর পায়ের গোড়ালী দ্বারা

লিঙ্গমূলের উপরিভাগে চাপিয়া ধরিবে। তৎপর উভয় নাসাপুটে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক অপান বায়ুতে যুক্ত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুতে যোগসূত্র স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়ার সময় প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া কৌশলে বিধৃত করারঁ নাম প্রাঁণায়াম। প্রাণায়ামের তিনটীস্তর—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বাহিরের বায়ু নিশ্বাসের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহের অভ্যন্তর অংশ পূরণ করার নাম পূরক, জলপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় সেই বায়ুকে দেহাভ্যন্তরে ধরিয়া রাখার নাম কুম্ভক এবং ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করার নাম রেচক। শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইলে খুব ধীরে ধীরে পূরক ও রেচক কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। বিশেষতঃ রেচকের সময় প্রশ্বাস এত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে হইবে যে নাসিকার সম্মুখে হস্ত স্থাপন করিলেও বায়ু সঞ্চালন বুঝিতে পারা যাইবে না। ঐ মৃতবায়ু নিঃসারণ আবার অবিচ্ছিন্ন হওয়াও প্রয়োজন, থাকিয়া থাকিয়া নিঃসারিত হইলে প্রাণায়াম সাধনা হইবে না।

এইভাবে প্রাণায়াম ও শক্তিচালনী মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা পুরুষ উর্দ্ধরেতঃ হইতে পারিলে পুরুষ শুক্রস্খালন না করিয়াও বহুক্ষণ রতি-ক্রিয়া করিতে পারে।

উপরে ভারতীয় যৌগিক-প্রক্রিয়া মোটামুটি বর্ণিত হইল। শেখ ইনায়েৎ উল্লার শিষ্য মোহাম্মদ বাকেরের 'কিমিয়ায়ে আসরাৎ'এ বর্ণিত প্রক্রিয়াও মোটামুটি উপরোক্ত রূপ। যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় উহাদের মধ্যে মিল নাই, নিম্নে কেবল তাহারই দুই একটি বর্ণিত হইল।

মোহাম্মদ বাকেরের অভিমত এই যে, উক্তরূপ অভ্যাস করিবার কালে অনেক সময় অপান বায়ু নিঃসরণের প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু তাহা চাপিয়া রাখিতে হইবে। এ-বিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র সাফল্য লাভ করিতে হইলে ২।৩ দিন অন্তর অন্তর বাহ্য করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। এই অভ্যাসের সহায়তার জন্য আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস করিতে হইবে। ফলতঃ অল্পপরিমাণ খুব পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিয়া এবং জল পান যথাসম্ভব কমাইয়া বাহ্য-প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। বাহ্য-প্রস্রাবের পরিমাণ যত কমিবে, শরীরের বল ও রতি-শক্তি তত বর্দ্ধিত হইবে। বাকেরের দৃঢ় অভিমত এই যে, মাত্র ৩।৪ মাস এইরূপ অভ্যাস করিলে পুরুষ রমণ-ক্রিয়ায় কিছুমাত্র ক্লান্ত হইবে না।

(১) মল ও মূত্র ভিন্ন ভিন্ন সময় ত্যাগ করিতে হইবে। মলত্যাগ করিবার সময় প্রস্রাব না করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। এই অভ্যাস করিতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু দিনের চেষ্টাতেই এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। দুইটী প্রণালীতে এই অভ্যাস করা যাইতে পারে। পায়খানা ফিরিবার সময় এক পায়ের আঙুলের উপর ভর করিয়া সেই পায়ের গোড়ালী দ্বারা যোনিমণ্ডল (অণ্ডকোষ ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান) চাপিয়া ধরিতে হইবে। ইহাতে মূত্র-বেগ রোধ হইবে। এইভাবে বসার অসুবিধা হইলে বাম হাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙুল একত্র করিয়া যোনিমণ্ডল চাপিয়া ধরিবে। যোনিমণ্ডলে যে স্থূল শিরাটী আছে উহাই লিঙ্গমূল। ঐ শিরা আস্তে চাপিয়া ধরিলে কিছুতেই প্রস্রাব বাহির হইবে না। প্রথম প্রথম আঙুলের চাপ ছাড়িয়া দিবার পর দুএক ফোঁটা

প্রস্রাব বাহির হইতে পারে। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসের পর আর ঐরূপ প্রস্রাব বাহির হইবে না এবং অধিক দিন অভ্যাস করিবার পর মল-ত্যাগের সময় মূত্র-বেগ হইবে না। এইভাবে মূত্র-বেগ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে স্বতঃই শুক্র-বেগ ধারণের ক্ষমতা লাভ হইবে। তখন শুক্রস্খালন ব্যতিরেকেও সঙ্গম-ক্রিয়া করিতে পারা যাইবে।

(২) মল-মূত্র-বেগের ন্যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারাও বীর্য্য-ধারণ অভ্যাস করা যাইতে পারে। রতি-ক্রিয়ার সময় এক নাক দিয়া শ্বাস গ্রহণ করতঃ অপর নাক দিয়া উহা ত্যাগ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে এবং বারবার নাসিকা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ একবার ডান নাক দিয়া শ্বাস ও বাম নাকে প্রশ্বাস করিলে পরের বার বাম নাকে শ্বাস ও ডান নাকে প্রশ্বাস করিতে হইবে।

(৩) সঙ্গমের সময় যখনই শুক্রস্খলনের উপক্রম হইবে, তখনই দাঁড়াইয়া উর্দ্ধদিকে নিশ্বাস টানিতে থাকিবে অথবা ডান পায়ের গোড়ালী দ্বারা হাতের সাহায্যে গুহ্যদ্বার ও অণ্ডকোষের মধ্যস্থল চাপিয়া ধরিবে। হাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা চাপিয়া ধরিলেও চলিতে পারে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা শুক্র যথাস্থানে ফিরিয়া গেলে আবার রতি-ক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

(৪) সঙ্গমের সময় অঙ্গ-চালনা করিতে করিতে যখন শুক্রস্খলনের উপক্রম হইবে, তখন বিযুক্ত না হইয়া কেবলমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াও এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। শুক্রস্খলনের উপক্রম হইলেই অঙ্গ-চালনা বন্ধ করিয়া গুহ্যদ্বারকে সবলে আকুঞ্চিত করিতে করিতে দীর্ঘ-নিশ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ দুই একবার করিলেই পতনোন্মুখ শুক্র যথাস্থানে ফিরিয়া যাইবে।

হাকিম এনায়েতুল্লা ও তাঁহার শিষ্য মোহাম্মদ বাকের নাদির শাহের সমসাময়িক লোক। নিজেদের প্রক্রিয়াসমূহকে তাঁহারা পরীক্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে রতি-কৃষ্টির যে সমস্ত যৌগিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ উপরে করিলাম, উহাদের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, সে সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য গবেষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই কার্য্যে আমি যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সংক্ষেপে নিম্নে তাহার বর্ণনা করিলাম। এ-বিষয়ে আমাদের পাঠকগণের সহযোগিতা লাভ করিলে তাহার ফল এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংযোজনা করিব।

যৌগিক প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

এই সমস্ত যৌগিক প্রক্রিয়া প্রধানতঃ দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎগণ ঐ সমস্ত প্রক্রিয়াকে মানব-দেহের অনিষ্টকর বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক ঐ সমস্ত প্রক্রিয়াকে বিরক্তিকর গাঁজাখুরী বুজ্‌রুকী বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে খানিকটা বুজ্‌রুকী ও কেরামতী যে না আছে, তাহা নহে। তবে ঐ টুকু কেরামতীর জন্যই সমস্ত প্রক্রিয়ার নিন্দা করা অন্যায় হইবে। কারণ আমরা জানি, প্রাচীনকালে লোকেরা সাধারণতঃ বুজ্‌রুকীহীন কোন ব্যবস্থার কার্য্যকারিতায় সহজে বিশ্বাস করিত না। সেইজন্য সমস্ত কার্য্যেই মন্ত্র আবৃত্তি একটা সাধারণ ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া নিতান্ত সাধারণ কার্য্যকে একটা মিষ্টিক রূপ দেওয়া হইত; এবং তাহাতে বিশ্বাস-প্রবণ জনসাধারণ সেই কার্য্যবিশেষের স্বর্গীয়তায় বিশ্বাসী হইয়া তদ্দ্বারা উপকৃত হইত।

গুল্মবিশেষের শিকড়ের রস পান করিলেই রোগবিশেষের উপশম হইবে, ইহা বলিলে প্রাচীনকালের লোকের হয়ত বিশ্বাস হইত না। তাই তদানীন্তন চিকিৎসকেরা বলিতেন, শনি-মঙ্গল বারের অমাবস্থার দুপুর রাতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে একটানে উক্ত গুল্মটী উপড়াইয়া এক কোপে তাহার শিকড় কাটিয়া সাত ঘাটের জল দ্বারা ধৌত করিয়া সহস্রবার কৃষ্ণনাম জপ করতঃ উহার রসনিষ্কাষণ করিয়া সাত কাঠের আগুনে উহাকে উত্তপ্ত করিয়া উহা পান করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত বুজরুকীর জন্য উক্ত গুল্মটীর দ্রব্যগুণকে ত আর আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। উপরোক্ত যৌগিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধেও আমাদিগকে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে হইবে। বুজরুকীর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়া ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

যাঁহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক হইতে ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, সুরতকদ্বয়ের দৈহিক আবশ্যকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ যে প্রক্রিয়া, তাহাতে তাহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। সম্প্রদায়বিশেষের সমস্ত লোক ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনে উপকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌সের মত উদ্ধৃত করিতেছি—Extremists in the practice of this idea would go so far as to prevent ejaculation on all occasions, but others use it only to increase the length of time between the occasions when ejaculations take place. Those demanding such self-control from man claim that it is within the power of

man to control by will and thought a reaction which is so generally looked upon as physical and almost involuntary. Whole communities are known to have practised such control successfully and healthily though I do not know of a few Britishmen who have done so. By many religious persons and some communities it is considered the highest form of self-control. অর্থাৎ শুক্র-স্খালনের উপর মানুষের কোনও হাত নাই, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই; বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মানুষ শুক্রস্খলনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ইংরাজ পুরুষগণের দু'চারজন মাত্র এই অভ্যাস করিলেও এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের সকলেই এই অভ্যাসে অভ্যস্ত। তাহাদের শরীরের কোনই অনিষ্ট হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি বীর্য্যস্তম্ভনকে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ মনে করিয়া থাকেন।

আমি বহুবার বলিয়াছি যে, সুরত-ক্রিয়া আনন্দ-ক্রীড়া মাত্র। ইহাকে কোনও মতেই ক্লান্তিজনক ও অবসাদক পরিশ্রমের কার্য্যে পরিণত করা উচিত নহে। যতবার সুরত-ক্রিয়া করা যায়, ততবারই শুক্রক্ষয় হেতু অবসন্ন হইয়া পড়িলে সুরত-কার্য্য কিছুতেই আনন্দ-কেলী থাকিতে পারে না। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা অনেক দৈহিক ক্রিয়াকেই যখন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, তখন শুক্রস্খালনকেই বা পারিব না কেন, তাহারও ত কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান নাই। ডাঃ ষ্টোপ্‌স বলিয়াছেন A strong will can often calm the nerves which regulate the blood supply and order the distended penis to retract

and subside without wasting the semen in an ejaculation. অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা রক্ত-নিয়ামক স্নায়ুসমূহকে শান্ত করতঃ শুক্রক্ষয় ব্যতিরেকে উত্তেজিত লিঙ্গকে পুনরায় নিস্তেজ করা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, সময় সময় এইভাবে শুক্রধারণ করিলে তাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে বটে, কিন্তু সর্ব্বদা এরূপ করিলে তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে। কোনও ব্যাপারেরই আতিশয্য ভাল নহে, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

রতি-সামর্থ্য লাভের জন্য চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যে প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি, উহা ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকে ত অভ্যাস করিতে পারেই, তাহা ছাড়া উত্তেজক ঔষধের যে অবসাদক প্রতিক্রিয়া আছে, এই প্রক্রিয়ায় তাহার আশঙ্কা বিদ্যমান নাই। ফলতঃ কি স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া, কি রতি-ক্রিয়ার পুলকের দিক দিয়া শুক্রস্খলন নিয়ন্ত্রণ অতীব প্রয়োজনীয়। মেরী ষ্টোপ্‌স বলিয়াছেন—The fullest delight even in a purely physical sense, can be attained only by those who curb and direct their natural impulses.

শুক্রধারণের এই যে যৌগিক সাধনা, উহা যে শরীর-বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটু পর্য্যবেক্ষণ সহকারে আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। পুরুষের যৌন-অঙ্গের ছেদিত চিত্রের প্রতি (১নং চিত্র) দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মূত্রাধার হইতে শুক্র নির্গমনের জন্য একটী নল আছে। ঠিক সেইরূপ অন্ত্র হইতে মল-নির্গমনের জন্য একটী সরলান্ত্র আছে। মূত্রাধারে খানিকটা মূত্র

এবং সরলান্ত্রে খানিকটা মল সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই মল ও মূত্র যখন তখন বহির্গত হয় না ; এমন কি মলমূত্র-বেগ হইলেও আমরা ইচ্ছামত উহার বেগ ধারণ করিতে পারি। সরলান্ত্র ও মূত্রনালীর স্বাভাবিক সঙ্কোচনশীলতা একার্য্যে আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা যখন মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারি, তখন শুক্রের বেগ ধারণ করিতে পারিব না কেন ? সকলেই জানেন, শুক্র মল-মূত্রের ন্যায় শরীরের আবর্জ্জনা নহে। মল-মূত্রের বহির্গমনের একটা স্বাভাবিক টান আছে, কারণ উহারা দৈহিক আবর্জ্জনা। কিন্তু শুক্র তাহা নহে ; উহা শরীরের পুষ্টিসাধক রসবিশেষ ; সুতরাং বহির্গমনের জন্য উহার কোনও স্বাভাবিক টান নাই। এতদ্ব্যতীত মলমূত্রের নিয়মিত নির্গমন যেমন আমাদের শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, শুক্র-নির্গমন আমাদের তেমন প্রাত্যহিক প্রয়োজন নহে। আমরা দীর্ঘদিন শুক্র-ধারণ করিয়া রাখিতে পারি ; কিন্তু মলমূত্র আমরা দীর্ঘদিন ধারণ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, শুক্র দেহ-পোষক বহু মূল্যবান উপাদান দ্বারা গঠিত। সুতরাং ইহা মনে করা নিতান্ত অন্যায় যে, ঘন ঘন শুক্র-স্খলন আমাদের শরীর ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। এইজন্যই আমাদের ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শুক্র-ধারণের পক্ষে এত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

আমার এতসব কথা বলিবার হেতু এই যে, আমি প্রমাণ করিতে চাই, দেহের উপর ইচ্ছা-শক্তির বিপুল প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার প্রতিপাদ্য এই :

(১) যৌন-বোধ দৈহিক ও মানসিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে, আবার দৈহিক ও মানসিক আকর্ষণও যৌন-বোধ জাগ্রত করে ;

(২) দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে পেশী ও স্নায়ু অতিশয় সহনশীল।

(৩) ব্যায়ামের অভ্যাসের দ্বারা মানুষ যেমন তাহার দেহের বাহ্য পেশী ও স্নায়ুসমূহকে বিস্ময়কররূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, যৌন-অঙ্গ সমূহের স্নায়ু ও পেশীর উপরও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এ-বিষয়ে সার টমাস্ ক্লষ্টন বলিয়াছেন—"Nature has so arranged matters that the more constantly control is exercised the more easy and effective it becomes ; it becomes a habit. সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, ক্রমবর্দ্ধমান সাধনার দ্বারা আমরা যে কোনও অভ্যাস আয়ত্ত করিতে পারি। শ্বাস-প্রশ্বাসের কথাই ধরা যাউক। মানুষের জীবন-মরণের গোড়ার কথা এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করা আপাতঃ দৃষ্টিতে অসম্ভব ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বোধ হইতে পারে। কিন্তু মানুষকে একাদিক্রমে কয়েক ঘণ্টা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

পেশী ও স্নায়ু শাসনের এই মূলসূত্র যৌন-ব্যাপারে প্রয়োগ করিলে আমরা দেখিতে পাই :

(ক) আমাদের শুক্র-স্খলনের উপর ইচ্ছা-শক্তির প্রবল প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্য কেবলমাত্র রতি-চিন্তাতেও অনেক সময় পুরুষের শুক্র স্খলিত হইয়া পড়ে।

(খ) মল ও মূত্রত্যাগের কামনা অন্যান্য সমস্ত বৃত্তি অপেক্ষা তীব্র ও দুর্নিবার। তবু আমরা দুইটী উপায় দ্বারা মলমূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি। প্রথমতঃ ইচ্ছা শক্তি, দ্বিতীয়তঃ বস্তিপ্রদেশের পৈশিক আকর্ষণ।

(গ) আমরা তলপেট সঙ্কুচিত ও আকৃষ্ট করিবার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকি, গুহ্যদ্বার-সঙ্কোচন তন্মধ্যে অন্যতম। আমরা মলমূত্র ত্যাগ উপলক্ষে প্রত্যহ অনেকবার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করিয়া থাকি।

(ঘ) এই কারণেই অনেক যৌন-বৈজ্ঞানিক পৃথক পৃথক সময়ে মলমূত্র ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যখন মলত্যাগ করে, তখন মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু সে যখন মূত্র ত্যাগ করে, তখন মলত্যাগ হয় না। আমরা কি অভ্যাসের দ্বারা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না? আমরা জানি যে, যখন মলবেগ হয়, তখন মল বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত মূত্র নির্গত হয় না। মলবেগ সরলান্ত্রে এবং ইহার সংলগ্ন সমস্ত পেশীতে এমন আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া থাকে যে, তাহাতে মূত্রনালী একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। এই পৈশিক আকর্ষণ অতি সহজেই শুক্র-নির্গমনের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। ইহাতে আমরা গুহ্যদ্বার-সঙ্কোচনের অর্থ ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারি।

সুতরাং যৌগিক প্রক্রিয়াসমূহ মূলতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সত্যের বিরোধী নহে, ইহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্য হইতে বুজরুকী-কেরামতীটুকু বাদ দিলে উহাদের শাস্ত্র-সম্মতত্তা ও কার্য্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে এতটুকু বেগ পাইতে হয় না। আমাদের মনে হয়, বীর্য্যধারণের যৌগিক প্রক্রিয়াসমূহের মূলনীতি গ্রহণ করিয়া আত্ম-সংযমের সাধনা আরম্ভ করিলেই আমাদের দাম্পত্য-জীবনে সুখের কিরণপাত হইবে।

রতি-কৃষ্টির অন্য উপায় ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী শাস্ত্রে রতি-কৃষ্টির বহুসংখ্যক ঔষধের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঔষধ গুণ-বিচারে

দুই প্রকার। এক প্রকার ঔষধে রতি-শক্তি ও বীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ঔষধকে রসায়ন বা বাজীকরণ ঔষধ বলে। অপর শ্রেণীর ঔষধে রতিক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ঔষধকে বীর্য্যস্তম্ভক ঔষধ বলে। প্রয়োগভেদেও এই সমস্ত দুই শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর ঔষধ সেবন করিতে হয়; অপর শ্রেণীর ঔষধ বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

ঔষধ প্রয়োগে রতি-কৃষ্টি

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বাজীকরণ ও বীর্য্য-স্তম্ভনের উল্লেখ আছে। 'বাজীকরণ' নাম হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রতি-ক্রিয়াকে কৃষ্টিসাধ্য ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। সুতরাং ঔষধ প্রয়োগে মানুষের রতি-শক্তি বৃদ্ধি হয়, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু স্বীকৃত হওয়া নহে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বাজীকরণ ও বীর্য্য-স্তম্ভনের অনেক প্রকার ঔষধের উল্লেখ আছে।

হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রেও বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের ঔষধে হাকিমী শাস্ত্র যতটা উন্নত, আর কোনও দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র এবিষয়ে ততটা উন্নত নহে। ইহার কারণ অনেকে এই বলিয়া অনুমান করেন যে, হাকিমী শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক নবাব-বাদশাহ্ ও আমির-ওমরাহগণ রতি-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করিবার জন্য হাকিমগণকে উৎসাহিত করিতেন। নবাব-বাদশাহ্‌দের অনেকেই রতি-বিষয়ে এতটা বিলাসী ছিলেন যে, তাঁহারা বেগমদের ছাড়াও হেরেমের মধ্যে শতসহস্র উপপত্নী বা বাঁদী-দাসী প্রতিপালন করিতেন। বলা বাহুল্য, নিজেদের রতি-বাসনা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই

এই সমস্ত বাঁদী-দাসী রাখা হইত। ইহাদের সকলের সহিত রতি-ক্রিয়া করিয়া পৌরুষ প্রদর্শনের বাসনা স্বভাবতঃই বাদশাহদের হইত। এজন্য রতি-শক্তি বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণের দিকে বাদশাহরা অধিক মনঃসংযোগ করিতেন এবং এই ব্যাপারে জলের মত টাকা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজা-বাদশাহ্‌দের দরবারী চিকিৎসকগণের খাইয়া-দাইয়া আর কোনও কাজ ছিল না! তাঁহারা দিবা-নিশি প্রভুর রতি-শক্তি বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিতেন এবং প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে প্রতিযোগিতা করিতেন! ফলে হাকিমী শাস্ত্রটা রতি-বিষয়ক ঔষধাবলীর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সত্যসত্যই এই দিক দিয়া হাকিমী-শাস্ত্র বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। হাকিমী শাস্ত্রে এমন অনেক ঔষধের উল্লেখ আছে, যাহা সেবনে পুরুষ অসাধারণ রতি-শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারে।

কিন্তু এলোপ্যাথী প্রভৃতি ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র রতি-বিষয়ক ঔষধাবলীতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। ইউরোপীয় যৌন-শাস্ত্রকারগণেরও এদিকে বিশেষ উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হয় না। যৌন-শাস্ত্রবিষয়ক বিখ্যাত বিখ্যাত বিরাটকায় পুস্তকেও এই দিককার সাধনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। উপরন্তু ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ প্রভৃতি দু'একজন যৌন-বৈজ্ঞানিক বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের সম্ভাব্যতাকেই বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'এণ্ডিওরিং প্যাশন' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সত্যিসত্যি রতি-শক্তিবর্দ্ধক কোনও ঔষধ আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। রতি-শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ বলিয়া যে সমস্ত রাবিশ বাজারে প্রচলিত আছে, বস্তুতঃ সেগুলি খাঁটী ঔষধ নামের অযোগ্য। ঐ সমস্ত তথাকথিত ঔষধ মানুষের দেহে

অস্বাভাবিক ও সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং পরিণামে সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ সৃষ্টি করিয়া মানব-দেহের অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই সমস্ত তথাকথিত ঔষধের সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত রাবিশের কাট্‌তি বেজায় বেশী। মানুষ অতি সহজেই এই সমস্ত রাবিশ-বিক্রেতাদের চাকচিক্যপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হইয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ উভয় দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।" মেরী ষ্টোপ্‌সের এই সমস্ত কথা যে কত সত্য, তাহার প্রমাণ আমাদের দেশে যত পাওয়া যাইবে, অন্য কোনও দেশে তত পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। সংবাদ-পত্র ও মাসিক কাগজের পৃষ্ঠা খুলিয়া এবং বিভিন্ন শহর-বাজারের রাস্তাঘাটে চলা-ফেরা করিতে গিয়া যে সমস্ত চটক্‌দার বিজ্ঞাপনের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার পনের আনা এই শ্রেণীর 'ঔষধের' বিজ্ঞাপন। সুতরাং ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌সের কথার সবটুকু সমর্থন করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। বাজারে লোক-ঠকানো ব্যবসা চলিতেছে বলিয়াই যে রতি-শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ শাস্ত্রে সত্যই নাই, একথা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কয়েকটী বিশেষ কারণে হাকিমী ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রতি-বিষয়ক ঔষধ আবিষ্কারের সাধনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালীর চেয়ে অনেক বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং মেরী ষ্টোপ্‌স্ প্রাচ্য-চিকিৎসাপ্রণালী সম্যকরূপে অধ্যয়ন না করিয়াই ঐ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত তথাকথিত ঔষধের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, ঐ সমস্ত ঔষধ সত্যই নিন্দার যোগ্য; শুধু নিন্দার যোগ্য নহে, আমাদের মতে আইনের বলে বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য। বস্তুতঃ আইনের দ্বারা বাজার-প্রচলিত বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের

"ঔষধ"সমূহ বন্ধ না করিলে দেশের গুরুতর অকল্যাণ হইবে। তাই বলিয়া একথা বলা যাইতে পারে না যে, রতি-শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ নাই বা থাকা সম্ভব ও উচিত নহে। প্রাচ্য চিকিৎসা-প্রণালীতে ত বহু খাঁটী ঔষধ আছেই, পরন্তু প্রতীচ্য চিকিৎসা-প্রণালীতেও উহা দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। ভিয়েনার নারী-রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বুয়ার বলিয়াছেন যে, পুরুষের রতি-শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ অসম্ভবও নহে দুষ্প্রাপ্যও নহে। প্রতীচ্য চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ও যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ আরও অধিক মাত্রায় প্রাচ্য যৌন-শাস্ত্রের সংস্পর্শে আসিলে দেখিতে পাইবেন, এ বিষয়ে হাকিমী ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র কত বেশী সম্পদশালী। তবে একথা সত্য যে, আধুনিক জগতের কর্ম্ম-প্রণালী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সকল শ্রেণীর মানুষকেই এতটা কর্ম্ম-ব্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, আগেকার দিনের নবাব-বাদশাদের মত নিষ্কর্ম্মা ও অলস শ্রেণীর স্থান বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একরূপ নাই বলিলেই চলে। আগেকার দিনে এই শ্রেণী শুইয়া বসিয়া কেবল কাম-চর্চ্চায় যেভাবে জীবন যাপন করিবার অবসর পাইত, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নহে। তজ্জন্য আগেকার দিনের মত রতি-চর্চ্চা আজকাল আবশ্যকও নহে, সম্ভবও নহে। তবু মানুষের দৈহিক ও ঐহিক সুখের চরম ও সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বৃত্তি রতি-বাসনায় আত্ম-বিকাশ করিয়া থাকে, এ কথা অস্বীকার করিলে মানব-জীবনকেই অস্বীকার করা হইবে: সুতরাং এই মানব-মনোবৃত্তি ও তাহার দৈহিক বিকাশের এই দিকটা উপেক্ষা করা যেমন অন্যায়, এই শক্তির কর্ষণকেও নিন্দা করা তেমনই অন্যায়। মেরী ষ্টোপ্‌স্‌ও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনিও অবশেষে ফস্‌ফরাস, ক্যালশিয়াম প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারা রতি-শক্তিবর্দ্ধনের

পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধকে তিনি রতি-বর্দ্ধক ও বাজী-করণের ঔষধ বলিতে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মেরী ষ্টোপ্সের রাগ কেবল নামের উপর। যে নামেই ডাকা হউক, রতি-শক্তি-বর্দ্ধক ঔষধ আছে এবং থাকা উচিত, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীকে রতি-সুখ দান করিতে গেলে পুরুষের যতটা রতি-শক্তি থাকা দরকার, নানা অবস্থা-বৈগুণ্যে অধিকাংশ পুরুষের তাহা নাই। এই জন্য ঐকিক বিবাহ-প্রথা এবং দাম্পত্য-জীবন দিন দিন অসুখের আকর হইয়া উঠিতেছে। দাম্পত্য-জীবনের এই আসন্ন বিপদ দূর করিতে হইলে পুরুষকে কলারূপে রতি-শক্তির কর্ষণ দ্বারা নারীর উপযোগী হইতে হইবে।

সেজন্য আমরা প্রাচ্য যৌন-শাস্ত্র, বিশেষ করিয়া ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় যৌন-শাস্ত্র, অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছি। বহু প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, মুদ্রিত ও হস্ত-লিখিত পুস্তক ঘাঁটিয়াছি। এই অধ্যয়নের ফলে বহু মূল্যবান ঔষধের সন্ধানও আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধের অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। চিকিৎসক ও রাসায়নিকগণ এই সমস্ত ব্যবস্থা-পত্র হইতে গবেষণা দ্বারা যদি কোনও অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাহাতে মানবের অশেষ কল্যাণ হইবে, এই ভরসা আমাদের আছে। অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি অনুদিন দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সেজন্য এই সমস্ত ব্যবস্থার একটা প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও আছে।

আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী শাস্ত্রকারগণ এই ব্যাপারে এতটা বিস্তৃত

গবেষণা করিয়াছেন যে, ইঁহারা নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক হইতে রতি-ক্রিয়াকে সম্যক সুখের আকর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৈহিক ও মানসিক কোনও দিক হইতেই রতি-ক্রিয়াকে ইঁহারা প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। সেজন্য ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিক একদিকে যেমন পুরুষের রতি-শক্তিকে বর্দ্ধিত, তাহার অঙ্গকে দীর্ঘ, শক্ত ও সবল ও স্থূল করিবার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে আবার নারীর অঙ্গকে সংকীর্ণ, উষ্ণ ও কোমল করিবার ঔষধও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহারা একদিকে ইচ্ছামাত্র লিঙ্গোদ্রেক করিবার মত ঔষধও যেমন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আবার সে উদ্রেককে দীর্ঘস্থায়ী করিবার ঔষধও তেমনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মানুষের অন্যান্য অঙ্গের ত্রুটী ও অপূর্ণতা যদি ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারে, তবে রতি-অঙ্গসমূহ কেন হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক কোনও গোড়ামী থাকা সঙ্গত হইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রতি-শক্তিকে কর্ষণের দ্বারা বর্দ্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত করা অন্যায় ত নহেই বরং অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ এ বিষয়ে আপত্তি হওয়া অন্ধ গোড়ামী ছাড়া কি? আমরা অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে কি করিয়া থাকি? রোগ হইলে ঔষধ প্রয়োগ করি, নীরোগ অবস্থায় ব্যায়াম করিয়া অঙ্গ পুষ্ট ও তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকি। অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে যাহা সত্য, যৌন-অঙ্গ সম্বন্ধে তাহা সত্য না হইবার বিশেষ কি কারণ আছে? হাত, পা, দাঁত, বুক, চুল প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি-চর্চ্চা ও প্রতিযোগিতায় এত উৎসাহ, এত পুরস্কার, এত মেডেল

দেওয়া হয়। অথচ মানবের সৃষ্টি ও সুখের গোড়াতে রহিয়াছে যে অঙ্গ, সেই অঙ্গের শক্তি- ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চাকে উৎসাহের পরিবর্ত্তে ধিক্কার দিয়া আসা হইতেছে; সমাজ ও রাষ্ট্রের এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির কি কোনও সঙ্গত কারণ আছে?

তথাপি বড় বড় ডাক্তাররা বলিয়াছেন যে, অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের রতি-শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারি। ডাঃ ফোরেল বলিয়াছেন, ব্যায়াম ও পরিচালনার দ্বারা পেশী, স্নায়ু, শিরা সমস্তই বৰ্দ্ধিত ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। মানুষের যৌন-অঙ্গ সম্বন্ধেও এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয় না। আমরা এত সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াও কেন এই পুস্তকে ঔষধের উল্লেখ করিলাম না, এ কথার উত্তরে বলিব যে আমাদের গবেষণার ফল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে নির্ভরযোগ্য উপাদান সংগ্রহে আমরা নিরস্ত হই নাই। এ পুস্তকে অমূলক পরমত-উদ্ধৃতির স্থান নাই এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। কামসূত্র, অনঙ্গরঙ্গ, বা ইউনানী ঔষধের পুস্তকে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশের প্রতিই ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌সের কঠোর মন্তব্য প্রযোজ্য।

রতি-ক্রিয়ায় নারীর স্তন

নারীর দেহের সৌন্দর্য্যের পিরামিড তাহার স্তনদ্বয়। সুডৌল উন্নত স্তন নারী-দেহের সৌন্দর্য্যকে কিরূপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহা সকল জাতির সকল শ্রেণীকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। ফলতঃ নারী-দেহের সৌন্দর্য্যের অর্দ্ধেকই তাহার স্তন।

অধিকন্তু রতি-ক্রিয়ায় নারীর স্তনের স্থান অতি উচ্চে। পুরুষ ও নারীর উভয়ের রতি-সুখের সম্পূর্ণতার জন্য নারী-স্তনের উপযোগিতা সমস্ত

যৌন-শাস্ত্রকার একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ যৌন-বৈজ্ঞানিক ভ্যান ডি ভেল্‌ডী তাঁহার Ideal Marriage নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: Many people, are obsessed with an entirely mistaken idea that it is the baby alone which should have the privilege of touching the woman's breast with its lips. They are quite ignorant of the fact that woman's breast is a sexual organ of the highest erotic value. We may stress the extreme sensitiveness of the nipples to contact by tongue or by definite suction. অর্থাৎ নারীর স্তনে কেবল সন্তানই মুখ দিবে, এ ধারণা অতীব ভ্রান্ত। নারীর স্তন তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন যৌন-অঙ্গ। স্তন চুম্বন করিয়া অথবা চুষিয়া নারীকে চরম পুলক দান করা যাইতে পারে।

মেরী ষ্টোপস্‌ রতি-ক্রিয়ায় নারীর স্তনের আবশ্যকতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: So unaware of the physilogical reaction of women are many men that they do not know that a husband's lips upon her breast melt a wife to tenderness and are one of husbands' first and surest ways to make her physically ready for complete union. অর্থাৎ নারীর স্তনের সহিত পুরুষের মুখ-সংযোগে নারীদেহে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়, অনেক পুরুষই সে সংবাদ রাখে না। নারীকে পরিপূর্ণরূপে রতিক্রিয়ায় রত করিতে হইলে পুরুষের পক্ষে নারীর স্তন-চুম্বন অত্যাবশ্যক।

বস্তুতঃ স্তন নারীর অন্যতম যৌন-অঙ্গ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আর উহা যে নারী-দেহের সৌন্দর্য্যের আকর এবং পুরুষের চক্ষে অতিশয় লোভনীয় তাহাও সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত। সুতরাং নারী-দেহের এই শ্রেষ্ঠ কাম- ও সৌন্দর্য্য-কেন্দ্রটী যাহাতে কোনও ক্রমে নষ্ট না হয়, ইহা নারী-পুরুষ উভয়েরই কাম্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নারী-দেহের এই সৌন্দর্য্যটী বিশেষ করিয়া প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণে সর্ব্বপ্রথম নষ্ট হয়। নারীর স্তনের যৌবন অতি অল্প কাল স্থায়ী। পূর্ণ যুবতী হইলেই নারী-দেহের এই নয়ন-রঞ্জন অংশটী পূর্ণতা লাভ করে; অথচ প্রথম সন্তান জন্মলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই স্তনদ্বয় হেলিয়া পড়িয়া সুডৌলত্ব ও সমস্ত সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে।

নারীর স্তনের পতনের জন্য মাতৃত্বই প্রধানতঃ দায়ী হইলেও পুরুষের অতিমাত্রায় মর্দ্দন স্তনের অনেকখানি অনিষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু এজন্য পুরুষকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ নারী-দেহের ঐ শ্রেষ্ঠতম বিলাস-দ্রব্যদ্বয়ের ব্যবহারেই উহার সার্থকতা। সুতরাং পুরুষ উহার স্পর্শন-মর্দ্দন হইতে বিরত থাকিলে তাহার ফলে নারী-পুরুষ উভয়ে অনেকখানি রতি-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

সুতরাং রতি-কার্য্যে নারী-স্তনের পূর্ণ ব্যবহার করিয়াও কিভাবে উহার আকৃতি নিটোল রাখিয়া উহার সৌন্দর্য্য অটল রাখা যায়, তাহা সমস্ত নারী-পুরুষেরই চেষ্টা হওয়া উচিত।

কিন্তু কোনও প্রক্রিয়া বা ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা নারী-দেহের এই সুন্দরতম অংশটীর সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় কি না, এই লইয়া প্রবল দুইটি বিরুদ্ধমত বিদ্যমান। পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও যৌন-শাস্ত্রজ্ঞগণের অভিমত এই যে, নারী-স্তন পতন মানবদেহের স্বাভাবিক এবং দুর্ব্বার পরিণতি ও

প্রতিক্রিয়া। মেরী ষ্টোপসের অভিমত এই যে, নারীর পতিত স্তনকে পুনর্ব্বার স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া আনা ঔষধ প্রয়োগে সম্ভব নহে।

সকলেই জানেন, নারী-স্তন কতকগুলি তন্তু দ্বারা গঠিত। পুরুষ-হাতের মর্দ্দনাদি না পড়িলেও স্ত্রীলোকের স্নায়ু- ও তন্তু-প্রধান স্তন কালক্রমে পতিত হইতে বাধ্য। তাই মেরী ষ্টোপস্ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, কোনও কারণে নারী-স্তন একবার দর্শন ও হস্তার্পণের অযোগ্য হইয়া পড়িলে হাজার ঔষধ প্রয়োগেও উহার আকৃতি ফিরাইয়া আনা অসম্ভব।

মানব-দেহের সমস্ত অঙ্গই রোগে অকাল-বার্দ্ধক্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা তাহার কোনই প্রতীকার হয় না, একথা কেহ বলে না। অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে যাহা সত্য, স্তন সম্বন্ধে সে কথা সত্য না হইবার কোনও কারণ নাই। বৃদ্ধ হইলে মানুষের চুল পাকিয়া যায়। এই পাকা চুলকে ঔষধ প্রয়োগে কাঁচা করিবার চেষ্টা কেহ করে না। কিন্তু বায়ু-রোগাদির ফলে অকালে চুল সাদা হইয়া গেলে সুচিকিৎসার দ্বারা তাহাকে কাঁচা করা যায়। ঠিক সেইরূপ বার্দ্ধক্যের ফলে যে নারীর স্তন শিথিল হইয়া গিয়াছে, চিকিৎসার দ্বারা তাহার স্তন শক্ত ও উন্নত করা না গেলেও, অতিরিক্ত মর্দ্দনে, অসুখে বা অতিরিক্ত প্রসবের ফলে যে সমস্ত নারীর স্তন অকালে শিথিল হইয়া গিয়াছে, ঔষধ প্রয়োগে তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যাইবে না কেন, তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিবার কথা নহে।

ঔষধ আছে বলিয়াই যে বাজারে আজকাল যে সমস্ত 'টাইট ব্রেষ্ট' 'বাষ্টোফেন' নামীয় ঔষধের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তই যে

ইহার ফলপ্রদ ঔষধ, তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালী যে এ্যালোপ্যাথী তাহাতে নারীর স্তন-রক্ষার কোনও ঔষধের কথা শুনা যায় না। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকগণের যে বিশেষ আগ্রহ আছে, তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কাজেই নারী-অঙ্গের এই দুর্ব্বলতায় নারী-পুরুষের নিরুপায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বহু প্রবঞ্চক আজ দেশের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া যাইতেছে। কারণ রতি-বাসনায় উদীপ্ত নারী-পুরুষ উভয়েই নারী-অঙ্গের এই সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডটীর সংরক্ষণের জন্য স্বভাবতঃই অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচ্য দেশীয় যৌন-শাস্ত্রে নারীর স্তনের রতি-উপযোগিতাকে যেমন উচ্চে স্থান দিয়াছে, স্তনের আকৃতি ও সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য সাধনা ও গবেষণাও তেমনই করিয়াছে। আমরা আরব, পারস্য ও মিশর দেশীয় বহু অপ্রকাশিত হস্ত-লিখিত যৌন-বিষয়ক পুস্তক পাঠে এই বিষয়ে অনেকটা জানিতে পারিয়াছি। ঐ সমস্ত ঔষধ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে মানুষ এ-বিষয়ে আমাদের মত নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট ছিল না। আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প সভ্য অনেক জাতির মধ্যে বর্ত্তমান যুগেও দেখিতে পাই যে, তাহাদের নারীরা এ বিষয়ে সভ্য জাতিসমূহের নারীদের চেয়ে ভাগ্যবতী। জাতি-গত ভাবে এই স্তন-ভাগ্যের কথা মনে হইলে, ইহাই সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয় যে, হয়ন শ্রেণীবিশেষের এমন কোনও মুষ্টিযোগ জানা আছে, যাহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হইলেও সভ্যজাতির দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

অথচ সভ্যজাতিসমূহ এই প্রাকৃতিক নিষ্ঠুরতার সামনে অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। যে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর বাহিরে সৌর-মণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধানে গবেষণায়

অপূর্ব্ব নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, সেই দেশের নারীরা স্তন-সৌন্দর্য্য-রক্ষায় হতাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তাহারা অতিশয় আঁটা-সাঁটা জামা গায় দিয়া লম্ফ-ঝম্ফ প্রভৃতি নানা প্রকার অঙ্গ-চালনা দ্বারা স্তনকে বৃদ্ধির সুযোগ না দিয়া স্তনবিলোপে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

দশম অধ্যায়

প্রজনন

জীবানুগম রহস্য—মানব-সৃষ্টির আদি কথা—বৈজ্ঞানিক মতবাদ—প্রজনন-বিজ্ঞানের ইতিহাস—সঙ্গমের ফল—বন্ধ্যাত্ব—গর্ভিণীর স্বাস্থ্য—প্রসূতির মৃত্যু—গর্ভ প্রকরণ—গর্ভ-লক্ষণ—গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া—গর্ভিণীর রুচি-বিকৃতি—নিদ্রা—স্তনের যত্ন—গর্ভাবস্থায় ব্যাধি-লক্ষণ—প্রসব—প্রসবের সময় নির্দ্ধারণ—আতুড় ঘর—প্রসবকালীন কর্ত্তব্য—প্রসূতির বেদনা-লাঘবের প্রক্রিয়া—প্রসবের পরে—আতুড় ঘরে সন্তান—শিশু-পালন—মাতৃ-স্তনের বদলে চুষিকাঠি—স্নানাহার—নিদ্রা—মলমূত্র—পোষাক-পরিচ্ছদ—ব্যায়াম—শিক্ষা—কবেটের মত—রোগের প্রতিষেধক—শিশু-মৃত্যু—ভ্রূণের লিঙ্গ-নির্দ্ধারণ।

জীবানুগম রহস্য

প্রকৃতি একটা বিপুল রহস্য-ভাণ্ডার। ইহার সৃষ্টি-রহস্য আরও বিচিত্র। সৌর-জগতের সহস্র গ্রহ-উপগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার মধ্যস্থ কোটী কোটী অণু-পরমাণু একটা বিরাট শক্তি-রহস্যের নিদর্শন। বিরাট রহস্যের এই লীলা-ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র আমার জীবন-রহস্য! মানুষ বিজ্ঞান-সাধনার বলে যে সমস্ত জটীল কলকব্জা আবিষ্কার করিয়াছে, প্রকৃতির জীবন-শক্তির বৈচিত্র্যের তুলনায় তাহা কত ক্ষুদ্র ও নগণ্য! প্রকৃতির ভিতরকার জীবনী-শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে কি বিচিত্র উপায়ে আত্ম-বিকাশ করিতেছে! ক্ষুদ্রতম জীবাণুও যে কত বড় বিরাট জীবনী-শক্তির আধার, তাহার প্রমাণ পাই আমরা কেবল তখনই, যখন একটী মাত্র পরমাণুকে এক মুহূর্ত্তে অনুরূপ জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন কোটী পরমাণুতে রূপান্তরিত দেখি।

বলা বাহুল্য, জীবন-রহস্যের মধ্যে আবার মানব-জীবন-রহস্যই সকল দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। এখানে মানবের জন্ম-রহস্যের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মানব-সৃষ্টির আদি কথা

মানব-জন্ম সম্বন্ধে ইহুদীদের মধ্যে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, সৃষ্টি-কর্ত্তা গোড়াতে আদম নামক একজন পুরুষ ও হাওয়া নাম্নী একজন নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত নর-নারী ঐ আদম-হাওয়ার সন্তান। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও ইসলাম মানব-সৃষ্টি উক্ত ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। মানব-সৃষ্টির সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু উহাদের কোনোটাই বিজ্ঞান-সম্মত নহে। বিজ্ঞান-সম্মত না হইলেও ইহুদী মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই খানে যে, উহাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে একটা সম্বন্ধ এবং সমস্ত মানবের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে।

এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু মতবাদ এই যে, মনুই আদি মানব। মনু একটী মৎস্যের সাহায্যে জল-প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়া হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করেন, এবং সেখানে বিভিন্ন জৈবিক উপাদানে একটী নারী সৃষ্টি করিয়া তাহার গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করেন। মনু-সংহিতার মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মানুষ চারিটী বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

বিভিন্ন ধর্ম্ম-মত ও বিভিন্ন জাতিতে মানব-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রায় সমস্তগুলিই ঐরূপ কোনও-না-কোনও আদি-মানবের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হয় ইউরোপে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন অভিব্যক্তি-বাদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটী সূত্র আবিষ্কার করেন।

বৈজ্ঞানিক মতবাদ

সহজ ও অবৈজ্ঞানিক ভাষায় সংক্ষেপতঃ তাঁহার অভিমত এই যে, আদিম জীবাণু প্রকৃতির শক্তি ও অবস্থা অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য নিত্য নূতন রূপ গ্রহণ করিতেছে (Variations)। বংশানুক্রমিকতা (Heredity) জীবাণুর রূপান্তর-গ্রহণ-ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিতেছে। ক্রমাগত সংগ্রামের দ্বারা (Struggle for existence) জীবাণু নিজেকে প্রকৃতির শক্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতির শক্তির উপযোগী হইবার জন্য জীবাণুকে গ্রহণযোগ্য নূতন রূপের বিচার (Selection) করিতে হইতেছে। এই কার্য্য সম্পাদনকালে প্রাকৃতিক, দৈহিক ও মানসিক কারণে জীবাণু-সমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে (Isolation) এবং এই ভাবে শ্রেণীর সৃষ্টি হইতেছে।

ডারউইন যখন ঐ মতবাদ লইয়া প্রথম বিজ্ঞান-জগতের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক সমস্ত সম্প্রদায় মিলিয়া তাঁহাকে এক-ঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সে বিরুদ্ধতার ঝড় কাটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার মত প্রায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গচালন, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, পরিপোষণ, বর্দ্ধন ও প্রজনন এই পাঁচটীই সাধারণ জীবন-লক্ষণ। জীবনী-শক্তির এই পাঁচটী লক্ষণই একটী বিরাট ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-সম্পন্ন মনঃশক্তির ক্রিয়া। জীবনী-শক্তির এই পাঁচটী

বিকাশ-ভঙ্গি লইয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখা প্রণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রজনন শাখাই আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

প্রজনন-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ বিষয়ে ধারাবাহিক গবেষণা করেন সর্ব্বপ্রথম এরিষ্টটল। তিনি প্রাণীকে

প্রজনন-বিজ্ঞানের ইতিহাস

দুই ভাগে বিভক্ত করেন : এক শ্রেণী যৌন-মিলনের ফল ; অপর শ্রেণী বিনা-যৌন-মিলনে প্রাকৃতিক শক্তি হইতে স্বতঃপ্রসূত। যৌন-মিলন-প্রসূত প্রাণীসমূহ সম্বন্ধে এরিষ্টটলের মত এই যে, নারীর ঋতুস্রাবের সহিত পুরুষের শুক্র মিশ্রিত হইয়া সন্তানোৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। নারীর দান জীবের প্রাণ-শক্তি এবং পুরুষের দান তাহার দৈহিক গঠন।

গ্যালেনের অভিমত এই যে, পুরুষের শুক্র তাহার অণ্ড-শিরায় উৎপন্ন হয় এবং নারীর শুক্র তাহার রক্তবাহী অণ্ড-শিরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উভয়ের শুক্র নারীর জরায়ুতে সংমিশ্রিত হইয়া ভ্রূণ উৎপাদিত হইয়া থাকে। প্রায় দশ শতাব্দী কাল এই মতবাদ প্রচলিত ছিল।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লসের গৃহ-চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে এ বিষয়ে নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হরিণীর উপর পরীক্ষা-কার্য্য চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এরিষ্টটল ও গ্যালেন উভয়ের মতবাদ ভ্রান্ত। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে না ; পরন্তু উহার সংস্পর্শে জরায়ুমধ্যে স্বতঃই একপ্রকার ডিম্ব উৎপন্ন হয়। উহাই ক্রমে ভ্রূণে পরিণত হয়।

ইহার পর লিডেনের ডাঃ সোয়ামার্ডেম, ভন হর্ণ, ষ্টেনসেন, ডি গ্রাফ্ প্রভৃতি গবেষকগণ এ বিষয়ে সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হন। ডি গ্রাফ্

১৬৬৮ ও ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে দুইখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রজনন-বিষয়ে বিজ্ঞান-জগতকে সম্পূর্ণ নূতন সত্য দান করেন। তিনি খরগোসের উপর পরীক্ষা-কার্য্য চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জরায়ুর মধ্যে ডিম্ব সৃষ্টি হয় না ; বরঞ্চ ফ্যালোপিয়ান নল বাহিয়া উহা জরায়ুতে আগমন করিয়া থাকে।

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে লুয়েনহক্ সর্ব্বপ্রথম শুক্রকীট আবিষ্কার করেন। কিন্তু শুক্রকীটকেই তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিয়াছিলেন। নারীর ডিম্বের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি একেবারে অস্বীকার করিতেন। লুয়েনহকের শুক্রকীটের মতবাদকে তাঁহার শিষ্যগণ এতদূর প্রাধান্য দিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, উহা যুক্তির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তদীয় জনৈক শিষ্য অণুবীক্ষণ-সাহায্যে নাকি শুক্রকীটের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব দর্শন করিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় সত্তর বৎসর পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ভন হেলার ভেড়ীর উপর পরীক্ষা-কার্য্য চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ডিম্বাধার হইতে কোনও-একটা-কিছু জরায়ুতে আগমন করিবার ফলেই তথায় ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জেনেভার প্রিভোষ্ট ও ডুমা নামক দুইজন তরুণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে, শুক্রকীট পুরুষের অণ্ডকোষে উৎপন্ন হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ভন্ বেয়ার সর্ব্বপ্রথম নারীর ডিম্ব আবিষ্কার করেন। তিনি কুকুরের উপর পরীক্ষা-কার্য্য চালাইয়া বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ জরায়ু হইতে ফ্যালোপিয়ান নলের দিকে অগ্রসর হইয়া ডিম্বাধারের মধ্যে ডিম্ব আবিষ্কার করেন।

দশম অধ্যায়

ইহার পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হার্টউইগ যখন ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলন আবিষ্কার করেন, তখন প্রজনন-বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্তুতঃ জীবের জন্মের ইহাই ইতিহাস। পুরুষের একটী মাত্র শুক্রকীট নারীর একটী মাত্র ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রূণের রূপ প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং প্রত্যেক প্রাণীর জন্মের গোড়ার কথা পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বের সংমিশ্রণ। শুক্রকীট ও ডিম্বের সংমিশ্রণের জন্য প্রয়োজন নর-নারীর যৌন-সম্মিলন। অবশ্য নারী-পুরুষের যৌন-সম্মিলন ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বের মিলন সংঘটন করিয়া সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু উহাকে কিছুতেই স্বাভাবিক প্রজনন-ক্রিয়া বলা যাইতে পারে না। উহা দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইলেও উহা স্পষ্টতঃ যৌন-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নহে। সুতরাং নারী-পুরুষের যৌন-মিলনে যে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য।

* * * * *

* * * *

* * *
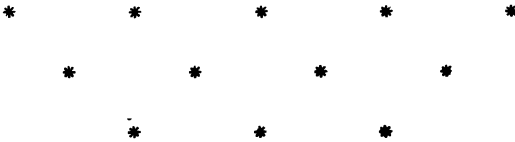
নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফলের দিক হইতে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বিবাহের পরিণাম—সন্তানের জন্ম। নারী-পুরুষ উভয়েই হয়ত বা সমান পুলকে, সমান উৎসাহে রতি-ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের কর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শুক্রস্খলনের সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষের দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু নারীর দায়িত্ব প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয় মাত্র। মানসিক পরিস্থিতির দিক হইতেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ডাঃ কোর্টনে বীলের মতে, পুরুষ চায় তাহার প্রিয়তমাকে তাহার প্রণয়িনী স্ত্রীরূপে পাইতে। আর নারী চায় তাহার প্রিয়তমকে নিজের সন্তানের পিতারূপে পাইতে। পুরুষের অন্তরে সাধারণতঃ পিতৃত্ব সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া থাকে; নিজের ঔরস-জাত সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার পূর্ব্বে সে সেই পিতৃত্বের কোনও সন্ধান রাখে না। কিন্তু নারীর মাতৃত্ব অর্দ্ধ-জাগ্রত হয় তখনই—যখন সে শৈশবে পুতুল লইয়া খেলা করে।

সঙ্গমের ফল

অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে হয় না তাহা নহে। এমন অনেক নারী আছে, যাহাদের মধ্যে মাতৃত্ব-বোধ অতিশয় অল্প এবং এমন অনেক পুরুষ আছে, যাহারা সন্তানের অস্তিত্ব ব্যতীত বিবাহের কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে, ব্যতিক্রম মাত্র। নারী-ও পুরুষ-মনোবৃত্তিতে এই পার্থক্যের দৈহিক কারণ আছে। পিতৃত্ব একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু মাতৃত্ব আকস্মিক নহে—নারীকে দীর্ঘ দিন ধরিয়া মাতৃত্বের সাধনা করিতে হয়; নিজের রক্ত দিয়া সন্তানের রক্ত, নিজের অস্থি দিয়া সন্তানের অস্থি, নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়।

সত্য বটে, সঙ্গমের পরিণাম নারীর পক্ষে পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দপ্রদ ; কিন্তু উহা তাহার পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। সন্তান জন্মদান-কার্য্যে প্রসূতিকে তাহার জীবনী-শক্তির কতটা দিতে হয়, তাহা সকলেই জানেন। প্রত্যেক সন্তান-ধারণে ও জন্ম-দানে নারীকে কি ভাবে আত্ম-দানের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, সে কথাও সকলেরই জানা আছে। তবু নারীর মাতৃত্বের সাধ এত তীব্র যে, অধিকাংশ নারী বিবাহ-জীবনের দু'চার বৎসরের মধ্যে মাতৃত্ব লাভ করিতে না পারিলে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। অনুর্ব্বর বিবাহের জন্য অধিকাংশ স্থলে নারী অপেক্ষা পুরুষই অধিকতর দোষী হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক-মনোবৃত্তি অনুসারে ঐ অনুর্ব্বরতার জন্য প্রধানতঃ নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, অনুর্ব্বর বিবাহে নারী যতটা যাতনা বোধ করে, পুরুষ ততটা করে না।

কারণ নারী স্বভাবতঃই মা। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে নারী চিরন্তনী মা ও পুরুষ চিরন্তন সন্তান। নারীর মাতৃত্বের ক্ষুধা এত তীব্র যে, নিজের গর্ভে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ না করিলে তাহার প্রিয় স্বামীকেই নিজের পেটের সন্তানের মত আদর যত্ন করিয়া ভালবাসিয়া আনন্দ পাইয়া থাকে। প্রণয়ী দম্পতির ইহা একটা প্রায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, তাহারা সন্তানহীন হইলেই স্ত্রী স্বামীর উপর মাতৃত্বের সমস্ত অধিকার বিস্তার করিয়া বসে। সুতরাং স্ত্রীর দিক হইতে বিবাহের আদর্শ ও আনন্দজনক পরিণাম সন্তানের জন্মদান।

পুরুষের দিক হইতেও পিতৃত্বই আদর্শ হওয়া উচিত। কারণ বিবাহ-সম্বন্ধ কেবলমাত্র যৌন-তৃপ্তির উপায় নহে। ইহার ভিতর দিয়া

পুরুষকে আত্ম-বিকাশ লাভ করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে পরমাত্মিক যে সৃষ্টি-ক্ষুধা লুক্কায়িত আছে, তাহার সাফল্য আত্ম-বিকাশে, সন্তান-সৃষ্টিতে। স্রষ্টার প্রতিবিম্ব মানুষের মধ্যে পতিত হইয়া মানুষকে স্রষ্টার যে রূপ দান করিয়াছে, সে রূপের বিকাশ ত সৃষ্টিতে। তাহা ছাড়া আত্ম-কেন্দ্রী সুখ মানুষের আদর্শ নহে। সন্তান মানুষকে যে দায়িত্ব, যে কর্ত্তব্য এবং যে সাধনার সম্মুখীন করে, মানব-জীবনের সার্থকতা সেই দায়িত্ব-বহনে, সেই কর্ত্তব্যপালনে এবং সেই সাধনার সফলতায়। সন্তান-প্রেমের ভিতর দিয়াই মানুষের বিশ্ব-প্রেমের দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং রতি-ক্রিয়ার চরম সাফল্য গর্ভাধানে। দাম্পত্য-জীবনের চরম সাফল্য সন্তান-জন্মদানে।

নির্দ্দোষ ও নীরোগ দম্পতির মিলনে সন্তান জন্ম লাভ করিবেই, ইহা সাধারণ কথা, প্রকৃতির সুনির্দ্দিষ্ট আইন। তবু অনেক বাহ্যতঃ সুস্থ দম্পতির যৌন-মিলন যে নিষ্ফল হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ তাহারা

বন্ধ্যাত্ব

বাহ্যতঃ সুস্থ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের উভয়ে কিম্বা একজন নিশ্চয়ই অসুস্থ। "বিয়ে করলেই পুত্র-কন্যা আসে যেমন প্রবল বন্যা" এটাও যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, অনুর্ব্বর বিবাহও তেমনই বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং বন্ধ্যাত্বকে অদৃষ্টের লেখা বলিয়া সহিয়া না লইয়া উহার প্রতীকার চেষ্টা করা উচিত।

আমি আগেই বলিয়াছি, অনুর্ব্বর বিবাহের জন্য সমস্ত দোষ নারীর ঘাড়ে চাপাইয়া পুরুষ নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সত্যের সম্মুখীন হইবার কোনও প্রয়াস সে পাইতেছে না।

নারী বন্ধ্যা হইতে পারে দুই কারণে। প্রথমতঃ রতিক্রিয়ার সময়ে

নারীর যোনি-প্রাচীর হইতে যে রস ক্ষরিত হয়, সে রসে যদি লবণ জাতীয় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, তবে ঐ লবণ জাতীয় নিঃস্রাব পুরুষের শুক্রকীট ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জরায়ুমুখে অধিকমাত্রায় শ্লেষ্মা স্রাব হইলে তদ্দ্বারা শুক্রকীট বিধৌত হইয়া যাইতে পারে। এই দুইটী কারণই সামান্য চেষ্টায় দূরীভূত করা যাইতে পারে। সঙ্গমে রত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বল্প-শক্তিসম্পন্ন কার্ব্বন সোডা জলে গুলিয়া সেই জল দ্বারা পিচকারী সাহায্যে যোনি ধুইয়া দিলে যোনির লবণাক্ত স্রাবের দ্বারা শুক্রকীটের কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না। আর রতিক্রিয়ায় নারী একটু অধিক মাত্রায় সকর্ম্মক হইলেই নারীর পক্ষে পুলকাবেগ লাভ হইতে পারে। অনেক নারী পুলকাবেগ লাভ করিয়াও সন্তান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যে সমস্ত নারীর জরায়ুমুখ বেশীমাত্রায় শ্লেষ্মাবৃত হয়, পুলকাবেগ ব্যতিরেকে তাহারা সন্তান লাভ করিতে পারে না।

ঐ দুইটী কারণ ব্যতীত আরও একটী কারণ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেছে জরায়ু-মুখের স্থিতি। জরায়ু-মুখ যদি যোনি-নালীর ঠিক সম্মুখে না থাকিয়া এদিক-ওদিক অবস্থিত থাকে, তবে কখনও কখনও শুক্রকীট জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতেও প্রজনন-কার্য্যের অসুবিধা হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকারও বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। রতিক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই নারী যদি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া উপুড় হইয়া কয়েক ঘণ্টা শুইয়া থাকে, তবে জরায়ু যোনি-নালীর অধিকতর সন্নিকট ও জরায়ু-মুখ যোনি-নালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণসমূহের একটীও যদি সুস্পষ্ট না হয় এবং তবু যদি সন্তান লাভ না, হয় তবে দম্পতির ঐ সব দিনে রতিক্রিয়া করা উচিত, যে সব দিনে সাধারণতঃ শুক্রপাত হইলেই গর্ভাধান হইয়া থাকে। মেরী ষ্টোপসের অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, ঋতুস্রাবের পূর্ব্ব দিন এবং ঋতুস্রাবের পর দুইদিন নারীর জরায়ুমুখে শুক্র পতিত হইলেই তদ্দ্বারা গর্ভ হওয়া একরূপ অবধারিত।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাম্পত্য অনুর্ব্বরতার জন্য পুরুষও খানিকটা দায়ী। মেরী ষ্টোপসের মতে এই অনুর্ব্বরতার জন্য পুরুষ নারীর চেয়ে কোনও অংশে কম দোষী নহে। ডাঃ হেন্‌রী কিশের মতানুসারে বন্ধ্যাত্বের জন্য পুরুষের দায়িত্ব অতি সামান্য। কিন্তু ইহা নারী-পুরুষের মধ্যে দোষ ভাগাভাগির চেষ্টা মাত্র। বন্ধ্যাত্বের জন্য পুরুষ যে বহুলাংশে দায়ী ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাই, নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক শর্ত্ত পূর্ণ হইলেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে :

(১) ডিম্বকোষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই,

(২) পুরুষের শুক্রকীট সতেজ থাকা চাই,

(৩) উক্ত ডিম্বে ও শুক্রকীটে সম্মিলন হওয়া চাই,

(৪) নারীর জরায়ু সন্তান ধারণে সক্ষম হওয়া চাই।

উপরোক্ত কারণসমূহ বিচার করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গর্ভাধানে নারীর ডিম্ব যেমন নির্দ্দোষ হওয়া প্রয়োজন, পুরুষের শুক্রকীটও তেমনই সতেজ হওয়া প্রয়োজন। শুক্রকীট সতেজ না থাকিলে তদ্দ্বারা কোনও প্রকারেই সন্তানোৎপাদনের কার্য্য চলিতে পারে না। তাই

যদি হয়, তবে দাম্পত্য অনুর্ব্বরতায় পুরুষ দায়ী না হইবার কোনও যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই।

পুরুষগণের শুক্রকীট নিস্তেজ হইবার দুইটী কারণ আছে। একটী এই যে, আজকাল অধিকাংশ পুরুষ গণোরিয়া, সিফিলিসে আক্রান্ত হইয়া উৎপাদিকা-শক্তি হারাইয়া ফেলে।

গণোরিয়া ও সিফিলিসের আক্রমণ-হেতু নারী-পুরুষ উভয়েই বন্ধ্যা হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ রোগ দ্বারা প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ পুরুষই আক্রান্ত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার ডাঃ অ্যাট্‌কিন্‌সন ও ডাঃ ডাকিন তাঁহাদের Sex Hygiene and Sex Education নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার ১৯১৭ সনের সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টে যে ১০৯২টী গণোরিয়া-রোগীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৫৭টী পুরুষ ও ১৩৫টী স্ত্রীলোক। ঐ রিপোর্টে যে ৩৫৫টী সিফিলিস-রোগীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬৭টী পুরুষ ও ৮৭টী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের এই শ্রেণীর রোগ অনেক স্থলে গোপন রাখা হয় বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া সরকারের ঐ রিপোর্ট নির্ভুল নাও হইতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ঐ অনুপাত সত্য।

তাহা ছাড়া, গণোরিয়া-সিফিলিসের দ্বারা পুরুষের শুক্রকীট আক্রান্ত হয় এবং হইয়া উক্ত রোগদ্বয় পুরুষের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই উভয় রোগেই পুরুষের মুখশায়ী গ্রন্থি আক্রান্ত হইয়া অণ্ড হইতে মূত্র-নালীতে শুক্রকীট গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, পুরুষের রতি-শক্তি অটুট থাকা সত্ত্বেও তাহারা বন্ধ্যা হইয়া যায়। এই অবস্থায় রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের যে শুক্র স্খলিত হয়, তাহা

বস্তুতঃ মুখশায়ী গ্রন্থির রস মাত্র—শুক্রকীটপূর্ণ খাঁটি শুক্র নহে। সুতরাং উহাদ্বারা সন্তান উৎপাদনের ক্রিয়া চলিতে পারে না।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে প্রসূতি পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রসবকার্য্যে প্রসূতির পক্ষে মরিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যাহারা কোন গতিকে বাঁচিয়া যায়, তাহাদের বাঁচিয়া থাকাকে পুনর্জ্জন্ম বলা যাইতে পারে।

গর্ভিণীর-স্বাস্থ্য

আমাদের দেশে এই মনোভাব-সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে আমাদের দেশের অসংখ্য প্রসূতি-মৃত্যু। স্বাস্থ্য-নীতির নিয়মাদি রীতিমত পালন করিলে এবং প্রয়োজন মত চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা হইলে প্রসবকার্য্য মল-মূত্র ত্যাগের ন্যায় অন্যান্য প্রাকৃতিক বিধানের চেয়ে খুব বেশী বিপজ্জনক নহে। অস্বাস্থ্যকর স্থান, স্বাস্থ্য-বিরোধী খাদ্য-দ্রব্য, স্বাস্থ্য-নীতি-বিরোধী অভ্যাস শুধু যে প্রসূতির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে, তাহা নহে। তদ্দ্বারা উদরস্থ সন্তানেরও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। সন্তানের শারীরিক গঠন অনেকাংশে প্রসূতির অভ্যাস ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় আমরা স্বাস্থ্য-নীতির দু'একটী সূত্র অমান্য করিয়া চলিলেও সত্বর তাহার কুফল ভোগ করি না। কিন্তু পোয়াতি অবস্থায় আমরা যে নিয়ম ভঙ্গ করি, সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। সুতরাং গর্ভাবস্থায় যত্নের সহিত স্বাস্থ্য-নীতি পালন করিয়া চলা উচিত।

বর্ত্তমান ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট গর্ভিণী-মৃত্যু সম্বন্ধে একটী ইস্‌তাহার জারী করিয়াছেন। তাহাতে সরকার বলিয়াছেন,

অন্যান্য দেশের তুলনায় গর্ভিণী-মৃত্যু ভারতবর্ষে অনেক বেশী।

প্রসূতি-মৃত্যু

এতৎসম্পর্কে সরকার যে তুলনা-মূলক হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় :—

হল্যাণ্ডে	প্রতি-হাজারে	মরে	২.৪
ফ্রান্সে	"	"	২.৫
সুইডেনে	"	"	২.৬
ডেনমার্কে	"	"	২.৬
নরওয়েতে	"	"	২.৮
ইটালীতে	"	"	২.৮
জাপানে	"	"	২.৮
ইংলণ্ডে	"	"	৪.০
সুইজারলণ্ডে	"	"	৪.৪
আয়র্লণ্ডে	"	"	৪.৮
অষ্ট্রেলিয়ায়	"	"	৫.৫
স্কটল্যাণ্ডে	"	"	৬.৬
আমেরিকায়	"	"	৮.৩
ভারতবর্ষে	"	"	২৪.৫
আসামের চা-বাগানে	"	"	৪২.০

উক্ত সরকারী ইস্‌তাহারে আরও প্রকাশ যে ডাঃ মার্গারেট বেলফোর (Dr. Margaret Balfour) ও সার জন মেগো (Sir John Megaw) এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গলায় গর্ভিণীরা সাধারণতঃ এক্লেম্‌শিয়া (Eclampsia) ও দিল্লী,

পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে অষ্টিওমেলেশিয়া (Osteomalacia) রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। সার জন মেগোর সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর দুই লক্ষ গর্ভিণী মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

১৯৩১ সনের আদমশুমারীর সময় প্রসূতিদের যে হিসাব করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ভারতের প্রত্যেক নারী গড়ে ৪'২ জন সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। এই সূত্র ধরিয়া উক্ত সরকারী ইস্তাহারে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সার জন মেগোর প্রদত্ত হাজার করা ২৪'৫ জনের হিসাব ঠিক নহে; প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে একশত প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিতেছে।

বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ১৯৩৩ সনের যে স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, ১৯৩২ সনে বঙ্গদেশে মোট ১১,৫২৫ জন ও ১৯৩৩ সনে মোট ১৪,২২৪ জন প্রসূতি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

মৃত্যু-হারের এই উচ্চতার কারণ বহু, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই যে তন্মধ্যে প্রধান, সেকথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রসূতি-মৃত্যু-হারের এই উচ্চতা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে-সমস্ত প্রসূতি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল নহে। সুতরাং প্রসূতিগণের স্বাস্থ্যের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। প্রসূতি-চর্য্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হইলে গর্ভাধান, প্রসব ও সমস্ত যৌন-ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

৭নং চিত্র
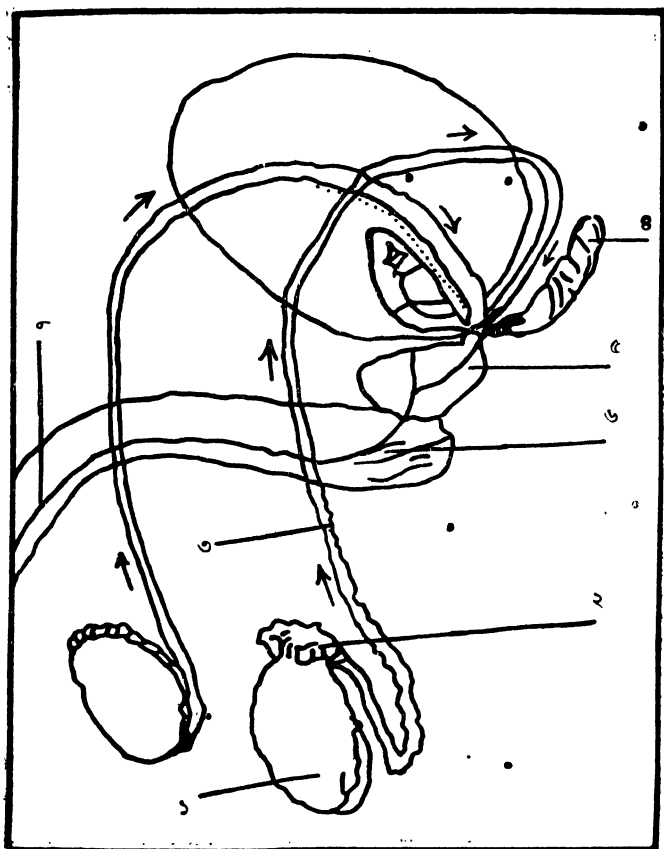
১। অণ্ডকোষ, ২। এপিডাইডেমিস্, ৩। শুক্রকীটবাহী শিরা, ৪। শুক্রকোষ (২টী দুই দিকে) ৫। প্রষ্টেট গ্রন্থি, ৬।৭ মূত্রনালী।

৭নং চিত্রে শুক্রকীট অণ্ডকোষের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন হইয়া কি করিয়া উপরের দিকে ধাবিত হয় এবং শুক্রকোষে গিয়া সঞ্চিত থাকে তাহা বুঝান হইয়াছে। শুক্রকোষ হইতে প্রষ্টেট গ্রন্থির ভিতর দিয়া মূত্রনালী বাহিয়া উহারা স্খলনের সময় বাহির হইয়া থাকে। শুক্রকীট বিভিন্ন গ্রন্থির রসে ভাসমান অবস্থায় চলে।

৮নং চিত্র ৯নং চিত্র

এক বিন্দু শুক্রে শুক্রকীটের অবস্থান।
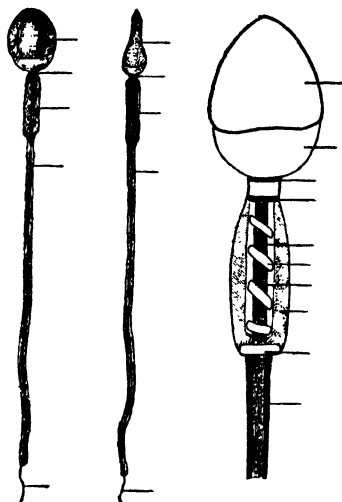
আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্ব এই উভয়ের মিশ্রণেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শুক্রে বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জল এই চারিটী মহাভূতের অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। আধুনিক

গর্ভ-প্রকরণ

চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভিমত এই যে, অণ্ড, মুখশায়ী গ্রন্থি, মূত্রনালী, শুক্র-কোষ প্রভৃতি বিভিন্ন মাংস-গ্রন্থি হইতে নিঃসারিত বিভিন্ন রসের সংমিশ্রণই শুক্র। এক বিন্দু শুক্রে অসংখ্য শুক্রকীট বিদ্যমান আছে। (৮নং চিত্র)

শুক্রকীট গতিশীল। ইহারা দেখিতে কতকটা বেঙাচির মত। বেঙাচির মাথা অপেক্ষা শুক্র-কীটের মাথা সরু। শুক্র-কীটের লেজ বেঙাচির লেজ অপেক্ষা লম্বা। (৯নং চিত্র)

নারীর জরায়ুর উর্দ্ধাংশে দুই কোণে ফ্যালোপিয়ান নল নামক দুইটী ডিম্ববাহী নল আছে, সেকথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত জরায়ুর দুই পার্শ্বে প্রশস্ত বন্ধনীদ্বয়ের পশ্চাৎভাগে দুইটি অণ্ডাধার অবস্থিত। ইহারা দেখিতে ডিম্বের ন্যায়। ঋতুকালে এই অণ্ডাধার ফাটিয়া অসংখ্য অণ্ড ডিম্ববাহী নলের ঝালরসদৃশ মুখে পতিত হইয়া নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। (১০নং চিত্র)

প্রত্যেকবারের সঙ্গমেই যদিও পুরুষের শুক্র-কীট স্খলিত হয়, তবুও প্রত্যেকবারের সঙ্গমে গর্ভাধান হয় না। কারণ প্রত্যেকবারের শুক্রস্খলনে পুরুষ লক্ষ লক্ষ শুক্র-কীট নিঃসরণ করিলেও প্রত্যেক সঙ্গমে নারীর ডিম্ব নির্গত হয় না। প্রত্যেক নারী সাধারণতঃ মাসে দুই একটি মাত্র ডিম্ব স্খালন করিয়া থাকে। ডিম্ব- ও শুক্রকীট-স্খলনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুরুষের শুক্র-কীট যৌন-আবেগের সময় শুক্রস্খলনের সহিত নিঃসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু নারীর ডিম্বস্খলনের সহিত রতি-ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ডিম্ব-কোষস্থ যে ডিম্বটী যখন পরিপক্ব ও পরিপুষ্ট হয় তখনই সেই ডিম্বটী আপনা হইতেই ফাটিয়া যায় এবং ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর দিয়া ১১নং চিত্রে-প্রদর্শিত পথে জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই কার্য্যটি নারীর ইচ্ছা-

১০নং চিত্র
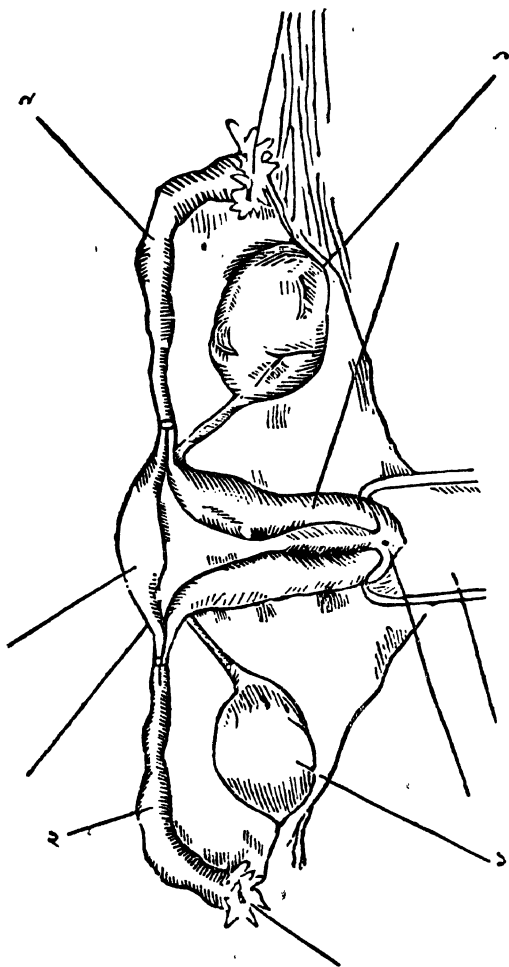
১। ডিম্বাধার ২। ফ্যালোপিয়ান নল

১১নং চিত্র

(১) ডিম্বাধার (২) ডিম্ববাহী নলের মুখ (৩) ডিম্বনলের ভিতর দিয়া ডিম্ব জরায়ুতে যাইতেছে।
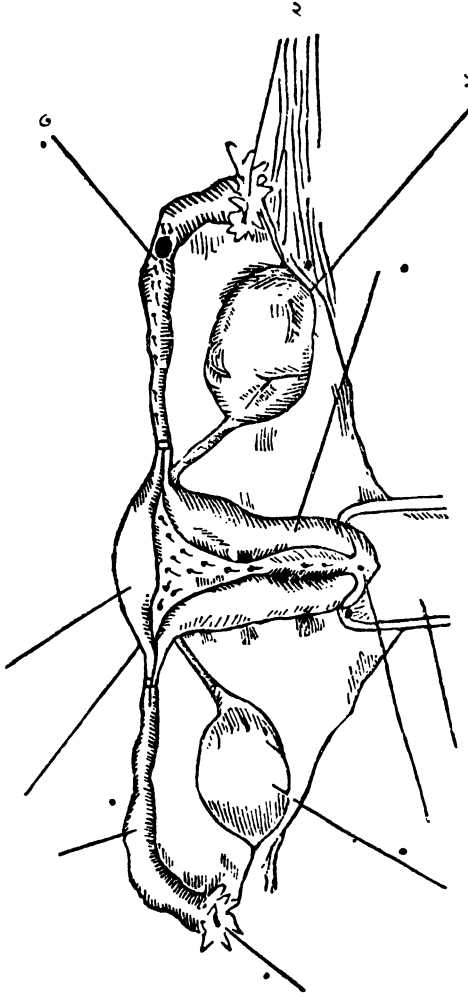
অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শুক্রকীট কি করিয়া বিচরণ করিতে থাকে ১১নং চিত্রে তাহাও দেখান হইয়াছে।

পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুমুখে পতিত হইলে শুক্র-কীটগুলি লেজ নাড়িয়া চলিতে চলিতে জরায়ুতে প্রবেশ করে। জরায়ুর মধ্যে ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলেই ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। প্রজননক্রিয়ার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ডিম্ব ও শুক্রকীটের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, শুক্রকীট ডিম্বের দিকে এমন সবলে আকৃষ্ট হয় যে, শুক্রকীট জরায়ুর মধ্যে ডিম্বের সাক্ষাৎ না পাইলে ডিম্বের সন্ধানে ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানেও ডিম্বের সন্ধান না পাইলে আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ডিম্ববাহী নলের অপর প্রান্তে বস্তী-কোঠরে পতিত হয়। ১১নং চিত্রে ইহার দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

শুক্রকীট ও ডিম্বের সংমিশ্রণ হইলেই সমস্ত শুক্রকীট ডিম্বকে ঘেরিয়া ফেলে। এই সমস্ত শুক্রকীটের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগামী শুক্রকীট ডিম্বগাত্রে সজোরে মাথা ঠুকিয়া একটু গর্ত্তের সৃষ্টি করে এবং এই গর্ত্তে ক্রমশঃ ছিদ্র করিয়া ডিম্বের ভিতর প্রবেশ করে; কিন্তু কীটের লম্বা লেজটী বাহির হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ লেজটী নিস্তেজ ও অচল হইয়া লোপপ্রাপ্ত হয়। শুক্রকীটের মাথা ও মধ্যভাগ দ্বারা এইভাবে যে একটী অঙ্কুর সৃষ্টি হয়, তাহাই পুরুষাঙ্কুর। ডিম্বের কেন্দ্রস্থলে স্ত্রী-অঙ্কুর অবস্থিত থাকে। পূর্ব্বোক্ত পুরুষাঙ্কুর তৎপর ক্রমে ডিম্বের কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হইয়া স্ত্রী-অঙ্কুরের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। ১২নং চিত্র।

শুক্রকীট ও ডিম্বের মিশ্রণ ও ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়ার মধ্যে আর একটা

অধ্যায় রহিয়াছে। শুক্রকীট ও ডিম্ব একত্রে সংমিশ্রিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ডিম্বটী বহিরাবরণের মধ্যেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ দুইভাগ চারিভাগে, চারিভাগ ষোল ভাগে এবং এইভাবে জ্যামিতিক বিভাগ-ক্রমে ডিম্বটী অসংখ্য অণুতে পরিণত হয়। ১৩ ও ১৪নং চিত্র। এই সমস্ত অণু বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের রূপপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ভ্রূণটী মানবদেহে পরিণত হয়। ১৫নং চিত্র।

১২নং চিত্র
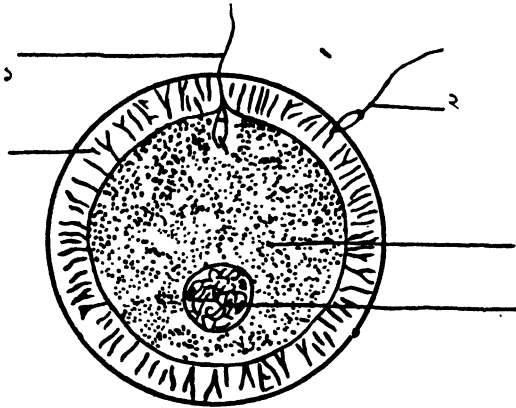
(১) ডিম্বে প্রবিষ্ট শুক্রকীটের লেজ।

(২) এই শুক্রকীটটী ডিম্বে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এইস্থলে অপেক্ষাকৃত জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী বিজ্ঞানের ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। জীবাণু বা Cell-কেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবদেহের ক্ষুদ্রতম অংশ (Unit of living organism) বলা হইত। বিংশ শতাব্দীতে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে এই মতবাদও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ "জেনি" (Gene)

নামক জীব-পরমাণুর সমষ্টি লইয়া আবার Cell বা জীবাণু গঠিত হয়। অধ্যাপক হার্ষ্ট (G. G. Hurst) বলিয়াছেন, "So far as we know the gene is the basic and ultimate unit of life which exists in all species of living organisms from the simple microbe upto complex man. The old nineteenth century units of life, the cell and protoplasm, are in the twentieth century regarded as complex products of more simple units, the living genes"—(The Mechanism of Creative Evolution.)

প্রথম মাসেই ভ্রূণের চক্ষু, কর্ণ ও মুখের প্রাথমিক আকৃতি উপলব্ধি করা যায়। গর্ভাধানের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ভ্রূণের আকৃতি সিকি ইঞ্চি লম্বা হয়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে ভ্রূণের চক্ষু, মস্তিষ্ক ও কর্ণের আকৃতি

১৩নং চিত্র

গঠিত হইতে আরম্ভ করে ; এই সময় ভ্রূণের আবরক ঝিল্লীরও সৃষ্টি হয়। চতুর্থ সপ্তাহের শেষভাগে ভ্রূণের মুখ ও গুহ্যদ্বার গঠিত হয় এবং হৃৎপিণ্ড উপলব্ধিযোগ্য হয়।

দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের আকৃতি মুরগীর ডিমের আকৃতির সমান হয়। নাসিকা স্বাভাবিক গঠন প্রাপ্ত হয় এবং অধর ও কণ্ঠাস্থি গঠিত হইতে আরম্ভ করে।

১৪নং চিত্র

১৫নং চিত্র

তৃতীয় মাসের শেষভাগে ভ্রূণ তিন হইতে সোওয়া-তিন ইঞ্চি লম্বা

হয় এবং ওজনে তিন আউন্স হয়। এই মাসেই গর্ভ-ফুল গঠিত হয়। নখাদি অস্থিও এই মাসেই গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এই মাসেই ভ্রূণের লিঙ্গ-ভেদ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ মাসের শেষে ভ্রূণ পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়। এই সময় ভ্রূণের মস্তকটিই সমস্ত অঙ্গের চারিভাগের একভাগ। এই মাসে ভ্রূণের মস্তকে এবং আরও দুই এক স্থানে লোম গজাইতে আরম্ভ করে। এই সময় নাক, মুখ এবং লিঙ্গ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভ্রূণ এই মাস হইতেই অঙ্গ-চালনা আরম্ভ করে।

পঞ্চম মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য দশ ইঞ্চি ও ওজন এক পাউণ্ড হইয়া থাকে। এই সময় পিঙ্গলবর্ণ লোমে ভ্রূণের সমস্ত দেহ আবৃত হয়। এই সময় ভ্রূণের গাত্রে পনিরের ন্যায় একপ্রকার সাদা পিচ্ছিল পদার্থ সৃষ্টি হয়। ইহা শেষ পর্য্যন্ত ভ্রূণের গায়ে বিদ্যমান থাকে এবং প্রসব-কার্য্যের সহায়তা করে। গর্ভধারিণী এই সময় সন্তানের অঙ্গ-চালনা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য বার ইঞ্চি ও ওজন প্রায় দুই পাউণ্ড হইয়া থাকে। এই সময় চক্ষের ভ্রূ ও চক্ষের পাতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, মাথার চুল লম্বা হয়।

সপ্তম মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য চৌদ্দ ইঞ্চি এবং ওজন তিন পাউণ্ড হইয়া থাকে। এই সময়ে ভ্রূণের মধ্যে মানবাকৃতির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্যক-রূপে গঠিত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, সাবধানতার সহিত প্রতিপালন করিলে সপ্তম মাসে-প্রসূত সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে।

অষ্টম মাসে ভ্রূণ দৈর্ঘ্যে সতর ইঞ্চি ও ওজনে সাড়ে চারি পাউণ্ড হইয়া থাকে।

নবম মাসে ভ্রূণ আঠার ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড ভারী হইয়া থাকে।

দশম মাসে ভ্রূণের গঠন সম্পূর্ণ হয়। এই সময় উহার ওজন, সাত পাউণ্ড ও দৈর্ঘ্য কুড়ি ইঞ্চি হইয়া থাকে। ১৬নং চিত্র

১৬নং চিত্র
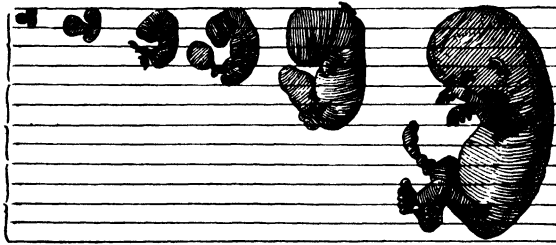
ভ্রূণের ক্রমবর্দ্ধন

সাধারণতঃ এই সময় প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

উপরে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ বর্ণিত হইল। ঐ ক্রমবিকাশের সহিত গর্ভধারিণীর শরীরে যে সমস্ত লক্ষণের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে, উহাকে গর্ভ-লক্ষণ বলা হয়।

গর্ভ-লক্ষণ

সন্তান ধারণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবের দিন পর্য্যন্ত সময়কে গর্ভকাল বলা হয়। বিভিন্ন নারীতে গর্ভকালের পরিমাণ বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ গর্ভের স্থিতিকাল দশ চান্দ্র মাস অর্থাৎ ২৮০ দিন।

এই দশ মাসের প্রত্যেক মাসেই নারীদেহে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বহু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন সময় ও অবস্থাবিশেষে সর্ব্বাঙ্গিক হইলেও সাধারণতঃ জননেন্দ্রিয়েই এই পরিবর্ত্তনের প্রকোপ বেশী।

ঋতুস্রাব। সর্ব্বপ্রথম গর্ভলক্ষণ মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া। স্বাস্থ্যবতী নারী মাত্রেরই গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। রুগ্না ও দুর্ব্বলা নারীতে এই অবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে। ইহাদের বেলায় গর্ভাধান ব্যতিরেকেও ঋতুস্রাব বন্ধ হইতে পারে এবং গর্ভাধানের পরেও অল্প অল্প মাসিক স্রাব হইতে পারে। কিন্তু দুই একটী বিশেষ রুগ্না স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর সকলেরই সম্বন্ধে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়াকে গর্ভলক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গা-বমি। গর্ভসঞ্চারের চতুর্থ সপ্তাহেই গা-বমি-বমি আরম্ভ হয় এবং তৃতীয় মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই বমন-ভাব সাধারণতঃ প্রাতঃকালেই হইয়া থাকে। এই সময় আহারে অরুচিও হইয়া থাকে। কোনও গর্ভধারিণীর মোটেই গা-বমি-বমি হয় না। যাহাদের হয়, তাহাদেরও তৃতীয় মাসের শেষে কি চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে আপনা হইতেই গা-বমি-ভাব দূর হইয়া যায়।

স্তন। গর্ভসঞ্চারের প্রথম মাসেই স্তন ভারী বোধ হয়। স্তন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং স্তনের বোঁটার চারিপার্শ্বস্থ পিঙ্গলাংশ কাল ও বড় হইতে থাকে। ইহাকে ভেলাপড়া বলে। তৃতীয় মাসে স্তন টিপিলে জলের বা আঠার ন্যায় একপ্রকার স্রাব নির্গত হয়। এই স্রাব

প্রথম প্রথম জলের স্থায় স্বচ্ছ থাকে এবং পরে ঘন ও শ্বেতাভ হইয়া থাকে।

তলপেট। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাসেই তলপেট ভারী বোধ হয়। চতুর্থ মাসে তলপেটে কিছুক্ষণ হাত রাখিলে একটা শক্ত জিনিষ অনুভূত হয়। ইহাই জরায়ু। চতুর্থ মাসের মধ্যভাগ হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণীর উদর দৃশ্যতঃ ক্রমবর্দ্ধিত হইতে থাকে। মাসে মাসে ভ্রূণের আকার বৃদ্ধি হওয়ায় জরায়ু ফুটবলের ব্লাডারের মত বড় হইতে থাকে। জরায়ুর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পোয়াতীর পেটও বড় হইতে থাকে। পঞ্চম মাসে জরায়ু নাভিকেন্দ্রের তিন আঙুল নীচে থাকে। ষষ্ঠ মাসে জরায়ু নাভিকেন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তম মাসে নাভির তিন আঙুল উপরে, নবম মাসে বক্ষপঞ্জর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। দশম মাসে পেট ঝুলিয়া পড়ে এবং বক্ষপঞ্জর হইতে প্রায় তিন ইঞ্চি নীচে নামিয়া আসে।

পেটে টিউমার বা গুল্ম হইলেও, কিম্বা পেটে জল বা বায়ু জমিলেও উপরোক্তরূপে পেট বড় হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে স্তনে ভেলা পড়া, গা-বমি করা, বা স্রাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি অন্যান্য গর্ভলক্ষণের সমন্বয় দৃষ্টিগোচর হইবে না।

সাধারণতঃ পঞ্চম মাসের শেষভাগে গর্ভিণী সন্তানের নড়া-চড়া অনুভব করিতে পারে। জলের ভিতরে যেমন মাছ নড়া-চড়া করে, জরায়ুর মধ্যে

সন্তানের অঙ্গ-চলনা

জল থাকায় সন্তানও সেইরূপ নড়া-চড়া করিতে পারে। পঞ্চম মাসের শেষভাগে পোয়াতির পেটের উপর হাত রাখিলে পোয়াতি ভিন্ন অন্যেও সন্তানের অঙ্গ-চালনা অনুভব

করিতে পারে। গর্ভিণীর পেটে কান রাখিলে সন্তানের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। গর্ভের চারি মাসের মধ্যেই এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা গর্ভ-নির্দ্ধারণের একটা সুনিশ্চিত উপায়।

গর্ভাবস্থায় বিধি-নিষেধ

গর্ভাবস্থায় খাদ্য অতি সাদা-সিধা, পুষ্টিকর, লঘুপাক ও স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। গুরুপাক দ্রব্য বর্জ্জন করা উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। জলীয় খাদ্য খুব বেশী পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন। তাহাতে বৃক্কক প্রদেশের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। চা, কফি ও মদ্যপান একদম বর্জ্জন করা উচিত।

বৃক্কক ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি গর্ভিণীর কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়, তবে অনতিবিলম্বে কোষ্ঠ-পরিষ্কারক অল্প মাত্রায় জোলাপ গ্রহণ করা উচিত। যদি প্রস্রাব পরিষ্কার না হয়, তবে অতিরিক্ত মাত্রায় জলপান করা আবশ্যক। দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য রীতিমত স্নানাদি কার্য্য সমাধা করা আবশ্যক। কোনও কারণেই বরাবরের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে নাই। পরিষ্কার গরম জলে জননেন্দ্রিয় অন্ততঃ দৈনিক দুইবার করিয়া ধৌত করা দরকার। যদি গর্ভিণীর প্রদরের উপদ্রব থাকিয়া থাকে, তবে স্নিগ্ধ পচন-নাশক ঔষধ দ্বারা প্রত্যহ একবার করিয়া ডুশ্ গ্রহণ করা আবশ্যক। ডুশ্ গ্রহণে জলের চাপ খুব মৃদু হওয়া প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় পোষাক-পরিচ্ছদ এমন ঢিলা হওয়া দরকার, যাহাতে পেটের উপর কোনও প্রকার চাপ পতিত না হয়। যদি উদর অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুলিয়া পড়ে, তবে উদর-

বন্ধনী দ্বারা পেট বাঁধিয়া রাখা যুক্তি-সঙ্গত। গর্ভাবস্থায় কোনও প্রকার শ্রান্তিজনক কঠোর ব্যায়াম করা উচিত নহে। তাই বলিয়া অভ্যস্ত পরিশ্রম বর্জ্জন করাও মোটেই উচিত নহে।

সাংসারিক দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, লঘু ব্যায়াম পোয়াতীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

যে সমস্ত কার্য্যে বা দৃশ্যে উত্তেজনা, ক্রোধ, বিরক্তি ও নৈরাশ্যের উৎপাদন হয়, সেই সমস্ত দৃশ্য ও কার্য্য হইতে পোয়াতিকে যথা-সম্ভব দূরে রাখিবার চেষ্টা করিবে। জননীর মানসিক অবস্থা সন্তানের উপর কতটা প্রতিফলিত হয়, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, এ সম্বন্ধে কোনই মতভেদ নাই যে, মানসিক অবস্থা যদি জননীর স্বাস্থ্যের, বা সাধারণভাবে শরীরের, উপর কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তবে জননীর সে দৈহিক অবস্থা সন্তানে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-সমস্ত নারীর ইতিপূর্ব্বে দু'একবার গর্ভপাত হইয়াছে, গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল ও রতিক্রিয়ার বাসনার তীব্রতা আছে, এবং স্বামীর স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করে, তাহারা রতি-ক্রিয়া করিতে পারে। তবে এই অবস্থায় রতি-ক্রিয়া করিবার সময় এমন আসন গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে পোয়াতির পেটের উপর চাপ না পড়ে এবং জরায়ুতে আঘাত না লাগে।

গর্ভাবস্থায় রতি-ক্রিয়া

গর্ভিণী-জীবনের একটা অদ্ভুত ঘটনা এই যে, সে এই সময় অনেক কুখাদ্য এমন কি অখাদ্য খাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। হ্যাভলক এলিস এমন অনেক ইংরাজ প্রসূতির কথা বলিয়াছেন, যাহারা কয়লা, বালুকা, ও ভস্ম খাইতে ভালবাসে। আবার অনেকে মলমূত্র, মাকড়সা, তেলাপোকা প্রভৃতি খাইবার জন্য উন্মত্ত হয় এমনও নাকি দেখা গিয়াছে।

গর্ভিণীর রুচি-বিকৃতি

এ সবকে নিতান্ত বিরল ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইলেও গর্ভাবস্থায় যে নারীর মধ্যে একটা বিরাট রুচি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের নারীগণকে গর্ভাবস্থায় তেঁতুল, লবণ এমন কি পোড়ামাটী অত্যধিক পরিমাণে খাইতে দেখা গিয়া থাকে।

অনেক চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকের অভিমত এই যে, গর্ভাবস্থায় নারী-দেহে ঔপাদানিক পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ায় যে সমস্ত উপাদানের অধিক প্রয়োজন হয়, নারী সেই সমস্ত উপাদানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। আবার অন্য এক মত এই যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের রুচি অনুসারেই গর্ভিণীর রুচি-বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। গর্ভিণী সাধারণতঃ শিশুদের খাদ্যের প্রতিই ব্যগ্রতা দেখাইয়া থাকে। এতদ্দর্শনে মনে হয়, এই মত নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

অনেকের আবার অভিমত এই যে, গর্ভিণী যাহা-কিছু খাইতে চায়, সে সমস্তই খাইতে দিলে সে গা-বমি প্রভৃতি প্রাতঃকালীন গ্লানি হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু এই অভিমতের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। কারণ যাহাই হউক, গর্ভিণীর মধ্যে সাধারণতঃ এই রুচি-বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, এবং তাহার স্বাস্থ্যের জন্য ও

ভ্রূণের কল্যাণের জন্য যথাসম্ভব সহানুভূতির সহিত সে রুচি-বিকৃতির ব্যবহার করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন পরিমিত ভাবে নিদ্রা যাওয়া উচিত। রাত্রি-জাগরণ একেবারেই করিতে নাই। দিবানিদ্রা যথাসম্ভব বর্জ্জন করিবে।

নিদ্রা

এক আধটু একেবারে মন্দ নয়। ভোজনান্তেই শয়ন করা উচিত নয়। শয়ন-গৃহে বায়ু চলাচল, ঘরে রৌদ্র প্রবেশ, ইত্যাদি স্বাস্থ্যনৈতিক সাধারণ নিয়ম পোয়াতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বাস্থ্যনীতির সাধারণ নিয়ম সকলেরই পালনীয় বটে, কিন্তু পোয়াতির পক্ষেই অবশ্য পালনীয়। কারণ সাধারণ অবস্থায় স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘনের কুফল আমরা দেরীতে ভোগ করি, অনেক সময় অবস্থাবিশেষে আমরা বাঁচিয়াও যাই; কিন্তু পোয়াতির বেলায় তাহা হয় না। পোয়াতির সমস্ত দেহ-যন্ত্র গর্ভাবস্থায় এমন একটা সাময়িক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় যে, ঐ সময় দেহ-যন্ত্র-সমূহের বিশেষ যত্ন লওয়া ও তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

পোয়াতির স্তনের বিশেষ যত্ন লওয়া দরকার। গর্ভাবস্থায় টাইটব্রেষ্ট বা অন্য কোনও প্রকার আঁটা জামা-কাপড় ব্যবহার করিতে নাই।

স্তনের যত্ন

টাইটব্রেষ্ট ও আঁটা জামায় স্তনের স্বাভাবিক বিবৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং স্তনের বোঁটা চেপ্টা ও নরম করিয়া ফেলে। স্তনের বোঁটা প্রত্যহ সাবান-জলে ধৌত করা উচিত। নচেৎ বোঁটার ছিদ্র দিয়া নানারূপ বিষাক্ত দ্রব্য প্রবেশ করিয়া স্তন ফুলিয়া উঠিতে পারে। স্তনের বোঁটা ছোট হইলে সদ্যজাত শিশু সেই স্তন মুখে ধরিতে পারে না। সেজন্য যে সকল প্রসূতির স্তনের বোঁটা ছোট বা

চেষ্টা, তাঁহারা প্রতিদিন স্তন ধোওয়ার সময় আঙুলে একটু তেল বা একটু ক্রীম মাখাইয়া বোঁটাতে মালিস করিবে এবং আস্তে আস্তে বোঁটা টানিয়া লম্বা করিতে চেষ্টা করিবে। জলের সহিত সমপরিমাণে অডিকোলন বা স্পিরিট মিশাইয়া সেই জল দ্বারা প্রত্যহ বোঁটা ধুইলে বোঁটা শক্ত হয়। পোয়াতির পক্ষে স্তনের যত্ন লওয়া বিশেষ প্রয়োজন, একথা অনেকেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। সন্তান জন্মের পর পূর্ণ একটী বৎসর জননীর স্তনের বোঁটার উপর উৎপীড়ন হইয়া থাকে। সেই উৎপীড়ন সহ্য করিবার মত যথেষ্ট শক্তি না হইলে সন্তানের মাড়ির পেষণে স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায় এবং তাহাতে ঘা হয়। এই অবস্থায় স্তনে বেদনা বা ঘা হইলে জননী ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই যে বিষম বিপদের কথা তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নারীর পক্ষে গর্ভধারণ ও প্রসব-কার্য্যও স্বাভাবিক হইবার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষাহেতু জনসাধারণের অধিকাংশের স্বাস্থ্যই এত খারাপ যে, আমাদের নারীজাতির অনেককেই গর্ভাবস্থায় কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই সমস্ত অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যক্তি- ও অবস্থা-বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু নিম্নলিখিত অস্বাভাবিক অবস্থাগুলি প্রায় সমস্ত পোয়াতিতেই অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে :

গর্ভাবস্থায় ব্যাধি-লক্ষণ

১। রক্তস্রাব

২। অত্যন্ত বমি

৩। হাত, পা ও মুখে শোথ

৪। প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া
৫। সর্ব্বদা মাথা ঘোরা ও মাথা ধরা
৬। চোখে ঝাপ্‌সা দেখা
৭। চোখমুখ হলুদবর্ণ হওয়া
৮। সর্ব্বদা তন্দ্রা ও অনিদ্রা
৯। উঠিতে বসিতে ও চলাফেরা করিতে হাঁপানু
১০। রক্তহীনতা
১১। আমাশয়, অজীর্ণ ও জ্বর
১২। পেটে ছেলে নড়া-চড়া করা

উপরোক্ত লক্ষণসমূহের সমস্তগুলিই যে একজনের মধ্যে একই সময়ে দেখা দেয়, তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু যখনই কোনও পোয়াতির মধ্যে উহার কোনও একটী লক্ষণ দেখা দেয়, তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিকারের চেষ্টা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত লক্ষণ মারাত্মক হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। ইহাদের যে-কোনও একটী লক্ষণ অবহেলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পোয়াতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে। এই সমস্ত লক্ষণের যে কোনও একটীর আক্রমণ হওয়ামাত্রই যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য দারিদ্র্যহেতু এ বিষয়ে আমাদের দেশের অনেকেই যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারে না। প্রথম হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে অবস্থা মোটেই জটীল হয় না, এবং চিকিৎসক ডাকিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিষেধ অনেক ভাল। একথা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

জরায়ু হইতে সন্তান বহির্গত হওয়ার নাম প্রসব। জরায়ু সঙ্কুচিত

হওয়ার ফলেই সন্তান বাহির হইয়া আসে। দশম মাসেই সাধারণতঃ জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। দশ মাস সন্তানকে অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া হঠাৎ সেদিন জরায়ু কেন সজোরে সঙ্কুচিত হয়, ইহার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ইহা প্রকৃতির বিধান, সৃষ্টি-কর্ত্তার বিচিত্র লীলা ও সৃষ্টি-রহস্য! আমরা কেবল দেখিতে পাই যে, সন্তান পুষ্ট ও পক্ক হইলেই জরায়ু স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইয়া সন্তানটীকে বাহিরে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়।

প্রসব

প্রসব-ক্রিয়াটীকে আমরা মোটামুটি তিনটী স্তরে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম স্তরে জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হয়। জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার ফলেই ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে সন্তানের ন্যায় অতবড় জিনিষটী বাহির হইয়া আসিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে সন্তানের বহিরাগমন। এই স্তরে সন্তানটী জননীর উদর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে; কিন্তু তাহার নাড়ীর সহিত জননীর উদরাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও জরায়ু সংযোজিত থাকে। তৃতীয় স্তরে জননীর উদরাভ্যন্তর হইতে, নাড়ীর মূল উৎপাটিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। নাড়ী-মূলকে সাধারণ কথায় 'ফুল' বলে। ফুল পড়া সমাপ্ত হইলেই প্রসূতি ও সন্তানের মধ্যে সম্পূর্ণ বিযুক্তি সাধিত হইল। এই তিনটী স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরে ছয় হইতে চব্বিশ ঘণ্টা, দ্বিতীয় স্তরে ১০ মিনিট হইতে দুই ঘণ্টা এবং তৃতীয় স্তরে ১৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কোন্ তারিখে কখন প্রসব হইবে, তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন হইলেও এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা অনুমান করা

প্রসবের সময় নির্দ্ধারণ

যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই অনুমান ঠিকও হইয়া থাকে।

ভ্রূণ সাধারণতঃ ২৮০ দিন অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিন গর্ভে থাকে। সুতরাং যে ঋতুস্রাবে গর্ভ হয়, সেই ঋতুস্রাবের প্রথম দিন হইতে ২৮০ দিন হিসাব করিয়া যেদিন পাওয়া যাইবে, সাধারণতঃ সেইদিনই প্রসব হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ডাঃ স্মিথের গণনা-প্রণালীই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সেজন্য আমরা নিম্নে ডাঃ স্মিথের গণনা-প্রণালী উদ্ধৃত করিলাম।

১লা জানুয়ারী ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া বন্ধ হইলে	৭ই অক্টোবর প্রসব হইবে
১লা ফেব্রুয়ারী " " " " "	৭ই নবেম্বর " "
১লা মার্চ্চ " " " " "	৫ই ডিসেম্বর " "
১লা এপ্রিল " " " " "	৪ঠা জানুয়ারী " "
১লা মে " " " " "	৫ই ফেব্রুয়ারী " "
১লা জুন " " " " "	৭ই মার্চ্চ " "
১লা জুলাই " " " " "	৬ই এপ্রিল " "
১লা আগষ্ট " " " " "	৭ই মে " "
১লা সেপ্টেম্বর " " " " "	৭ই জুন " "
১লা অক্টোবর " " " " "	৭ই জুলাই " "
১লা নবেম্বর " " " " "	৭ই আগষ্ট " "
১লা ডিসেম্বর " " " " "	৬ই সেপ্টেম্বর " "

এ বিষয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, যেদিন নারী গর্ভধারণ

করিবে, সেইদিন হইতে ২৮০ দিন গণনা করিতে হইবে। বাস্তবিক কোন্ দিনের সংবাসে গর্ভাধান হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। কাজেই এই ধারণা লইয়া বসিয়া থাকিলে গণনা করা অসম্ভব। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। যেদিনই গর্ভাধান হউক না কেন, যে ঋতুতেঁ গর্ভাধান হইবে, সেই ঋতুর প্রথম দিন হইতে ২৮০ দিনই ভ্রূণ গর্ভে থাকিবে। রোগ-জনিত বিশেষ কারণ না ঘটিলে ইহাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

প্রসব-কার্য্যে যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, তাহাদিগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রসূতির গৃহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ তাহার দেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

আতুড় ঘর

প্রথমতঃ আমরা প্রসূতির ঘর সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে ঘরে প্রসূতি সন্তান প্রসব করে, তাহাকে আমাদের দেশে আতুড় ঘর বলা হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার, ক্ষুদ্র ও পরিত্যক্ত গৃহকেই আতুড় ঘরে পরিণত করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অশিক্ষাহেতু আমাদের দেশবাসীর মধ্যে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। বহু কুসংস্কারের মধ্যে আমাদের কাছে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ও আশু প্রতিকারোপযোগী বলিয়া মনে হয়, তাহা এই যে, আমাদের দেশে আতুড় ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আগুন জ্বালানো হয় প্রসূতিকে সেঁকিবার জন্য; আর দরজা জানালা বন্ধ করা হয় জাতককে প্রেতাদির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। বদ্ধগৃহে অগ্নি-কুণ্ড যে কি বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে,

তাহা অতি সহজেই অপনেয়। যথাসম্ভব প্রচার ও শিক্ষাদ্বারা এই কুসংস্কারকে দেশবাসীর মন হইতে দূর করিয়া আতুড় ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করিতে হইবে। অন্যথায় বর্ত্তমান প্রসূতি-মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যুর শোচনীয় হার হ্রাস করা সম্ভব হইবে না।

প্রসব-গৃহ বা আতুড় ঘর প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। উহাতে আলো-বাতাস চলাচলের জন্য দরজা জানালা থাকা চাই। ঘরটি অতিরিক্ত আসবাব-পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়া বোঝাই করা উচিত নহে। ঘরের মধ্যে এমন স্থানে প্রসূতির শয্যা স্থাপন করিতে হইবে, যেথানে যথেষ্ট আলো পড়িতে পারে। প্রসূতির দক্ষিণ পার্শ্ব যাহাতে জানালার দিকে থাকে, তদনুসারে শয্যাস্থাপন করিতে হইবে। বিছানাটি ঈষৎ শক্ত হওয়া ভাল। স্প্রীঙ্গের খাট কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে। একটী তক্তপোষ, একপ্রস্থ বিছানা, তোষক, বালিশ, মশারি, চাদর এবং, শীতকাল হইলে, লেপ বা কম্বল, ঔষধাদি এবং প্রসূতি ও জাতকের ব্যবহারোপযোগী বাসন-পত্র রাখিবার জন্য একটি ছোট চৌকি বা টেবিল থাকিলেই হইল। পাকা ঘর হইলে পূর্ব্বাহ্নে ঘরটী চুনকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে এবং কাঁচা ঘর হইলে উহা নিকাইয়া, বেড়া ঝাপ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। দরজা জানালা দিবাভাগে খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে রৌদ্র ও বাতাস ঘরে প্রবেশ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত শিশুর শরীর ধোয়াইবার ও ধাত্রীর হাত ধুইবার জন্য ঠাণ্ডা ও গরম জলপূর্ণ বড় গামলা, তোয়ালে, সাবান, কাঁচি, বোরিক তুলা ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র ঘরের এক কোণে সাজাইয়া

রাখিবে, যেন দরকার-মত বিনা-তালাসে অনতিবিলম্বে পাওয়া যাইতে পারে।

উপরে আমরা আতুড় ঘরের অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। এখন আমরা প্রসূতির দেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থার আলোচনা করিব।

প্রসবকালীন কর্ত্তব্য

প্রসূতিকে পরিষ্কার, গরম এবং ঢিলা কাপড় পরাইবে। প্রসবের পরমূহূর্ত্তেই পরনের কাপড় বদলাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইতে হইবে।

প্রসব-বেদনার প্রথম পর্ব্বেই প্রসূতিকে নরম জোলাপ দিবে। এই ব্যাপারে ক্যাষ্টর অয়েল, লিকরিন পাউডার অথবা ক্যাম্ফরা মাগ্‌বেড়া ব্যবহারই প্রশস্ত। প্রসূতির ঘন-ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া মাত্রই প্রস্রাব করা উচিত। পচন-নাশক ঔষধ-মিশ্রিত গরম জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ জননেন্দ্রিয় ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রসব-ক্রিয়ার প্রথম স্তর জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়া। এই সময় জরায়ু-গ্রীবায় সন্তানের মস্তক স্থাপিত হয়। জরায়ু-মুখ উন্মুক্তির সহায়তার জন্য প্রসব-বেদনার প্রথম দিকে প্রসূতির পক্ষে পদ-চারণ করা উচিত। বেদনা আরম্ভ হওয়া মাত্র প্রসূতির শুইয়া পড়া উচিত নহে। প্রসূতি যতই হাটিতে থাকিবে, ততই জরায়ু সজোরে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। জরায়ু যতই সঙ্কুচিত হইবে, সন্তানের দেহ ততই বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ঐরূপে জরায়ু-গ্রীবা উন্মুক্ত হইয়া সন্তানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। শুইয়া থাকিলে এই সমস্ত কাজেই বিঘ্ন হইতে থাকিবে। ফলে প্রসব-ক্রিয়ায় বিলম্ব হইবে।

দাঁড়াইয়া পরিক্রমণ করিতে থাকিলে সন্তানের ভার যোনি-মুখে পতিত হইয়া মাধ্যাকর্ষণ-বলে সন্তান নিম্নদিকে আসিতে থাকে। কিন্তু শুইয়া থাকিলে সন্তান মাধ্যাকর্ষণের কোনও সহায়তা পায় না। প্রসব-কার্য্যে সময়-সময় প্রসূতির পক্ষে এক-আধটু কুন্থন করিতে হয়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুন্থন দেওয়া যত সহজ, শুইয়া কুন্থন দেওয়া তত সহজ ও ক্রিয়াশীল নহে। তবে কুন্থন দিয়াই শুইয়া পড়িলে বিশেষ উপকার হয়।

দ্বিতীয় স্তরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহির হইতে যোনি-মুখে সন্তানের মস্তক দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধাত্রীর হস্ত-সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নাই। এই স্তরে প্রসূতি পদদ্বয় খাড়া করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে। শুইয়া প্রসূতি সজোরে কুন্থন করিলেও তাহাতে ঝিল্লি ছিন্ন হইবে না। সুতরাং প্রয়োজন-মত সজোরে কুন্থন দিয়া প্রসূতি জরায়ু-সঙ্কোচনের সাহায্য করিতে পারে। এই কুন্থন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রসূতির পায়ের কাছে তক্তপোষ বা কোনও খুঁটির সহিত একটি কাপড় বাঁধিয়া দিবে। প্রসূতি সেই কাপড় ধরিয়া সজোরে টানিলেই কুন্থন-কার্য্য সজোরে সম্পাদিত হইবে।

এইভাবে জাতকের মস্তক যোনি-মুখে দৃষ্টিগোচর হইলেই ধাত্রী তাহার পরিষ্কৃত হস্ত প্রয়োগ করিবে। এই কার্য্যে ধাত্রীকে দুইটী দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ তাহাকে জাতকের যথাসম্ভব অল্প সময়ে বহিরাগমনের সাহায্য করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ প্রসূতির যোনি-মুখ ছিন্ন না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সন্তানের মস্তক বাহির হইলে আর কুন্থন দিবে না; কারণ তাহাতে যোনি-মুখ ছিন্ন হইতে পারে।

এই সময় প্রসূতি চিৎ হইয়া পদদ্বয় উঁচু ও ফাঁক করিয়া শুইবে। ধাত্রী তাহার কোমরের নিকট বসিয়া বাম হাতে প্রসূতির তলপেটে উপর হইতে নীচ দিকে আস্তে-আস্তে চাপ দিতে থাকিবে। এই ভাবে জাতকের মস্তক যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইয়া আসিলে গুহ্যদ্বারের নীচে চাপ দিলে সন্তান অতি সহজে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ কার্য্যে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতকের মস্তক যথেষ্ট পরিমাণে বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে বাহির হইতে চাপের উল্টা ফল হইবে এবং সন্তান আরও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবে। জাতকের সম্পূর্ণ মস্তক বাহিরে আসিবার পর ধাত্রী যোনি-মধ্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমা প্রবেশ করাইয়া দেখিবে সন্তানের গলায় নাড়ী জড়াইয়া আছে কিনা। যদি থাকে, আঙুলের সাহায্যে গলা হইতে নাড়ী সরাইয়া দিবে। আর যদি না থাকে, তবে দু'এক মিনিটের মধ্যেই সন্তান বাহির হইয়া আসিবে, কোনও প্রকার জোর-জবরদস্তী করিবার প্রয়োজন হইবে না। সন্তানের উভয় স্কন্ধ বাহির হইয়া আসিবার পর সামান্য টান দিয়া সন্তানের বহিরাগমনে সহায়তা করা যাইতে পারে। উপরোল্লিখিত উপদেশ সমুহ ধাত্রীদের অবশ্য পালনীয়। এদেশের ধাত্রীরা সাধারণতঃ অজ্ঞ। ধাত্রী-বিদ্যা জটীল ও শিক্ষা-সাপেক্ষ। গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ধাত্রী-শিক্ষায় সচেষ্ট না হইলে এই জাতীয় অমঙ্গলের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় নাই।

এই সমস্ত সময়েই প্রসূতিকে উৎসাহসূচক কথা বলিয়া প্রফুল্ল অথবা অন্ততঃ অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিবে। প্রসব-বেদনা থাকিয়া থাকিয়া ঝড়ের বেগে আসিবে এবং পরক্ষণেই চলিয়া যাইবে। দুই বেদনার চাপের মধ্যে প্রসূতিকে বিশ্রাম, সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিবে। আতুড় ঘরে বেশী

লোকজন থাকিতে দিবে না; এবং ভীতিসূচক কোনও কথাবার্ত্তা বলিবে না।

সন্তান-প্রসবের যে বেদনা ও কষ্ট, ইহাকে একরূপ স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। তথাপি ক্লোরোফর্ম্ম আবিষ্কারের পর হইতে প্রসবকালে প্রসূতিকে অচেতন করিয়া তাহার যাতনার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে ক্লোরোফর্ম্ম-মিশ্রিত অনেক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহাদের ব্যবহারও হইয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধের সাধারণ দোষ এই যে, উহারা প্রসূতির যন্ত্রনা-বোধ-শক্তি রহিত করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার পৈশিক সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতা হ্রাস, এমন কি রহিত, করিয়া ফেলে। ইহাতে প্রসব-কার্য্যে অযথা বিলম্ব ঘটে।

প্রসূতির বেদনা লাঘবের প্রক্রিয়া

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রসূতির যাতনা-লাঘবের একটী নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। উহার নাম দেওয়া হয় 'সান্ধ্যনিদ্রা'। এই প্রক্রিয়া অনুসারে প্রসব-বেদনার শেষ দিকে মর্ফিয়া ও স্কাইওসাইন মিশ্রিত একটী ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। ইহাতে প্রসূতির পৈশিক সবলতা নষ্ট না করিয়াও তাহাকে নিদ্রাভিভূত করা যায়। সুতরাং অতি সহজেই প্রসব-কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ারও একটা দোষ আছে। মর্ফিয়ার ক্রিয়ায় জাতকের দম বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রসবের পরে জাতকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়।

সম্প্রতি 'বার্বিচুরেট' নামক যে ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে উপরোক্ত দোষসমূহের কোনওটাই বিদ্যমান নাই। অধিকন্তু ইহাতে যত-ইচ্ছা বিলম্বে প্রসব হইলেও প্রসূতি বা জাতকের কোনও অনিষ্ট হয় না।

সন্তান প্রসব হইবার পর শুশ্রূষাকারিগণের কর্ত্তব্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়—একদিকে প্রসূতিকে অপরদিকে জাতককে শুশ্রূষা করিতে হয়। আমি প্রথমে প্রসূতি-শুশ্রূষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তৎপর সন্তানের শুশ্রূষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রসবের পরে

প্রসবের পর প্রসূতির যোনি-মুখ ভাল করিয়া লাইজল-মিশ্রিত জলে ধোয়াইয়া-মুছাইয়া তাহাকে পরিষ্কার কাপড় পরাইবে। তৎপর ভাঁজ-করা শক্ত কাপড় দিয়া তাহার পেট বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে প্রসূতি আরাম পায়। এইভাবে পেট বাঁধিয়া না দিলে পেট যথোচিত ভাবে সঙ্কুচিত হয় না এবং ফলে পেট অতিরিক্ত রকম ঢিলা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। পেট ঢিলা হইলে কেবল দেখিতেই যে বিশ্রী হয়, তাহা নহে; অজীর্ণ রোগেরও সৃষ্টি হইতে পারে। পেট ঝুলিয়া পড়িলে পরবর্ত্তী প্রসবে প্রসূতিকে কষ্ট পাইতে হয়।

প্রসবের পর সাধারণতঃ চারি সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রসূতির জরায়ু হইতে স্রাব হইয়া থাকে। এই রক্ত প্রথম প্রথম তাজা রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, এবং ক্রমে বর্ণ ফ্যাকাসে হইতে থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহে রক্তস্রাবের পরিবর্ত্তে সাদা স্রাব হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই স্রাবের কোনও গন্ধ থাকে না। স্রাবে কোনও গন্ধ থাকিলে তাহাকে রোগ-লক্ষণ বুঝিতে হইবে। এই স্রাবের জন্য প্রসূতির কপ্‌নী ব্যবহার করা উচিত। এই কপ্‌নী প্রথম প্রথম দিনে ৪।৫ বার ও শেষদিকে ২।৩ বার বদ্‌লাইতে হয়।

প্রসবের অল্পক্ষণ পরেই প্রসূতি অবসাদ-জনিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই নিদ্রা বড়ই উপকারী। যাহাতে এই নিদ্রা গভীর হয়,

তাহার ব্যবস্থা করিবে। আতুড় ঘরে ভাল নিদ্রা না হইলে প্রসূতির সূতিকা জ্বর বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইতে পারে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার ও 'ফুল' পড়িবার পর কোনও-কোনও প্রসূতির তলপেটে ও কোমরে ঠিক প্রসব-বেদনার ন্যায় একরূপ বেদনা হয়, ইহাকে 'হ্যাঁদাল ব্যথা' বলা হইয়া থাকে। জরায়ুর অনিয়মিত সঙ্কোচনের জন্যই এই বেদনা হইয়া থাকে। এই বেদনা কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ৩।৪ দিন স্থায়ী হয়। তলপেটে গরম সেঁক দিলে এবং পেট শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলে এই বেদনা হয় না এবং হইলেও অতি অল্পক্ষণেই উপশম হয়।

প্রসবের পর সম্ভব হইলে সাতদিন পর্য্যন্ত প্রসূতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবে। ইহার মধ্যে প্রথম দুইদিন একেবারে শয্যাত্যাগ করিবে না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, তলপেটে ব্যথা এবং সূতিকা জ্বর হইতে পারে।

প্রসূতির খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। প্রথম প্রথম দুধ-সাগু-বার্লি এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত লঘুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। প্রসূতির খুব পিপাসা হয়; সুতরাং তাহাকে খুব জল খাইতে দিবে। কাঁচা নাড়ী ফুলিয়া যাইবার ভয়ে অনেকে প্রসূতিকে জল দিতে কৃপণতা করে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। প্রচুর জলপানে প্রসূতির উপকার বই অপকার হয় না। প্রসবের সময় প্রভূত স্রাবে প্রসূতির দেহের প্রচুর রস-রক্ত ক্ষয় হইয়া থাকে। জলপানের দ্বারা এই ক্ষয়ের কতকটা পূরণ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রসবের পর প্রসূতির দেহে নানারূপ বিষ প্রবেশ করিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে প্রস্রাবের

সঙ্গে এই সমস্ত বিষ বাহির হইয়া যায়। প্রচুর জলপান জ্বরের প্রতিষেধক।

প্রসবের পর দুই তিন ঘণ্টা শিশুর আহারের প্রয়োজন নাই। তৃতীয় দিনে মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। তৎপূর্ব্বে শিশুকে গো-দুগ্ধ বা অন্য কোনও খাদ্য খাওয়াইবার চেষ্টা করা অনুচিত। তৎপরিবর্ত্তে প্রথম দুই দিন মাতৃস্তনে যে হরিদ্রাভ জলীয় পদার্থ বাহির হয়, উহা শিশুর পক্ষে বড়ই উপকারী। ঐ পদার্থ পান করিলে শিশুর পেট পরিষ্কার হয়। অতএব প্রসবের ৩।৪ ঘণ্টা পরে জননীর স্তন দুইটী উত্তমরূপে গরম জলে ধুইয়া শিশুকে স্তন্য পান করিতে দিবে। প্রত্যেক স্তনে ৫ মিনিট করিয়া খাওয়াইবে। প্রথমদিন ৬ ঘণ্টা অন্তর, দ্বিতীয় দিনে ৫ ঘণ্টা অন্তর ও তৃতীয় দিবস হইতে ৩ মাস পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্য পান করাইবে। রাত্রি ১০টা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রে একবার দুধ খাওয়াইবে। কিন্তু কাঁদিলেই ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে স্তন্য দেওয়া আমাদের দেশের জননীদের একটা প্রকাণ্ড কু-অভ্যাস আছে। ইহাতে সন্তানের পেটের পীড়া হইয়া থাকে। নিয়ম-মত সন্তানকে দুধ খাওয়াইবে। অন্য সময় সন্তান কাঁদিলে তাহাকে অন্য প্রকারে শান্ত করিবার চেষ্টা করিবে; তবু বিফল হইলে গরম জল খাওয়াইবে; কিন্তু অসময়ে দুধ কদাচ দিবে না।

আঁতুড় ঘরে সন্তান

ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর দিন দিন শিশুর নাভি শুকাইতে থাকে এবং সাধারণতঃ ৫ দিন হইতে ৭ দিনের মধ্যেই নাভি খসিয়া পড়ে। ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কোনও কোনও স্থলে ২০।২১ দিনেও নাভি পড়িতে পারে। যদি নাভি শুক্‌না থাকে, নাভিমূলে ফুলা না থাকে, তবে

দেরীতে নাভি পড়িলেও তাহাতে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু নাভি যদি না শুকাইয়া নাভিমূলে ফুলা থাকে, তবে অসুখ হইয়াছে জানিয়া চিকিৎসা করাইবে।

রৌদ্র-তাপ শিশুর পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্মঠ হয়। কাজেই আতুড় ঘরে থাকিতেই শিশুকে প্রত্যহ কিছুক্ষণ রৌদ্র-তাপে রাখিয়া দিবে। রৌদ্রে রাখিবার সময় শিশুর মাথাটী কিছু-একটা দিয়া আবৃত করিয়া রাখিবে। কারণ মাথায় রৌদ্র লাগান ভাল নহে। শিশুকে রৌদ্রে রাখিবার আগে তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করা খুব ভাল অভ্যাস! যে সমস্ত শিশুকে এই ভাবে প্রতিপালন করা হয়, তাহাদের সর্দ্দি-কাসি বড় একটা হইতে দেখা যায় না।

শিশুই ভবিষ্যতের পিতামাতা। শিশু ভিন্ন জগতের ভবিষ্যৎ রক্ষা হইতে পারে না। আবার সেই শিশু যদি নীরোগ না হয়, তবে মানব-জাতির মধ্যে রোগ বৃদ্ধির অস্ত্র হয় মাত্র। সকল মানুষের দেহের গঠন ও সাধারণ-স্বাস্থ্য সমস্তই মোটামুটি শিশুকালেই গড়িয়া উঠে। সুতরাং শৈশবে শিশুপালন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সন্তানকে ভবিষ্যতে সচ্চরিত্র, তেজস্বী ও কর্ম্মঠ বানাইতে হইলে আতুড় ঘর হইতে শিশুকে সেইভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। শিশুকে সুস্থ, সবল ও চরিত্রবান করিতে হইলে তাহার নিদ্রা ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহার খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

শিশুপালন

শিশুর প্রাথমিক খাদ্য মাতৃস্তন্য। যে সমস্ত শিশু জন্ম হইতে ৮।১০ মাস কি এক বৎসর মাতৃস্তন্য খাইতে পারে, তাহাদের স্বাস্থ্য আজীবন ভাল

থাকে। জননী মাত্রেরই রীতিমত স্তন্যদান করা উচিত। ইহাতে জননীরও বিশেষ উপকার হয়। স্তন্যদানের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নারীর জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। জরায়ু যথারীতি সঙ্কুচিত হইলে নারী আপনা হইতেই সারিয়া যায়। স্তন্যদান কালে জননীর পেটে যে ক্ষণস্থায়ী তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, উহা জরায়ু-সঙ্কোচ-জনিত ব্যথা। উহাকে রোগ মনে করিয়া ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই।

মাতৃস্তন্য ব্যতীত গো-দুগ্ধ, ছাগ-দুগ্ধ বা পেটেন্ট ফুডও শিশুদের খাদ্য। কিন্তু এই সমস্ত খাদ্যই অস্বাভাবিক। অনেক নারী স্তনের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া শিশুকে স্তন্যদান না করিয়া গো-দুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। গো-দুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধ খুব পুষ্টিকর খাদ্য বটে, কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, হাজার ভাল হইলেও স্তন্যের তুলনায় ঐ সমস্ত দুগ্ধের কোনটাই উৎকৃষ্ট নহে। মাতৃস্তন্যের অভাব হইলেই এই সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইয়া সন্তান বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। পারতপক্ষে মাতৃস্তন্য বাদ দিয়া কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়ান উচিত নহে।

মাতৃস্তন্যের অভাবে গো-দুগ্ধ খাওয়াইবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গো-দুগ্ধ খাওয়ান উচিত। কিন্তু গো-দুগ্ধে জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া এবং চিনি মিশাইয়া দুগ্ধকে সুমিষ্ট খাদ্যে পরিণত করিতে হইবে। শিশুর বয়স-ভেদে জল ও চিনির পরিমাণও বিভিন্ন করিতে হইবে।

মাতৃস্তন্যের বদলে

গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগ-দুগ্ধে ঘৃতের মাত্রা বেশী ও ছানার মাত্রা কম হওয়ায় গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগ-দুগ্ধই শিশুর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ছাগদুগ্ধেও জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়ানো উচিত। শিশুকে খাওয়াইবার দুগ্ধ ফুটাইয়া জ্বাল করা

উচিত নহে। কারণ উহাতে দুগ্ধ গুরুপাক হইয়া যায়। এজন্য কাঁচা দুগ্ধ বা এক-বল্‌কা দুগ্ধই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু কাঁচা বা এক-বল্‌কা দুগ্ধের একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, উহা বেশীক্ষণ ভাল থাকে না। নানারূপ কীটাণু জন্মিয়া দুধ নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য এক বেলার দোহান দুগ্ধ শিশুকে অন্য বেলা খাওয়াইতে নাই।

স্থানান্তরে গমনাগমন কালে বাড়ী হইতে দুধ লইয়া যাওয়াও যেমন ভাল নহে, তেমনই রাস্তা হইতে দুধ কিনিয়া খাওয়ানও উচিত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে 'পেটেণ্ট ফুড' সঙ্গে রাখাই যুক্তি-সঙ্গত। এইরূপ সাময়িক প্রয়োজনে অগত্যা পেটেণ্ট ফুড ব্যবহার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে অবস্থায় খাঁটী টাট্‌কা দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে, তখন কিছুতেই পেটেণ্ট ফুড খাওয়ানো উচিত নহে। বিজ্ঞাপনে যতই চাকচিক্য ও আড়ম্বরপূর্ণ কথা থাকুক না কেন, বাজার-চল্‌তি কোনও পেটেণ্ট ফুডেই শিশুর দেহ-গঠনের জন্য আবশ্যক সমস্ত উপাদান নাই। কেবলমাত্র মাতৃস্তন্যে এবং তাহার পরেই গো-দুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধে ঐ সমস্ত উপাদান বিধাতা স্বয়ং দান করিয়াছেন। ক্রমাগত বেশী দিন বাজারের 'মল্টেড মিল্ক' ও 'ফুড' খাওয়াইলে শিশুর 'রিকেটস্‌' নামক ব্যাধি হইতে পারে। এই রোগে শিশুর অস্থি অতিশয় কোমল হয় এবং মাথা ও পেট বড় এবং হাত পা সরুসরু হইয়া থাকে। সুতরাং পারতপক্ষে কদাচ বাজার-চল্‌তি 'ফুড' শিশুকে খাওয়াইবে না।

অনেকে সখ্‌ করিয়া শিশুকে চুষিকাঠি ব্যবহার করিতে দেয়। সন্তানের কান্না নিবারণের উপায়রূপে চুষিকাঠি আজকাল ঘরে ঘরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত চুষিকাঠি ব্যবহার করিলে শিশুর তালুর

গঠন বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহার গলার ভিতর 'য়্যাডিনয়েড' নামক এক প্রকার ব্যাধি দেহ-বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটায়। সুতরাং শিশুকে চুষি-কাঠি ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চুষিকাঠির পরিচ্ছন্নতার ব্যাঘাত হইয়াই থাকে এবং সেই জন্য সকল সময়েই বিপদ থাকিয়া যায়।

চুষিকাঠি

শিশুর স্নানাহারের দিকে সবিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা জলে শিশুকে স্নান করাইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু শিশু প্রথমেই ঠাণ্ডা জল সহ্য করিতে পারে না বলিয়া প্রথম প্রথম তাহাকে কুসুম-গরম জলে স্নান করাইয়া স্নানে অভ্যস্ত করা উচিত। প্রত্যহ একই সময়ে নিয়মিত ভাবে শিশুকে স্নান করান উচিত। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে কোনও শিশুকেই তরল পদার্থ ছাড়া অন্য কোনও জিনিষ খাইতে দিতে নাই। ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে দুধ ব্যতীত আর কোনও খাদ্য দেওয়া উচিত নহে।

স্নানাহার

শিশুর নিদ্রা সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ১ বৎসর হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর দৈনিক ৮ ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্টা কাল নিদ্রার দরকার। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার পরিমাণ কমাইতে হয়। যুবকের পক্ষে দৈনিক ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। শিশু যতদিন কচি থাকে, ততদিন তাহাকে মায়ের সহিত এক বিছানায় রাখা উচিত নহে। নিদ্রার ঘোরে অনেক প্রসূতি সন্তানের উপর হাত পা চাপাইয়া শিশু হত্যা করিয়াছে। যদি পৃথক বিছানা করা সম্ভব না হয়, তবে একই বিছানায় প্রসূতি ও সন্তানের মধ্যে একটী বালিশ স্থাপন করা অতীব দরকার।

নিদ্রা

সন্তানের মলমূত্রের নিয়মানুবর্ত্তিতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। মলমূত্রকে নিয়মিত করিবার এক সহজ উপায় এই যে, প্রত্যহ একই সময়ে দুই বেলা মলমূত্র ত্যাগের ভঙ্গিতে শিশুকে বসাইয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে অভ্যাস সৃষ্টি করা যাইবে। শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে পানের বোটা দিয়া পায়খানা করানোর নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। প্রথমেই কোনও ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পানের বোঁটা দিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করা মন্দ নয়।

মলমূত্র

শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ মোটামুটি চলনসই হওয়া দরকার। মনের উপর পোষাক-পরিচ্ছদের ক্রিয়া হইয়া থাকে, একথা সকলেই অবগত আছেন। সেজন্য শিশুদের পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বিলাসিতাপূর্ণ চাক্‌চিক্যময় পোষাকও শিশুকে পরান উচিত নহে। ইহাতে শিশুর মধ্যে অনেক মানসিক ও শারীরিক দোষ ঘটিয়া থাকে। সেজন্য শিশুর পোষাক নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ

পরিমিত ব্যায়াম ও খেলাধূলা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। খেলাধূলায় শিশুর মানসিক উন্নতিও হইয়া থাকে। খেলা দেহ-বৃদ্ধি ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া শিশু স্বভাবতঃই খেলা-প্রিয়। যাহারা ছেলেমেয়ের পড়া শোনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তাহাদিগকে খেলা হইতে বঞ্চিত করে, তাহারা শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের শত্রুতা করিয়া থাকে। খেলার প্রতি

ব্যায়াম ও খেলাধূলা

অজ্ঞতাজনিত বিদ্বেষ বশতঃ আমাদের দেশের কত পিতামাতা যে সন্তানের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্রীড়া-কৌতুক সাধারণ ভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধান করা ছাড়াও একটী বিশেষ উপকার এই করিয়া থাকে যে, শিশু খেলাধূলা হইতেই সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, একতা, সঙ্ঘবদ্ধতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় সামাজিক গুণসমূহের সমস্তই শিশুরা খেলার মাঠে শিক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং শিশুদের খেলাধূলার স্বাভাবিক বৃত্তিতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। কর্ত্তব্য শুধু ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ করা। শিশুগণ যাহাতে নিয়মিত ভাবে পরিচালিত নির্দ্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকে অভ্যস্ত হয়, সেদিকে পিতামাতা ও গুরুজনের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে উইলিয়ম কবেট তাঁহার 'যুবক-গণের প্রতি উপদেশ' নামক প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থের 'পিতার প্রতি উপদেশ' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন: "ক্রীড়া-কৌতুকে শিশুগণকে বাধা না দিলে এবং শাসন না করিলে তাহারা স্বভাবের অতিরিক্ত কিছুই করিবে না। যতটুকু তাহাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজন, তাহার বেশী তাহারা অগ্রসর হইবে না।" বস্তুতঃ ইহা অতীব সত্য কথা যে শিশুগণকে আমরা 'নেতি' নেতি' করিয়াই নষ্ট করিয়া থাকি। যে কাজ নিষেধ করা হইবে, শিশু-মন সেই কার্য্য সাধনের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে।

শিক্ষা

শিশুকে নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার দেহ সুগঠিত করা বা তাহার স্বাস্থ্য ভাল রাখা যত সহজ, সুশিক্ষা দ্বারা তাহাকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করা তত সহজ নহে। সন্তান জন্মদানে পিতামাতার কোন কৃতিত্ব নাই; সন্তানকে 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলার মধ্যেই কৃতিত্ব নিহিত রহিয়াছে।

যাহারা সন্তানকে সুসন্তান রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে আদর্শ পিতামাতা। সন্তানকে সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয় রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিশুকে সৎসঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্ভব হইলে খেলাধুলা ব্যতীত অন্য সকল সময় শিশুকে পিতামাতার সঙ্গে রাখা ভাল। এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শিশু-মনের সমস্ত কৌতূহলোদ্রিক্ত প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিয়া শিশু-মনকে চমৎকাররূপে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। অনেক পিতা সন্তান ও নিজেদের মধ্যে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষার জন্য সন্তানগণের সহিত ভাল করিয়া মিশেন না। ইহা ভ্রমাত্মক এবং সন্তানের শিক্ষার পক্ষে অতিশয় মারাত্মক। পিতামাতার এরূপভাবে চলা উচিত, যাহাতে সন্তানগণ পিতা-মাতাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে, এবং পিতামাতার নিকট কিছু গোপন না করে। ফলতঃ সন্তানগণের আস্থা লাভ করা পিতামাতার সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

সন্তানদিগকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা নিয়ম করা সম্ভব নহে। ব্যক্তি- ও অবস্থা-ভেদে নিয়ম-কানুনের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। তবু উইলিয়ম কবেট এসম্বন্ধে যাহা-যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ পিতা ও সন্তানের উপর প্রযোজ্য বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম: "আমার ছেলে-মেয়েরা সকলেই প্রশংসার সহিত পাশ-করা ছাত্র ও নাম-করা বিদ্বান। কিন্তু আমি ইহাদিগকে শৈশবে একদিনের জন্যও তিরস্কার করি নাই; বা কোনও কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করি নাই। আমি আমার জীবনে একবারও আমার পুত্র-কন্যার কাহাকেও বই পড়িবার জন্য আদেশ করি

কবেটের মত

নাই। আমি শুধু কথোপকথনে আমার ছেলেমেয়েদের জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা করিতাম। আমার প্রধান লক্ষ্য থাকিত তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে। খোলা মাঠের অফুরন্ত আনন্দ তাহাদের শরীর সুস্থ ও বাগানের সৌন্দর্য্য তাহাদের প্রাণ তাজা রাখিত। আমার লাইব্রেরীর টেবিলে ক্রীড়া-কৌতুক সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক শিশুপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া থাকিত। তৎসঙ্গে কাগজ, কলম, পেন্সিল, দোয়াত, রবার প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত থাকিত। বৃষ্টির দিনে ছেলে-মেয়েরা খেলায় বাহির হইতে না পারিয়া লাইব্রেরীতে তাহাদের মাকে ঘেরিয়া বসিত। পুস্তকসমূহে পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা ইত্যাদির রঙ্গীন ছবি দেখিয়া উহারা পুস্তকে আকৃষ্ট হইত। সকলে মাকে, এবং আমি থাকিলে আমাকেও, নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত। সে সব প্রশ্নের সবগুলিই শিশু-মনের জিজ্ঞাসা। সমস্তই জ্ঞানের ক্ষুধার পরিচায়ক। আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেমেয়েকে মিথ্যা স্তোক না দিয়া, 'বড় হইলে বুঝিবে' বলিয়া ধমক না দিয়া তাহাদের বোধগম্য করিয়া প্রত্যেকটী প্রশ্নের উত্তর দিতাম। ছেলেমেয়েদের সকাল সকাল শোয়ানো যেমন দুরূহ, সকালে শয্যাত্যাগ করানোও তেমনি কঠিন, তাহা সকলেই জানেন। এ ব্যাপারেও আমি ছেলেমেয়েদের কোনও দিন আদেশ করি নাই। আমি শুধু নিয়ম করিয়াছিলাম যে, যে সকলের আগে উঠিবে, সে হাজিরাখানার টেবিলে আমার ডান দিকে বসিবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই লইয়া প্রতিযোগিতা হইত। এইভাবে সকালে শয্যাগ্রহণ ও সকালে শয্যাত্যাগে উহারা বিনা-শাসনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মোটকথা শাসনের দ্বারা শিশু-মন নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা ভালবাসার দ্বারা তাহার নিয়ন্ত্রণ সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয়, ইহা আমার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। পিতাকে সর্ব্বদা এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে সন্তানগণ তাঁহাকে ভালবাসে এবং তাঁহার সংস্পর্শে থাকিতে চায়। যে পিতাকে সন্তানগণ ভয় পায়, যাঁহার অনুপস্থিতিকে সন্তানেরা বাঞ্ছনীয় মনে করে, "আজ বাবা বাসায় থাকিবেন না" বলিয়া যে পিতার সন্তানেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সে পিতার দ্বারা সন্তানের প্রকৃত সুশিক্ষা হওয়া সম্ভব নহে।" বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও সাংবাদিক উইলিয়ম কবেট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী কথা কত মূল্যবান, সামান্য চিন্তা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

শিশুগণকে ভদ্র ও শিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাদের সহিত ভদ্র ও শিষ্ট ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাদের সহিত 'তুই-তুঙ্কার' ব্যবহার করিলে তাহারা গুরুজনকে 'তুই-তুঙ্কার' করিয়া থাকে। সুতরাং শৈশব হইতেই পিতামাতার এদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত।

শিশুগণকে সত্যবাদী, সরল, দয়াবান, ক্ষমাশীল, সাহসী, সংযমী ও বীর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে পিতামাতার ঐ সমস্ত গুণে অভ্যস্ত হইতে হইবে; অন্ততঃ ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী লোকের সংসর্গে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজেরা যাহা-ইচ্ছা-তাহা ব্যবহার করিব, অথচ ছেলেমেয়েরা আদর্শ-চরিত্র প্রতিভাশালী ভদ্রলোক হইবে, ইহা আশা করা বাতুলতামাত্র।

রোগের প্রতিষেধ

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য-কর্ত্তব্য। উহাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য নিয়মিত আহার, পরিমিত ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে কথাও আমরা বলিয়াছি।

সাধারণভাবে ঐ সমস্ত সতর্কতা ছাড়াও শিশুগণকে কতকগুলি পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশের শিশু-সন্তানগণকে প্রায়শঃ এই সমস্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাধি সংক্রামক বলিয়া বাড়ীতে একজনের হইলেই আর সকলকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সমস্ত ব্যাধির আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে।

হাম।—সর্দ্দি কাসি ও জ্বর সহ চোখ হইতে জল পড়িয়া তৃতীয় বা চতুর্থ দিবস হইতে সর্ব্বাঙ্গে লালবর্ণ ঘামাচির মত বাহির হয়। এই রোগে ৫।৬ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া যায়। কিন্তু সর্দ্দি কাসি ও হাম থাকিয়া যায়। সেই সময়ে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে হাম বসিয়া গিয়া নিউমোনিয়া হইতে পারে। বাড়ীতে এক ছেলের হাম হইলে অন্য সমস্ত ছেলেমেয়েতে উহা সংক্রমিত হয়। সুতরাং বাড়ীতে কিম্বা প্রতিবেশীর কোনও ছেলেমেয়ের হাম হইলে রোগীর সহিত অন্য ছেলেমেয়েকে মিশিতে দিবে না। কারণ হামের কীট রোগীর নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া নাসিকার ভিতর দিয়া অপরের শরীরে প্রবেশ করে। হাম-রোগীর কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্র গরম-জলে না ফুটাইয়া অন্য শিশুকে সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দিবে না। এই রোগ শিশুদিগকেই প্রধানতঃ আক্রমণ করে। পাঁচ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক শিশুগণই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

হুপিংকাশ।—এই রোগেও সাধারণতঃ শিশুরাই আক্রান্ত হয়। শিশুদের কাশ হইলেই তাহা প্রায়ই হুপিংকাশে পরিণত হয়। এই কাশিতে রোগী একদমে অনেকক্ষণ কাসিয়া শেষে মোরগের বাঙ্গের মত হুপ শব্দ

করিয়া থাকে বলিয়া ইহাকে হুপিং কফ বলা হয়। হুপিং কফও সংক্রামক। সুতরাং এক শিশুর হুপিং কফ হইলে অন্য শিশুকে যথা-সম্ভব দূরে রাখিবে। হুপিং কফের রোগীকে রাত্রিতে বিছানায় শোওয়াইবার সময় শূকরের চর্ব্বি গরম করিয়া তাহার পায়ের তলায় মালিশ করিবে। 'রম' নামক পুরাতন মদ শিশুর পিঠে মালিশ করিলেও হুপিং কফে উপকার হয়।

ক্রমি।—শিশুগণের আর এক ব্যাধি ক্রমি। ক্রমি দুই প্রকার— সূত্র ক্রমি ও কেঁচো ক্রমি। সূত্র ক্রমি সাদা সূতার ন্যায় সরু ও ক্ষুদ্র। ইহারা গুহ্যদ্বারে কিলিবিলি করিয়া অত্যন্ত চুলকানি সৃষ্টি করে। বড় ক্রমি বা কেঁচো ক্রমি আরও উর্দ্ধে ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পাকস্থলীতে বাস করে। পেটে ক্রমি থাকিলে অজীর্ণ, মুখে দুর্গন্ধ, বাতাধ্মান, গুহ্যদ্বারে ও নাসিকাগ্রভাগে চুলকানি, শুষ্ক-কাসি, নিদ্রায় চম্‌কাইয়া উঠা, নিদ্রায় দাঁত কড়মড় করা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনিয়মিত খাওয়া, অতিরিক্ত চিনি খাওয়া প্রভৃতি কারণে ক্রমি হইয়া থাকে। প্রত্যুষে লবণ-জল পান করিলে কিম্বা লবণ-জল ঈষৎ গরম করিয়া বিকালবেলা ডুশ দিলে ক্ষুদ্র-ক্রমিতে উপকার হইতে পারে।

ডিপ্‌থিরিয়া।—সাধারণতঃ ৩ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক শিশুর ডিপ্‌-থিরিয়া রোগ হইতে দেখা যায়। গলার ভিতরে পরদা পড়িয়া শ্বাসনালী বা অন্ননালীর কার্য্যের অসুবিধা হইলেই তাহাকে ডিপ্‌থিরিয়া বলে। রোগীর হাঁচি, কাশি ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসে এই রোগ সংক্রমিত হয়। এই রোগে জ্বর, কাশি, গলায় ব্যথা, গলার হাড় ফুলা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ খুব মারাত্মক। রোগের প্রারম্ভে সিরাম ইন্‌জেকশন

না করিলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া অনেক শিশুই মারা যায়। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত সাধারণ সতর্কতার ব্যবস্থা আছে, এই রোগেও সেই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব প্রয়োজনীয়।

টিটেনাস্।—কুৎসিৎ ও সঁ্যাতসঁ্যাতে সূতিকাগৃহে নির্ম্মল বায়ুর অভাব, আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি কারণে এবং শিশুর গায়ে তৈল মাখাইয়া অধিক অগ্নিতাপ লাগাইলে কিম্বা অতিরিক্ত হিম লাগিলে শিশুর টিটেনাস্ বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইয়া থাকে। জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে দেখা যায়। ইহাতে শিশুর চোয়াল আট্‌কাইয়া যায়, পিঠের দাঁড়া শক্ত হয় ও বাঁকিয়া যায়। পা শক্ত হয় ও খেঁচিতে থাকে।

চোখ উঠা। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত গরমে চক্ষের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী প্রদাহিত হইয়া চোখ লালবর্ণ হইলে তাহাকে চক্ষু উঠা বলে। এই রোগে চক্ষু বেদনাপূর্ণ হয়। ইহা সংক্রামক। সুতরাং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বসন্ত। প্রথমে জ্বর হয়। ঐ জ্বরে মাথায় ও পেটে যন্ত্রণা হয়। ৩।৪ দিন জ্বর হইবার পর শরীরে আঙুরের দানার মত ফুস্কুড়ি বাহির হয়। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক ও অতিশয় মারাত্মক। এই রোগের বিষ রোগীর নিঃশ্বাসে, কাপড়-চোপড়ে, বিছানা-পত্রে এবং গায়ের চর্ম্মে লুক্কায়িত থাকে। এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক টীকা। প্রত্যেক শিশুকে ছয়মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যেই টীকা দিবার ব্যবস্থা করিবে। যদি কোনস্থানে বসন্ত রোগ দেখা দেয়, তবে সে স্থানের সদ্যজাত শিশুকেই টীকা দেওয়া উচিত। এক টীকার ফল তিন বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী থাকে না। সুতরাং তিন বৎসর অন্তর অন্তর টীকা লওয়া উচিত।

কলেরা। এক প্রকার সূক্ষ্ম কীট খাদ্য ও পানীয়ের সহিত উদরে প্রবেশ করিলে কলেরা রোগ হয়। ইহা অতিশয় সংক্রামক ও মারাত্মক। অন্যান্য সংক্রামক রোগে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে সমস্ত সতর্কতা এখানেও অত্যাবশ্যক ত বটেই, তাহা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সংক্রামক আকারে কলেরা দেখা দিলে কলেরা-টীকা লওয়া প্রয়োজন।

শিশু-মৃত্যু

উপরে শিশুপালনের যে সংক্ষিপ্ত নিয়ম বর্ণিত হইল, শিশু সমাজের কল্যাণের জন্য ইহা আমাদের অপরিহার্য্য জ্ঞাতব্য বিষয়। অথচ এ সব ব্যাপারে আমাদের পিতামাতারা এতই অজ্ঞ যে, তাহাদের অজ্ঞতার শোচনীয় পরিণাম আজ আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুমজ্জা ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। ১৯৩২ সনে বাঙ্গলায় প্রতি হাজারে জন্ম-সংখ্যা ২৬·৬ ও মৃত্যু-সংখ্যা ২০·৫ এবং ১৯৩৩ সনে জন্ম-সংখ্যা ২৯·৫ ও মৃত্যু-সংখ্যা ২৪·০। প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশের মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাঙ্গলার শিশু-মৃত্যু সংখ্যাই বেশী। ১৯৩৩ সনে বাঙ্গলায় মোট ৫২৪৮১ জন মৃত সন্তান প্রসূত হইয়াছিল এবং এক বৎসরের কম-বয়স্ক ২৯৪৯৭৫ জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই মৃত্যু-সংখ্যা বাঙ্গলার মোট মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা ২৪·৬। শিশু-মৃত্যুর মধ্যেও আবার শতকরা ৫৬ জনই এক মাসের কম-বয়সে মারা গিয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের শিশু-মৃত্যুর হার প্রসূতি-মৃত্যুর হারের চেয়ে কম ভয়াবহ নহে। এ সমস্তই প্রসূতি-বিদ্যা

ও শিশু-পালনে আমাদের শোচনীয় অজ্ঞতার দরুণই হইয়া থাকে। বাংলা সরকারও স্বীকার করিয়াছেন যে, রীতিমত ও ধারাবাহিক প্রচারের দ্বারা আমাদের দেশবাসীকে প্রসূতি-চর্চ্চা ও শিশু-পালনে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ভ্রূণের লিঙ্গ-নির্ণয়

গর্ভে পুত্র-সন্তান কি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহা জানিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহই বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সত্য বটে, ঐ সমস্ত মতের সবগুলি বৈজ্ঞানিকের গবেষণার মানদণ্ডে ওজন করিয়া দেখা হয় নাই। তবু অনেক ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত মতবাদ সত্য প্রতিপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

এ বিষয়ে একটী মত এই যে, গর্ভের চতুর্থ মাসের পর ষ্টেথস্কোপের সাহায্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। গর্ভিণীর বক্ষের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যন্ত্র লাগাইয়া ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গণনা করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, কন্যা-সন্তানের স্পন্দন-সংখ্যা পুত্র-সন্তানের স্পন্দনের চেয়ে বেশী হয়। অনেকের মতে পুত্র-সন্তানের স্পন্দন-সংখ্যা ১২৪ এবং কন্যা-সন্তানের স্পন্দনের সংখ্যা ১৪৪। এসম্বন্ধে মতভেদও দৃষ্টিগোচর হয়। তবে ১২৪এর অধিক স্পন্দন হইলে তাহা কন্যা-সন্তানের স্পন্দন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সকল সময়ে এই মতবাদ ঠিক প্রতিপন্ন হয় না। তাহা ছাড়া ডাক্তার ব্যতীত এই পরীক্ষা অন্য লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।

আমাদের দেশে মেয়েমহলে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণের বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এইসব মতবাদ অনেক সময়ে সত্য হইতে দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত মতবাদের কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না বটে, কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের মেয়েদের একটী মত এই যে, গর্ভিণীর নাভি দেখিয়া ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। গর্ভিণীর নাভি যদি ফুলের মত ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে গর্ভিণীর পেটে মেয়ে সন্তান জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে ; আর যদি গর্ভিণীর নাভি উন্মুক্ত না হইয়া উপরের চামড়া নিম্নে ঝুলিয়া নাভির উপর ঘোম্‌টা সৃষ্টি করে, তবে বুঝিতে হইবে গর্ভিণীর পেটে পুত্রসন্তান আছে।

গর্ভিণীর উদর দর্শনে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের প্রথাও আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত আছে। গর্ভিণীর উদর বামদিকে ঝুলিয়া পড়িলে এবং বামদিকে সন্তান নড়াচড়া করিলে পুত্রসন্তান এবং ডানদিকে উদর ঝুলিয়া পড়িলে এবং ডানদিকে সন্তান নড়াচড়া করিলে কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

গর্ভিণীর গায়ের বর্ণও, আমাদের মেয়েদের মতে, ভ্রূণের লিঙ্গ-জ্ঞাপক। গর্ভিণীর গায়ের বর্ণ যদি খুব উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় হয়, তবে ভ্রূণ স্ত্রীলিঙ্গ ও গর্ভিণীর গায়ের বর্ণ ময়লা হইলে ভ্রূণ পুংলিঙ্গ বুঝিতে হইবে।

গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তন বড় হইলে কন্যা এবং বাম স্তন বড় হইলে পুত্র হইয়া থাকে বলিয়াও আমাদের মেয়েমহলে মতবাদ প্রচলিত আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সমস্ত মতবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মানদণ্ডে পরিমাপ করা হয় নাই। অনেক চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন যে, আমাদের মেয়েমহলের এই সমস্ত মতবাদই অবৈজ্ঞানিক এবং মাঝে মাঝে দুই একটা ভবিষ্যদ্বাণী যে মিলিয়া যায়, তাহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এই সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞের সহিত আমাদের কোনও তর্ক নাই। আমরা মেয়েমহলের এই সমস্ত মতবাদকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ীভূত করিবার জন্যই উহাদের উল্লেখ করিলাম।

গর্ভ হইয়া গেলে উহার লিঙ্গ নির্দ্ধারণ বড় কথা নহে। কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কি মানব-কল্যাণ কোনও দিক হইতেই উহার বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ দশমাস পরে যাহা জানা যাইবে, দশমাস আগে তাহা জানিবার জন্য তাড়াহুড়া করিয়া গবেষণা করিবার কোনও অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা নাই। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করিয়া ইচ্ছামত উহার পরিবর্ত্তন করা যদি সম্ভব হইত, তবে অবশ্যই এই লিঙ্গ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকিত। তাহা না করিয়া শুধু জানিয়া রাখিয়া বরঞ্চ পুত্রকামী পিতামাতাকে দশমাস আগেই হতাশ করিয়া বিশেষ কোনও লাভ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। X'Ray ইত্যাদির সাহায্যে অনায়াসে লিঙ্গ নির্ণয় করা যাইতে পারে বলিয়া শোনা যায়।

কিন্তু এই লিঙ্গ-নির্দ্ধারণের আর একটা দিক আছে এবং উহাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে। তাহা হইতেছে ইচ্ছামত ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা। এই নির্দ্ধারণ ভ্রূণ-সৃষ্টির পরের ব্যাপার নহে—পূর্ব্বের। এই বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ, কি কারণে স্ত্রী-ও কি কারণে পুংভ্রূণ জন্মগ্রহণ করে, পিতামাতা ইচ্ছা করিলে

ইচ্ছামত সন্তানের লিঙ্গ-নির্দ্ধারণ করিতে পারে কিনা, এই সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। এই বিষয়টী জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া আমি বর্ত্তমান অধ্যায়ে উহার আলোচনা না করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উহার আলোচনা করিলাম।

একাদশ অধ্যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা—রতিক্রিয়ার দুই উদ্দেশ্য—জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি—জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দৈহিক আবশ্যকতা—রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতা—অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—ম্যালথাসের মতবাদ—জন্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা—মিসেস্ স্যাঙ্গারের মতবাদ—মিসেস্ স্যাঙ্গারের পরিকল্পনা—জন্মনিয়ন্ত্রণে আপত্তি—অস্বাভাবিক?—জনসংখ্যা হ্রাসের আশঙ্কা—বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা—যৌন-পাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা—নিরুদ্ধ সঙ্গম—পিচকারী-প্রয়োগ—যন্ত্র-প্রয়োগ—যৌগিক প্রক্রিয়া—লিঙ্গ নির্দ্ধারণ—ইউজিনিক মতবাদ।

পুরুষ ও নারীর যৌন-মিলনে সন্তান জন্মের যে সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনার উপর নারী-পুরুষের কোনও হাত নাই। এই জন্ম-সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ পিতামাতা ইচ্ছা করিলে সন্তান হইবে, আর ইচ্ছা না করিলে হইবে না, সন্তান-জন্মের উপর পিতামাতার অতখানি অধিকার স্থাপন করার নাম জন্ম-নিয়ন্ত্রণ।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুই-এক ক্ষেত্রে সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় যৌন-মিলন হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন-মিলনে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান-জন্মকে যৌন-মিলনের অপরিহার্য্য বিপদরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং সাধারণতঃ সন্তানের জন্ম বিধাতার বিধানরূপে মানিয়া লওয়া হয় মাত্র, অন্তরের সহিত চাওয়া হয় না।

কাজেই দেখা যাইতেছে, রতি-ক্রিয়ার দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক উদ্দেশ্য

রহিয়াছে। একটী সন্তান, আর একটী যৌন-আনন্দ লাভ। যে উপায় দ্বারা এই দুইটী পৃথক উদ্দেশ্য পৃথকভাবে সাধন করা যায়, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিলে রতি-ক্রিয়া দ্বারা যখন ইচ্ছা সন্তান লাভ এবং যখন ইচ্ছা কেবল যৌন-আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বলে। ইংরাজী Birth control কে অনেকে বাংলায় জন্ম-নিরোধ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহার অর্থ বা উদ্দেশ্য জন্ম-নিরোধ নহে—জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মাত্র। সন্তান-লাভ ও যৌন-আনন্দ এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক উদ্দেশ্য সন্তোষ-জনকরূপে সম্যক সাধিত হইতে পারে কেবল তখনই, যখন একটী উদ্দেশ্য সাধনে আর একটীর ভীতি আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া না তুলে। স্বেচ্ছালব্ধ পিতৃত্ব যেমন পিতার পরম আনন্দ-দায়ক, অনাকাঙ্ক্ষিত পিতৃত্ব তেমনই পীড়াদায়ক। রতিক্রিয়া মানুষের দৈহিক শক্তি দ্বারা এবং পিতৃত্ব তাহার সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা ও আর্থিক বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সুতরাং মানুষের আনন্দ-বৃত্তিকে তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল করা কোনও মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

রতিক্রিয়ার দুই উদ্দেশ্য

যাহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, তাহাদের অভিমত এই যে, অনভিপ্রেত পিতৃত্ব সভ্যতা-বিরোধী, পরিপূর্ণ আনন্দের বিঘ্ন। অনভিপ্রেত মাতৃত্ব নারীজাতির স্বাস্থ্য ধ্বংস করিতেছে। তাহা ছাড়া জাতকের উপরও ইহার ক্রিয়া নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাগণ আরও মনে করেন যে, যৌন-আনন্দ ও সন্তান জন্ম এই দুইটী ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে সম্পাদন করিবার শক্তি মানুষের নিতান্ত ন্যায্য অধিকার। আর জাতকের পক্ষ হইতেও একথা নিতান্ত ন্যায়-ও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা যাইতে পারে

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি

যে, নারী-পুরুষের কাম-বাসনা চরিতার্থতার অনভিপ্রেত ফল স্বরূপ সে সংসারে আসিতে চায় না; নারী-পুরুষ যদি তাহাকে কামনা করে তবেই সে আসিতে পারে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতাকে আমরা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দিক হইতে আলোচনা করিতে পারি। ব্যক্তির দিক হইতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সন্তানের জন্ম প্রসূতির দেহ ও মনের উপর এবং পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। স্নতরাং প্রথমে আমরা এইদিক হইতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতার আলোচনা করিব।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দৈহিক আবশ্যকতা

নারীর পক্ষে সন্তান ধারণ অতিশয় বিপজ্জনক। খুব স্বাস্থ্যবতী নারীর জীবনও প্রসবের সময় বিপন্ন হইতে পারে। আমাদের হতভাগ্য দেশের নারীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, যে-আমেরিকা ও ইউরোপে প্রসূতির জন্য সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত দেশেও প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা হাজারে চারি জন। পৃথিবীতে যত প্রকার বিপজ্জনক কার্য্য আছে, তাহার মধ্যে সন্তান-ধারণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হাওয়ায়ী জাহাজে ভ্রমণ, খনিতে কাজ করা প্রভৃতিই এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এসব কার্য্যেও মৃত্যু-সংখ্যা হাজারে একজনের বেশী নহে। স্নতরাং নারী-জীবনের নিরাপত্তার জন্য সন্তান-প্রসব যথাসম্ভব কম করা উচিত। জননীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্তে সন্তান ধারণের ক্ষমতা ও

সুবিধা থাকিলে প্রসূতির মৃত্যুর হার বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক হ্রাস করা যাইতে পারে, একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন। এদেশে প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যার হার আমি প্রজনন অধ্যায়ে দিয়াছি।

প্রসূতির মৃত্যুর চরম অবস্থার কথা বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক প্রসবই প্রসূতির স্বাস্থ্য অধিকতর ধ্বংস করিয়া দেয়। এক সময়ে যে নারীর দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবন উছলিয়া পড়িতে দেখিয়াছি, পর বৎসর একটি সন্তান প্রসব করিয়াই সে নারীর ফ্যাঁকাশে চেহারা, কোঠরগত চক্ষু, কেশ-বিরল মস্তিষ্ক দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছি। প্রসূতিকে দীর্ঘ দশ মাস যাবৎ নিজের রস-রক্ত দিয়া একটী জীবনকে প্রতিপালন করিতে হয়। এই সময় নিজের দেহের স্বাভাবিক অবস্থার প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনও সারবান খাদ্য ত সে গ্রহণ করিতে পারেই না, বরঞ্চ তদপেক্ষা অনেক অল্প খাদ্য গ্রহণ করিয়াই তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়। সুতরাং গর্ভধারণের ফলে তাহার জীবনীশক্তি অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া তাহার উদরের পেশী ঢিলা ও থল্‌থলে হইয়া যায়। ফলতঃ নারীর সর্ব্বাঙ্গে গর্ভধারণের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। খুব স্বাস্থ্যবতী জননী প্রসবের পরে দীর্ঘ দিনের বিশ্রাম পাইলে এই দৈহিক ক্ষতির খানিকটা পূরণ হইতে পারে। দীর্ঘদিন ভ্রূণ ধারণের ফলে গর্ভিনীর যে সমস্ত অঙ্গ শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া যায়, দীর্ঘদিনের বিশ্রামে সেই সমস্ত প্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহ পুনরায় সতেজ হইতে পারে। কিন্তু এই বিশ্রামের কোনও নিশ্চয়তা নাই; কারণ সন্তান জন্মের উপর নারী-পুরুষের কোনও হাত নাই। সমস্তই বিধাতার হাতে! ফলে প্রসূতিকে দম ফেলিবার সুযোগ না দিয়া একটীর পর আর একটী করিয়া

উপর্য্যুপরি বহু সন্তান জননীর দেহের সমস্ত রক্ত ও রস গ্রহণ করিয়া জননীকে একেবারে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে। এক গর্ভের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা দূর হইবার পূর্ব্বেই আরএক গর্ভ ধারণ করিয়া করিয়া পরিণামে নারী সম্পূর্ণ দুরারোগ্য ও জটীল রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। জরায়ু ও উদরের পেশী সম্পূর্ণ শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং জরায়ু-সম্পর্কিত নানা প্রকার জটীল স্ত্রীরোগে নারী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যবতী নারী যদি দুই গর্ভের মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়, তবে গর্ভধারণের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া পুনরায় গর্ভধারণের উপযোগী হইতে পারে। এই ভাবে একটী নারী সাত আটটি সন্তান ধারণ করিলেও তাহার শরীর ও স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। সতর-আঠারো বৎসরের যুবতীর সহিত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের যুবকের বিবাহ হইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসরকাল সন্তান লাভ করিতে পারে। পাঁচ বৎসরের বিশ্রাম দিয়া সন্তান প্রসব করিলেও ঐ দম্পতি পাঁচটি সন্তানের পিতামাতা হইতে পারে। এমন পিতা-মাতা আমাদের দেশে খুব কমই আছে, যাহারা পাঁচের অধিক সন্তান কামনা করিয়া থাকে। সম-বিভক্ত অবসরান্তর পঁচিশ বৎসরে পাঁচটী সন্তানের জন্মদান করিলে প্রসূতির স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না, অথচ ঘন-ঘন প্রসব করিয়া পাঁচটী সন্তানের জন্মদান করিলে প্রসূতির স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সন্তান-প্রসবের ফলে নারীর মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা দৈহিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। প্রত্যেক নারীর বিবাহিত জীবনের প্রথম ভাগ স্বপ্নময়, আনন্দপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রথম

দুই-এক সন্তানের জন্মও তাহাকে অধিকতর আনন্দই দিয়া থাকে। মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দৈহিক নির্য্যাতনকে ছাপাইয়া উঠে। কিন্তু এই ভাব অধিক দিন থাকে না। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর নূতন গর্ভের উৎপীড়ন, প্রসবকালীন মারাত্মক বিপদের কল্পনা, নবাগত সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব ইত্যাদি দুশ্চিন্তা তাহার সুখের সকল কল্পনাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। নৈরাশ্য ও উপায়হীনতার অনুভূতি তাহার সমস্ত উৎসাহ-উদ্যম নষ্ট করিয়া দেয়। ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর অধিকতর শারীরিক ও আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির কল্পনা তাহার জীবন একেবারে নিরানন্দ করিয়া তুলে। এই নৈরাশ্য ও উপায়হীনতার ভাব প্রসূতির অজ্ঞাতে ভ্রূণের উপর একটা ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহার পরিণামে সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় থাকিতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক পীড়া, দুরবস্থা প্রভৃতি মানুষের স্নেহ-মমতা হ্রাস করে। তদুপরি এরূপ ক্ষেত্রে এই অনভিপ্রেত সন্তানের জন্য স্বামী মনে-মনে স্ত্রীকে এবং স্ত্রী মনে-মনে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণা না হউক অন্ততঃ ঔদাসিন্য ও বিরক্তির ভাব জন্মগ্রহণ করে। পরিণামে ইহাই দাম্পত্য কলহে রূপান্তরিত হয়।

স্ত্রীর দিক হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে বুঝা গেল। স্বামীর দিক হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা অর্থনৈতিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরুষের যৌনবোধ অত্যন্ত তীব্র। এই তীব্র অনুভূতির তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহার স্ত্রী-সহবাস চাইই। সমাজ-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া নিজের রতি-বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে বিবাহিত স্ত্রীর সহিত রতি-ক্রিয়া করিবার

অবাধ সুবিধা তাহার থাকা দরকার। কিন্তু প্রত্যেক বারের রতি-ক্রিয়াতেই যদি একটী করিয়া সন্তান বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাকে হয় সন্তানের জন্ম মানিয়া লইতে হইবে, অন্যথায় রতি-ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে; এ দু'য়ের কোনোটাই না পারিলে তাহাকে নিজের স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারী সম্ভবতঃ বেশ্যাগমন করিতে হইবে। সন্তানের জন্ম যদি মানিয়া লয়, তবে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহার সাক্ষীর অভাব আমাদের দেশে নাই। লক্ষ লক্ষ পিতামাতার লক্ষ লক্ষ সন্তান অনাহারে, অশিক্ষায়, অচিকিৎসায় দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেছে, প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যে সঙ্গতি স্বামীর আছে, তাহাতে হয়ত কায়ক্লেশে দুই তিন জনের জীবনধারণ সম্ভবপর। এই অবস্থায় উপর্য্যুপরি কয়েকটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া পোষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং গর্ভধারণের ফলে স্ত্রীটী রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইল। যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিল তাহারাও উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও পরিচর্য্যার অভাবে রুগ্ন হইল। এই অবস্থা মানুষের জীবন দুর্ব্বহ না করিয়া পারে না। সুতরাং পিতা এই অবস্থা মানিয়া না লইলে তবে কি দ্বিতীয় শর্ত্ত মানিয়া লইতে পারে? পুরুষ কি রতি-ক্রিয়াবন্ধ করিয়া দিতে পারে? সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বড় বড় নীতিকথা ও আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, সাধারণভাবে ঐ ব্যবস্থা একেবারে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সন্তান জন্মের ভয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান যুবক বিবাহ করে না। ইহাতে সুস্থ ও সতেজ শিশু-সন্তান লাভে জাতি বঞ্চিত হইতেছে।

সুতরাং তৃতীয় ব্যবস্থায় যাইতে হয়। নিজের রতি-বাসনার তৃপ্তি-সাধনের জন্য পুরুষকে অন্যত্র নারী-সম্ভোগ করিবার ব্যবস্থা দিতে হয়।

কিন্তু সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি বা দাম্পত্য-সম্বন্ধ কোনও দিক দিয়াই এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

কাজেই স্বামীর দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, এমন উপায় আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে অনভিপ্রেত সন্তান জন্মের বিপদ এড়াইয়াও পুরুষ স্বীয় বিবাহিত-স্ত্রীর দ্বারা নিজের যৌন-ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে। এই উপায়ই জন্মনিয়ন্ত্রণ।

ব্যক্তির দিক হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণে আবশ্যকতা যতটা আছে, রাষ্ট্র ও সমাজের দিক হইতে উহার আবশ্যকতা তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নহে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতা

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, নাগরিকের জন্ম-মৃত্যুর হারের উপর রাষ্ট্রের কল্যাণ-অকল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

রুশিয়ার কথা বাদ দিলে জন্মের হারের দিক দিয়া ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্নে তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল:

এক হাজারে জন্মের হার

ভারতবর্ষ	ইংলণ্ড	ফ্রান্স	জার্ম্মাণী	হল্যাণ্ড
৩৬	২৪	২১	২৯	২৮

সুতরাং ইহা স্বভাবতঃই আশা করা যাইতে পারে, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়াও ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথম স্থানই অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। নিম্নে বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত দেওয়া গেল:

একশতে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি

দেশের নাম	বৃদ্ধির শতকরা গড়	স্থানীয় মান
দক্ষিণ ওয়েল্‌স্	৫'১০	প্রথম
ভারতবর্ষ	০'৯৩	বিংশ
ফ্রান্স	'০৬	অষ্টাবিংশ

দেখা যাইতেছে, জন্মহারের দিক দিয়া ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিলেও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়া বিংশ স্থানে নামিয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে জন্মের হার যেরূপ বেশী, শিশু-মৃত্যুর হার তুলনায় অনুপাতে তদপেক্ষা অনেক বেশী। নিম্নে বিভিন্ন দেশের তুলনা-মূলক মৃত্যু-হার দেওয়া গেল :

হাজারে মৃত্যু-সংখ্যা

ভারতবর্ষ	ইংলণ্ড	ফ্রান্স	জার্ম্মাণী	জাপান	অষ্ট্রেলিয়া
৪৩	১৩	১৯	১৭	২২	১৭

স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বেশী-সংখ্যক সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া বেশীসংখ্যক লোক মারা গেলে মোটের উপর জাতির তাহাতে বিশেষ কোনও লোকসান হয় না। কিন্তু প্রকৃত কথা

তাহা নহে। অধিক মৃত্যুর হার যে কেবল পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মনঃপীড়ার কারণ, তাহা নহে। মৃত্যুর হারের উচ্চতার অর্থই এই যে, দেশে রোগ-শোক, অশান্তি-দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশী। এই সমস্ত শিশুর জন্মদানে ও প্রতিপালনে পিতামাতার বিশেষ করিয়া মাতার যে শক্তিক্ষয় হইয়াছে, উহা বস্তুতঃই জাতীয় লোকসান। তাহা ছাড়া ঐ সমস্ত মৃত লোক মৃত্যুর প্রাক্কালে আত্মীয়-স্বজনের বহু অর্থ ও শক্তি ক্ষয় করিয়া গিয়াছে। এ সমস্ত লোকসানই জাতীয় লোকসান। ইহা ছাড়া আরও একটী গুরুতর বিবেচ্য বিষয় আছে। মৃত্যুর হারের উচ্চতার আর এক অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তিদের ছাড়াও আরও অনেক রোগী কোনও প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বাঁচিয়া-যাওয়া রুগ্ন লোকগুলি রাষ্ট্র ও জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যহীন অকর্ম্মণ্য পোষ্যমাত্র। ইহারা রাষ্ট্র ও জাতির ভার বৃদ্ধি করিবার জন্য কোনও ক্রমে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এইরূপ রুগ্ন অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে জাতি কালক্রমে নির্বীর্য্য রোগীর জাতিতে পরিণত হয়। মাইকেল ফিল্ডিং তদীয় Parent-hood নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেই জন্মের হার বেশী। ইহার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া না গেলেও আদম-শুমারীর প্রদর্শিত হিসাব তাহাই। দরিদ্রের সন্তানগণ শিক্ষার অভাবে কৃষ্টির আলোক প্রাপ্ত হয় না। ফলে উহাদের সন্তান-বৃদ্ধির অর্থ জাতির নিকৃষ্টতর অংশের বিবৃদ্ধি। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিতে গেলেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনীয়তা—ম্যাল্‌থাসের মতবাদ

অর্থনীতিবিৎ টমাস ম্যাল্‌থাস রবার্ট (১৭৬৬-১৮৩৪ খৃঃ) খুব জোরের সহিত এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের খোরাকী সরবরাহের অনুপাতে তাহাদের জন্মের হার এত অধিক যে, এই হারে জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অদূর-ভবিষ্যতে মানুষ খোরাকীর অভাবেই মারা যাইবে। ম্যাল্‌থাসের 'পৃথিবীর জনসংখ্যা' শীর্ষক বিখ্যাত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর জন-সংখ্যা জ্যামিতিক গতিতে (Geometrical progression) বৰ্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের খোরাকী সরবরাহ গণিতিক গতিতে (Arithmetical progression) বৰ্দ্ধিত হইতেছে। ম্যাল্‌থাস আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান হারে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অচিরকাল মধ্যে মানুষের খোরাকীর অভাব হইবে ; সুতরাং জন্মের হার মৃত্যুর হারের আনুপাতিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ম্যাল্‌থাসের মতবাদের মধ্যে ত্রুটী নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না। কারণ তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ও মানুষের নূতন প্রণালীর উৎপাদন-ক্ষমতার কথা বিশেষ বিবেচনা করেন নাই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, মানুষ তাহার সনাতন উৎপাদন-নীতিতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

অন্যান্য বিজ্ঞানোন্নত দেশে যাহাই হউক, আমাদের ভারতবর্ষে যে ম্যাল্‌থাসের মতবাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবাসী তাহাদের পিতৃ-পিতামহের আমলের আবাদী ভূমি ও উৎপাদন-প্রণালীকে যেভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জনসংখ্যা

বৃদ্ধি যে তাহাদিগকে দিন দিন অধিকতর দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অজ্ঞতাহেতু রোগ বৃদ্ধিও আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সুতরাং এদেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। আর একটী দিক হইতে আমরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকি। প্রত্যেক দেশেই বিশেষতঃ দরিদ্রের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষে গণোরিয়া, সিফিলিস, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি বিশ্রী রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই সমস্ত রোগীরা প্রত্যহ হাজার হাজার সন্তানের জন্মদান করিতেছে। ইহাদের জননকার্য্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে অদূর-ভবিষ্যতে দেশ ঐ সমস্ত বিশ্রী রোগে প্লাবিত হইয়া যাইবে।

অবশেষে নীতির দিক দিয়াও আমাদের জননক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। গণোরিয়া, সিফিলিস, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগীদের সন্তান-জন্মদানের কোনও অধিকার থাকা উচিত নহে। নিরপরাধ সন্তানকে অভিশপ্ত রোগী রূপে পৃথিবীতে আনিবার অধিকার কাহারও নাই। তাহার যথোপযোগী খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না করিয়া, শিক্ষার সুব্যবস্থা না করিয়া, মানুষ করিবার সকল প্রকার উদ্যোগ-আয়োজন না করিয়া সন্তান জন্মদান করা শুধু অন্যায় নহে, মহাপাপ। নিষ্পাপ সন্তান এমন কোনও অন্যায় করে নাই যাহার জন্য তাহাকে পিতামাতার কাম-লালসার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে সারা জীবন অশিক্ষার অন্ধকারে রোগজীর্ণ দেহ বহন ও অভিশপ্ত কালাতিপাত করিয়া। সুতরাং যাহারা বিচার-বিবেচনা না করিয়া পৃথিবীতে দুঃখী, রোগী ও অভাবগ্রস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা যে শুধু জাতি ও

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় করিতেছে তাহা নহে, তাহারা মানবতার শত্রুতা সাধন করিতেছে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মহিলা প্রবক্তা আমেরিকার মিসেস্ মার্গারেট স্যাঙ্গার এ বিষয়ে চমৎকার নূতন কথা বলিয়াছেন। এই আমেরিকান মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে জগতের শান্তি ও মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য এত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকেন যে, তিনি জগতের নারীজাতিকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত করিবার জন্য পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছেন।

মিসেস মার্গারেট স্যাঙ্গার

তিনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর বোম্বাই-এ অবতরণ করিয়াই সংবাদ-পত্র-প্রতিনিধির নিকট যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—Parenthood when it is responsible, can be a noble trust, a proud commission, and honoured assignment,—but this can be accomplished only by taking it out of the sphere of accident and placing it in the sphere of conscious responsibility. We can then trust that every child will be a wanted child, born to its rightful heritage of love, care and comfort. অর্থাৎ পিতৃত্বকে স্বেচ্ছাকৃত, দায়িত্বপূর্ণ, মহান ও সগৌরব কর্ত্তব্যে পরিণত করিতে হইলে উহাকে অন্ধ নিয়তির হাত হইতে মুক্ত করিয়া সজ্ঞান ও ইচ্ছা-সাপেক্ষ কার্য্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে।

মিসেস্ মার্গারেট স্যাঙ্গার জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইহাকে তিনি প্রত্যেক দেশ ও রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-বিভাগের

প্রধান কার্য্যক্রমে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। সেজন্য তিনি সমস্ত দেশেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ স্থাপন করিতেছেন। এই সমস্ত সঙ্ঘের কার্য্য হইবে: (১) নর-নারীকে জ্ঞানে উন্নত করা; (২) জন্ম ও মৃত্যুর হার হ্রাস করা; (৩) দেশান্তর গমন আইনের কঠোরতা দ্বারা মূর্খ, উন্মাদ, গণোরিয়া-সিফিলিস-রোগী, অপরাধী ও বেশ্যার গতি-নিয়ন্ত্রণ করা; (৪) আইনের কঠোরতা দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের প্রজনন-শক্তি ও-সুবিধা নষ্ট করা; (৫) ঐ শ্রেণীর অনভিপ্রেত নর-নারীকে জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার জন্য পৃথক উপনিবেশ স্থাপন করা ইত্যাদি।

মিসেস্ স্যাঙ্গারের পরিকল্পনা

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যেরূপ দৃঢ় মত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার বিরুদ্ধ মতসমূহও তদপেক্ষা কোনও অংশে কম দৃঢ় নহে। যাঁহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তি মোটামুটি এই: (১) ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ; (২) ইহাতে যৌন-পাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে; (৩) ইহাতে ক্রমে পৃথিবীর লোক-সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে; (৪) জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় পুরুষ ও নারীর বন্ধ্যা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণে আপত্তি

আমরা এক-একটী করিয়া এই সমস্ত আপত্তির সারবত্তা আলোচনা করিব। প্রথমতঃ অস্বাভাবিকতার কথাই ধরা যাউক। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অস্বাভাবিক কেন? পুরুষের রতি-ক্রিয়ার দৈনিক সংখ্যা প্রকৃতি নিশ্চয়ই বাঁধিয়া দেয় নাই। সুতরাং একজন যদি পাঁচ বৎসরে একবার মাত্র স্ত্রী-সঙ্গম করে, কিম্বা একেবারেই না করে, তবে তাহাকে ব্রহ্মচারী, সাধু বাবাজী বলিয়া অভ্যর্থনা করিবার

অস্বাভাবিক?

লোকের অভাব হইবে না। ঐ ব্রহ্মচারী বাবাজী যে অন্ততঃ পাঁচটী সন্তানের বাবা হইতে পারিতেন এবং তাহা যে তিনি হইলেন না, সেজন্য তাঁহাকে কেহ অস্বাভাবিক কার্য্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিতেছে না; অথচ যে পিতামাতা নিজেদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাত্র কয়েকটী সন্তান উৎপাদন করিল না, তাহাদের কার্য্যকে স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিবার হেতু ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যদি বলা হয় যে, একেবারে রতি-ক্রিয়া না করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু রতি-ক্রিয়া করিয়া সন্তান জন্মদান না করা অস্বাভাবিক, তবে তদুত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যেক রতি-ক্রিয়ায় সন্তানের জন্মলাভই কি স্বাভাবিক? বহুবার রতি-ক্রিয়া করিবার পর অকস্মাৎ একদিন গর্ভাধান হয়। তবে পার্থক্য এই যে, কোন্ রতি-ক্রিয়ায় যে গর্ভ হইল আর কোন্ ক্রিয়ায় হইল না ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা অন্ধের ন্যায় হাতড়াইয়া বেড়াইয়া থাকি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আমরা আমাদের এই অন্ধতা ঘুচাইতে পারি।

যদি বলা হয় যে, আমরা জন্ম-নিরোধ করিয়া শুক্র-কীট ধ্বংসের দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলিব, তবে তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে প্রকৃতিই কি প্রত্যহ বহু জীবাণু ধ্বংস করিতেছে না? বৃক্ষ-লতার ফুল-মুকুল হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যাদি কীট-পতঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতি মোটেই মিতব্যয়ী নহে। যে রতি-ক্রিয়ায় সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাতেও কোটী কোটী শুক্রকীট থাকে, অথচ সন্তান-জন্মের জন্য একটী মাত্র শুক্র-কীটই যথেষ্ট হইত। জীবাণু সম্বন্ধেই প্রকৃতি যে শুধু অমিতব্যয়ী তাহা নহে; প্রাণী-জগৎ

সম্বন্ধেও প্রকৃতি তথৈবচ। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা ও যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ধ্বংস হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য আমরা প্রত্যহ বহু মশা, মাছি, পিপীলিকা ধ্বংস করিতেছি। উপরোক্ত 'স্বভাব'বাদিগণ এই সমস্তের কোনওটাতেই কি প্রতিবাদ করিয়াছেন? মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা বুদ্ধি-বৃত্তি খাটাইয়া অনেক-কিছু করিয়াছি যাহা অন্য কোনও প্রাণী-শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্টি-গোচর হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের ঘর-বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, কাপড়-চোপড় হইতে আরম্ভ করিয়া চা-বিস্কুট পর্য্যন্ত সভ্যতা-সৃষ্ট সমস্ত জিনিষের নাম করা যাইতে পারে। আমরা যে আজ হাওয়ায়ী জাহাজে চড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছি, ইহা কি অস্বাভাবিক নয়? আমাদের উড়িয়া বেড়ানো যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় হইত, তবে স্রষ্টা কি আমাদিগকে দুইটা ডানা দিতে পারিতেন না? ফল কথা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিকতার যুক্তি প্রয়োগ করা হয় উহা সত্যই অস্বাভাবিক বলিয়া নহে, পরন্তু উহা অভিনব বলিয়া। যুগে-যুগে প্রত্যেক নূতন আবিষ্কার ও অভিনব মতবাদকে প্রাচীন-পন্থীরা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। অমন যে বর্ব্বর দাসত্ব-প্রথা, তাহাকেও স্বাভাবিক বলিয়া উহার সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করা হইয়াছিল!

যৌন-পাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এতদ্দ্বারা যৌন-পাপ বৃদ্ধি হইবে। নারী-পুরুষ এখন ব্যভিচারে বিরত থাকে লোক-লজ্জা, অপযশঃ, ও শাস্তির ভয়ে। তাহারা জানে যৌন-মিলনের ফলে গর্ভ হইতে পারে, কাজেই যে সমস্ত

নারীর বিবাহ হয় নাই বা স্বামী নিকটে নাই, সেই সমস্ত নারী ব্যভিচার করিতে সাহস পায় না। দ্বিতীয়তঃ সন্তান-বৃদ্ধির আশঙ্কায় স্বামীরা স্ত্রীর উপর বেশী মাত্রায় অত্যাচার করিতে পারে না। যদি সন্তান-জন্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে, তবে স্বামীরা তাহাদের পাশবিক লালসা তৃপ্তির জন্য সদাসর্ব্বদা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিয়া স্ত্রীর জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিবে। এই দুইটী যুক্তির মধ্যে প্রথমটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে যৌন-পবিত্রতা কেবল সন্তান-জন্মের আশঙ্কার উপর তিষ্টিয়া আছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আর যদি তাহা হইয়াও থাকে, তবু আমরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী থাকিব। কারণ কৃত্রিম যৌন-পবিত্রতার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। যে পবিত্রতা মানুষের স্বাভাবিক নীতি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সভ্যতার ও কৃষ্টির দিক হইতে সে পবিত্রতাকে নিতান্তই ব্যর্থ বলা যাইতে পারে। সে পবিত্রতাকে এমন উচ্চ মূল্য দেওয়া যায় না, যাহার জন্য অন্যান্য সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয় কোনও কর্ম্ম-পন্থা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু আসল কথা এই যে, মানুষের যৌন-পবিত্রতা ঐ আশঙ্কা ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমস্ত জাতির মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে অন্য কোনও জাতির চেয়ে কম যৌন-পবিত্রতা আছে, তাহা কেহই প্রমাণ করিতে পারে নাই। প্রাচীন-পন্থীদের যে প্রকৃতি-সিদ্ধ যুক্তি নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন-পন্থীরা তখন বলিতেন যে, মেয়েলোক যদি লেখা-পড়া শিখে, তবে বসিয়া বসিয়া কেবল পর-পুরুষের নিকট প্রেম-পত্র লিখিবে। বহু নারী শিক্ষিত হইয়াও যখন প্রেম-পত্র লিখিয়া বুড়াদের মনোবাসনা পূর্ণ করিল

না, তখন বুড়ারা বলিতে লাগিলেন যে, নারীরা পুরুষের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইলে তাহারা কেবলই ব্যভিচার করিবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও উহাদের যুক্তির ধারা ও আপত্তির কারণ সেই একই।

যৌন-পাপের দ্বিতীয় যুক্তিদাতারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, রতি-ক্রিয়াটা কেবল পুরুষেরই দৈহিক প্রয়োজন, নারীর উহাতে কোনও প্রয়োজন নাই। উহাদের ধারণা এই বলিয়া বোধ হয় যে, পুরুষ কামুক ও নারী কামপাত্র। পুরুষ যৌন-ক্রিয়ার সমস্ত আনন্দটুকু একাই ভোগ করে, নারী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কেবল পুরুষের মন রাখিবার জন্য অতিশয় কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক কোনও প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া থাকে মাত্র। কিন্তু রতি-ক্রিয়া বস্তুতঃ তাহা নহে। নারী-পুরুষের যোন-মিলন উভয়ের দৈহিক তীব্র প্রয়োজন; উভয়ে উহাতে সমান আনন্দলাভ করিয়া থাকে। তবে যাহারা স্ত্রীর যৌন-উত্তেজনা জাগ্রত না করিয়াই স্ত্রী-সম্ভোগ করিতে চায়, তাহারা যে রতি-ক্রিয়া না করিয়া প্রকৃতপক্ষে বলাৎকার করিয়া থাকে, সেকথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সে প্রকৃতি যাহাদের আছে, তাহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কোনও সংবাদ না জানিয়াও স্ত্রীর উপর বলাৎকার করিতে পারে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কোনও সম্পর্ক নাই।

তবে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, সন্তান-জন্মের আশঙ্কা দূর হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সঙ্গমের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়াইয়া ফেলিবে। যদি তাহা করেও তবে তাহাকে আতিশয্য বলা যাইতে পারে না এবং এতদ্দ্বারা যৌন-পবিত্রতা নষ্ট হইল, একথা বলা চলিবে না।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি এই যে, উহাদ্বারা পৃথিবীর লোক-সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং পরিণামে পৃথিবী লোকশূন্য হইবে।

এই আপত্তি যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অর্থে জন্ম-নিরোধ বুঝিয়া থাকেন। ইঁহারা অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, লোকে যদি ইচ্ছা করিলেই সন্তানের জন্ম রোধ করিতে পারে, তবে তাহারা আর কোনও দিন সন্তানের জন্ম দান করিবে না। বস্তুতঃ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ জন্ম-নিরোধ নহে। মানুষ সন্তানের জন্ম দিবে কি না, দিলে কখন, কতজন, কোন লিঙ্গের সন্তানের জন্ম দিবে, ইচ্ছামত ইহা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টার নামই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। বলা যাইতে পারে যে, গর্ভধারণে নারী জাতিকে যে দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহাতে নারীরা যদি একবার জন্ম-নিরোধের উপায়ের সন্ধান পায়, তবে আর কোনও দিন গর্ভধারণে সম্মত হইবে না। যাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা মানুষের, বিশেষ করিয়া নারীর মাতৃত্ব-বাসনার তীব্রতার সন্ধান রাখেন না। জরায়ু-সংক্রান্ত চিকিৎসা করিয়া ডাক্তার যখন নারীকে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার শরীরে আর কোনও ত্রুটী নাই, রতি-ক্রিয়ার কোনও অসুবিধা হইবে না, তবে তাঁহার গর্ভে আর সন্তান হইবে না, তখন সেই নারীর মুখের আকৃতি যে দেখিয়াছে, সেই কেবল জানে নারীর মাতৃত্বের বাসনা কত তীব্র। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান-লাভের আশায় শিবমন্দির দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া তাবিজ-কবজ ব্যবহারে আগ্রহের তীব্রতা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই জানে নারীকে সন্তান-জন্মের স্বাধীনতা দিলে তাহারা মোটেই গর্ভধারণ করিবে কি না! নারী-পুরুষ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিবে পিতৃ-মাতৃত্বের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য নহে, পরন্তু ঐ দায়িত্ব সম্যক ভাবে প্রতিপালনের জন্য। যত জনকে প্রতিপালন করিতে পারিবে, যত জনের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে, ঠিক তত জনকেই জন্ম দান করাই

হ্রাসের আশঙ্কা

প্রকৃতপক্ষে পিতৃত্বের দায়িত্ব-প্রতিপালন। প্রতিপালন করিতে পারিব একজনকে, জন্ম দিয়া বসিলাম দশ জনের, ইহাকে কদাচ পিতৃত্বের দায়িত্ব-প্রতিপালন করা বলা চলে না।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে চতুর্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি এই যে, দীর্ঘদিন জন্ম-নিরোধ অভ্যাস করিলে পুরুষ ও নারী উভয়েই বন্ধ্যা হইয়া যাইতে পারে। এই যুক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিলাম এই জন্য যে, ইহা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের খুব গোড়া সমর্থককেও ভাবাইয়া তুলিতে পারে। কারণ যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণে বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনাও দেখা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ইহাকে পরিত্যাগ করা না হউক, অন্ততঃ স্থগিত রাখিতে হইবে।

বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা

কিন্তু জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যাঁহারা বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ আরোপ করেন, তাঁহারা দলিল-প্রমাণ ও হিসাব-পত্র দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অথচ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দীর্ঘদিন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করিয়াও নারী-পুরুষ কাহারও দেহে কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুইটী কারণে নারী বন্ধ্যা হইতে পারে। একটী নারীর যোনি-দেশের পচনশীলতা ও অপরটী গণোরিয়া-সিফিলিসের আক্রমণ। প্রথমোক্ত কারণ বলপূর্ব্বক ভ্রূণপাতের ফল। দ্বিতীয় কারণ স্বামী হইতে সংক্রমিত। এই দুইটী কারণের কোনও কারণের সঙ্গেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়, একথার পক্ষে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না।

আর যাঁহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে বন্ধ্যাত্বের কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তি প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি-যোগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু যন্ত্রপাতি-নিয়োগই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় নহে, সেকথা আমি যথাস্থানে আলোচনা করিব। পুরুষের বন্ধ্যা হওয়া সম্বন্ধে ইঁহারা কোনও কথা বলেন না, বোধ হয় বলিতে পারেন না। কারণ কোনও ব্যাধিতে, প্রধানতঃ গনোরিয়া-সিফিলিসেই, পুরুষের শুক্রকীট নিস্তেজ হইলেই পুরুষ বন্ধ্যা হয়। হাজার যন্ত্রপাতি-নিয়োগ করিলেও পুরুষের শুক্রকীট নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় পুরুষের বন্ধ্যা হইবার কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যে দুই কারণে নারী বন্ধ্যা হইতে পারে যন্ত্রপাতি-বিনিয়োগ দ্বারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিলেও সেই দুই কারণ স্পর্শ করিতে পারে না, একথা আমরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কৌশল পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে স্ত্রী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের গঠন-প্রণালী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণে পরিপক্ক হইতে হইলে ঐ অধ্যায় ভাল করিয়া পড়া দরকার। কারণ নারী-পুরুষের জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান না থাকিলে এ কার্য্যে বিশেষ অসুবিধা হইবে। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হইলেও ইহা নিতান্ত সত্য কথা যে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর দোষে আমরা নিজেদের এত প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখি না। আমরা অনেক পোকা-মাকড় ও গাছ-গাছড়ার জন্ম-কথা শিখিয়াছি, কিন্তু মানব-জন্মের পদার্থবিজ্ঞানটুকু আমরা জানি না। ব্যাপারটা আরও হাস্যকর ও লজ্জাস্কর হইয়া উঠে সেইক্ষেত্রে, যেখানে নারী-পুরুষ আজীবন

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মূলসূত্র

কামচর্চ্চায় লিপ্ত থাকিয়া শরীর ধ্বংস করিয়াছে, অথচ জননেন্দ্রিয়সমূহের অবস্থান ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত জননেন্দ্রিয়ের গঠন-প্রণালী মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে আমরা পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করিতেছি। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ৩নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

প্রজনন-ক্রিয়ার কৌশলটী সংক্ষেপতঃ এই যে, পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ু-মুখে পতিত হয়; নারীর ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ববাহী নল বাহিয়া ডিম্ব জরায়ুতে নামিয়া আসে বা আসিতে থাকে; পুরুষের শুক্র-কীট জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হইলেই ভ্রূণ জন্মগ্রহণ করে। এই সম্মিলন-প্রণালী আমি ১৩নং চিত্রে দেখাইয়াছি। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কোনও উপায়ে নারীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্রকীটকে একত্র সংমিশ্রিত হইতে না দিলেই জন্মনিরোধ করা হইল। আরও স্থূলভাবে বলিলে বলা যাইতে পারে যে, পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ু-মধ্যে প্রবেশ না করিতে পারিলেই গর্ভধারণের সম্ভাবনা দূর হইল।

এই কার্য্য বিভিন্নরূপে করা যাইতে পারেঃ (১) নিরুদ্ধ সঙ্গম। (২) পিচকারী ব্যবহার। (৩) যন্ত্র ব্যবহার। (৪) ঔষধ প্রয়োগ। (৫) রতি-প্রক্রিয়া। (৬) যৌগিক-প্রক্রিয়া।

নিরুদ্ধ সঙ্গমকে ইংরাজীতে withdrawal এবং ল্যাটিনে coitus interruptus বলে। এই প্রক্রিয়ায় রতি-ক্রিয়া করিতে করিতে যখন শুক্র পতনোন্মুখ হয়, তখন দম্পতি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইবার পর পুরুষ ইচ্ছা করিলে

নিরুদ্ধ সঙ্গম

অন্যভাবে শুক্রস্খালন করিয়াও দিতে পারে, কিম্বা একেবারে শুক্রস্খালন নাও করিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। আবার এই প্রক্রিয়াটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত প্রথা। বাইবেলে ওনান এই প্রথা অবলম্বন করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহার জনপ্রিয়তার কারণ এই যে, এই প্রক্রিয়ায় কোনও পরিশ্রম, সাধ্য-সাধনা ও আয়োজনের আড়ম্বর, নাই বা অর্থব্যয়ের বালাই নাই। কিন্তু নারী-পুরুষের দেহের দিক দিয়া এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থতার দিক দিয়া এই উভয়তঃ ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এলিস ও ফিল্ডিং এবং আরও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মাইকেল ফিল্ডিং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে ইহার সাফল্যে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে খুব সতর্কতাসহকারে শুক্রস্খালনের পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার। তাহার পর সে দুরূহ ব্যাপার সাধন করিলেও শুক্রস্খলনের পূর্ব্বেই এক ফোঁটা শুক্র যে বাহির হইয়া জরায়ু-মুখে পতিত হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? সন্তান উৎপাদনে ত আর বেশী শুক্রের প্রয়োজন নাই ! এক বিন্দু হইলেই হইল। সুতরাং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে ফিল্ডিং সাহেবের মতে নিরুদ্ধ সঙ্গম খুব কার্য্যকরী নহে। এলিস ও ফিল্ডিং উভয়ে নারী-পুরুষের দেহের দিক দিয়া ইহার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, রতি-ক্রিয়ায় সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজিত হওয়ার পর হঠাৎ লিঙ্গ প্রত্যাহার করিলে তাহাতে পুরুষের স্নায়ুমণ্ডলে যে ঝাঁকি লাগিবে, তাহাতে তাহার বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে উত্তেজিত করিয়া অথচ তাহাকে তৃপ্তিদান না করিয়া রতি-ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ করিয়া দিলে তাহাতে নারী-দেহের প্রভূত ক্ষতি

হইতে পারে। তাহা ছাড়া, কখন শেষ মুহূর্ত্ত আসিবে, এই সব চিন্তার মধ্যে রতি-ক্রিয়ায় দম্পতি সম্যক আনন্দ পাইবে না বলিয়াই অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বহু স্ত্রীলোকেরও কুসংস্কার রহিয়া গিয়াছে যে তাঁহাদের চরম পুলক লাভ না হইলে গর্ভ-সঞ্চার হয় না। এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়াই চরম পুলক লাভের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন। ইহাতে লাভের মধ্যে কিছুই হয় না। লোক-সানের মধ্যে হয় শারীরিক পীড়া এবং মানসিক অশান্তি। প্রাচীন হেকিমী পুস্তক এই ভুল ধারণার জন্য অনেকটা দায়ী।

নিরুদ্ধ-সঙ্গমকে আরও একটু কৌশলে এবং ধৈর্য্যের সহিত সম্পাদন করিলে স্তম্ভিত-সঙ্গমে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। ইহাকে আমি যৌগিক প্রক্রিয়া নাম দিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। ইহা আমাদের ভারতীয় মুনি-ঋষিগণের দ্বারা আচরিত হইত।

রতি-ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে পিচকারী প্রয়োগ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আর এক উপায়। ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও ফিল্ডিং সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গম-শেষে যখন পিচকারী দ্বারা ধৌত করিবে, ততক্ষণে হয়ত দু'একটী শুক্রকীট জরায়ুমুখে প্রবেশ করিয়াছে। রতি-ক্রিয়ার সময়ে শুক্র যদি সোজা জরায়ু মধ্যে পতিত হয়, তবে পিচকারী দ্বারা সেক্ষেত্রে কোনই উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ এই ব্যবস্থাকে বিরক্তিকর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের মত এই যে, রতি-ক্রিয়ার পর উভয়ের শরীরে যে পুলকপ্রদ অবসাদ আসে, সেই অবসাদ উপভোগ করার

পিচকারী প্রয়োগ

জন্য ও সেই অবসাদনাশক বিশ্রামের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া উচিত। এই নিদ্রা উভয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু তৎপরিবর্তে পিচকারী ব্যবহার করিতে হইলে, উহা রতি-অবসাদগ্রস্ত দম্পতির পক্ষে যেরূপ বিরক্তিকর বোধ হইবে, তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও সম্ভবতঃ তেমনই অনিষ্টকর হইবে। রতি-ক্রিয়ার শেষে পুলকপ্রদ বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া, বিশেষতঃ শীতকালে, ঐ সব কাজ করিতে হইলে রতি-ক্রিয়াকে মানুষ ক্রমে ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিবে।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও বাজারে পিচকারীর খুব প্রচলন হইয়াছে। কুইনাইনের জল, প্যালফ্রিল পাউডারের জল, রজার্স পাউডারের জল পিচকারীতে ভরিয়া বার কয়েক পিচকারী করিলে শুক্র-কীটসমূহ মরিয়া যাইবে।

যন্ত্র-বিনিয়োগের দ্বারা শুক্র-কীটের সহিত ডিম্বের মিলন রোধ অর্থাৎ পুরুষের শুক্র-কীটকে জরায়ুতে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান ও বহুল-প্রচলিত প্রক্রিয়া বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। জননেন্দ্রিয়ের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে ঃ

যন্ত্র প্রয়োগ

(১) রবার পেশারী ; (২) ডাচ পেশারী ; (৩) কন্‌ডম বা ফ্রেঞ্চ ক্যাপ ; (৪) স্পঞ্জ।

রবারচেক পেশারী।—ইহা স্ত্রীলোকের ব্যবহারের জন্য। ইহার বিভিন্ন আকৃতি হইয়া থাকে। তবে নিম্নের চারিটী চিত্রে প্রদর্শিত সাইজই খুব বেশী প্রচলিত।

১৭নং চিত্র।
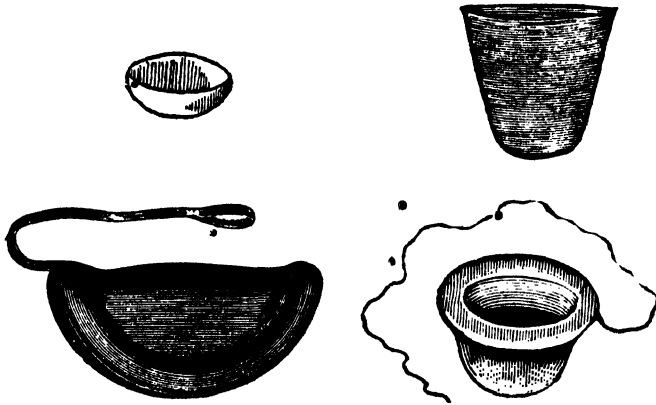
যে পেশারীর মুখে রবারের আংটী থাকে, তাহাকে অক্লুসিভ্ পেশারী ও যে পেশারীর তাহা থাকে না তাহাকে ডাচ পেশারী বলে। পেশারীর চিত্র দেখিয়াই বুঝা যাইবে যে, উক্ত পেশারীগুলির যে কোনও একটী নারীর জরায়ু-মুখে পরাইয়া দিলে জরায়ু-গ্রীবায় টাইট্ হইয়া লাগিয়া থাকিবে। জরায়ু-গ্রীবায় পেশারী চাপিয়া জরায়ু-মুখ একেবারে বন্ধ থাকিবে। কাজেই পুরুষের শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই দুইটী পেশারীর মূলনীতি একই। কিন্তু উহাদের পরাইবার প্রণালী একটু বিভিন্ন। অক্লুসিভ পেশারী ছোট, মাঝারি ও বড় এই তিন সাইজের পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মাঝারি সাইজই অধিকাংশ রমণীর উপযোগী হইয়া থাকে। জরায়ু-গ্রীবায় লাগাইবার সময় এই পেশারীর মুখ জরায়ুর দিকে ফিরিয়া থাকিবে। নিম্নের চিত্রে এই পেশারী ও ডাচ্ পেশারী

১। পেশারী

২। জরায়ুমুখ
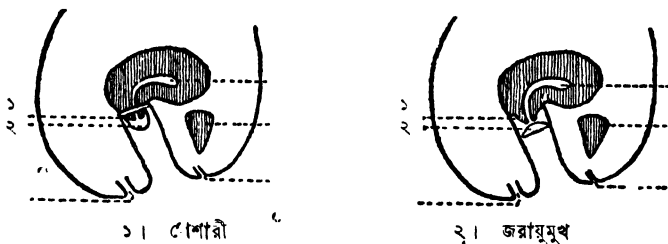
পরাইবার পার্থক্য প্রদর্শিত হইল। এই পেশারী পরাইবার সময় নারী চিৎ হইয়া শুইয়া অথবা পায়ের তলায় বসিয়াও লাগাইতে পারে। পেশারীর আংটী ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে চাপা দিয়া ধরিয়া এরূপভাবে অঙ্গে প্রবেশ করাইবে যেন পেশারীর মুখ উপর দিকে থাকে এবং অগ্রে যোনিতে প্রবেশ করে। পেশারী যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগে উর্দ্ধ ও ঈষৎ পশ্চাৎদিকে চাপ দিলে উহা আপনা-আপনি জরায়ু-গ্রীবা চাপিয়া ধরিয়া টাইট হইয়া লাগিয়া পড়িবে। পেশারী ঠিকমত লাগিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নারী তর্জ্জনীর সাহায্যে পেশারী আংটী অনুভব করিবে। তৎপর তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দিয়া পেশারীর ঢাকনীর উপর চাপ দিবে। যদি সে বুঝে যে পেশারীর ঢাকনীর মধ্যে জরায়ু-মুখ শক্ত হইয়া লাগিয়া আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পেশারী ঠিক মত লাগিয়াছে। পেশারীর ঢাকনী যদি এক-আধটু সঙ্কুচিত হইয়াও থাকে, তথাপি তাহাতে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। এই পেশারীর মস্ত সুবিধা এই যে, ইহা নারী যে কোনও মুহূর্ত্তে লাগাইয়া রাখিতে পারে। ইহা যোনিমধ্যে থাকার দরুণ স্ত্রীলোকের কোনও অসুবিধা হয় না. এমন কি

স্ত্রীলোকে বুঝিতেই পারে না যে, তাহার অঙ্গে কোনও একটী জিনিষ রহিয়াছে।

এই পেশারী সহজে খুলিবার স্থবিধার জন্য ইহার আংটীতে একটী সরু রেশমের রজ্জু থাকে। কিন্তু যাহারা পেশারী ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের এই রজ্জুর কোনও প্রয়োজন নাই।

যাহাদের অঙ্গুলির দৈর্ঘ্য যোনি-নালির গভীরতা অপেক্ষা কম, তাহারা নিজেরা এই পেশারী ঠিকমত বসাইতে পারে না। তাঁহাদের পক্ষে স্বামীর দ্বারা পরাইয়া লওয়াই নিরাপদ।

রতি-ক্রিয়ার শেষে তৎক্ষণাৎ এই পেশারী খুলিয়া ফেলিতে নাই। কারণ শুক্রকীট ষোল ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই ষোল ঘণ্টার মধ্যে তাহারা জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া ডিম্বের সহিত মিলিত হইতে না পারিলে সন্তান জন্মিবার আর কোনও আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং সঙ্গমের পর যোল ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই পেশারী জরায়ু-মুখে রাখিতে পারিলে নিরাপদ হওয়া যায়। এই দীর্ঘকাল রাখিতেও বিশেষ কোনও অসুবিধা নাই, সেকথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ডাচ পেশারী। যাহাদের জরায়ু-গ্রীবা খুব খাট, তাহাদের পক্ষে অঙ্গুসিভ পেশারী ব্যবহারে সত্যই অসুবিধা আছে। তাহাদের জন্য ডাচ পেশারীই উপযোগী। ডাচ পেশারী ও চেক পেশারীর ব্যবহারে পার্থক্য এই যে, চেক পেশারীর মুখ জরায়ুর দিকে থাকে; আর ডাচ পেশারীর মুখ বাহিরের দিকে থাকে; জরায়ুর দিকে ইহার পিঠ থাকে। ডেকৃচির মুখে যেমন সরাই চিৎ হইয়া থাকে, ঠিক তেমনই জরায়ু মুখে ডাচ পেশারী চিৎ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি জরায়ু-গ্রীবায় ঈষৎ প্রবেশ

করিয়া ইহা খুব টাইট্ হইয়া লাগিয়া থাকে। ১৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য। এই পেশারী ব্যবহার করা চেক পেশারী অপেক্ষা কঠিন। প্রথম প্রথম ইহা অভিজ্ঞ অন্য লোককে দিয়া লাগাইয়া লওয়া উচিত।

এই পেশারী লাগাইবার জন্য নারীকে ঠিক চেক পেশারী লাগাইবার আসনে বসিতে হইবে। ডান হাতের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে পেশারী যোনিমধ্যে এরূপভাবে প্রবেশ করাইবে যাহাতে পেশারীর মুখ নীচের দিকে থাকে। তৎপরে তর্জ্জনীর সাহায্যে পেশারীকে উর্দ্ধদিকে যতদূর সম্ভব ঠেলিয়া দিবে এবং পেশারীর ঢাকনীর উপর দিয়া জরায়ু অনুভব করিবে। খুলিবার সময় পূর্ব্ববৎ বসিয়া তর্জ্জনীর সাহায্যে এই পেশারী খোলা যায়।

কনডোম।—পুরুষের ব্যবহারোপযোগী। ইহা অনেক রকমের হইয়া থাকে। নিম্নের চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। এই কনডোম বা ক্যাপ্ একটী রবারের নল। ইহার একদিক খোলা এবং অপরদিক বন্ধ। এই ক্যাপ সাধারণতঃ চারি প্রকারের। তন্মধ্যে তিন প্রকারের ক্যাপের মাথায় ছবি-প্রদর্শিতরূপ পুটলী আছে। ঐ পুটলীই শুক্রাধার। ছবিতে ক্যাপের যে আকৃতি দেওয়া হইয়াছে উহা খোলা আকৃতি। পরাইবার পর উহারা ঐ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহার মুখে যে আংটী আছে ঐ আংটীর উপর উহা বল্টানো থাকে। রতি-ক্রিয়া শেষে শুক্র নির্গমনের সময় সমস্ত শুক্রই এই নলের অগ্রভাগস্থ শুক্রাধারে আটকিয়া থাকে; একবিন্দু শুক্রও বাহিরে পড়িতে পারে না।

ইহা জন্ম-নিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ যন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু নারী-পুরুষের যৌন-অঙ্গের ত্বকের সংস্পর্শে বাধা জন্মায় বলিয়া রতি-ক্রিয়ার আনন্দের অনেকখানি ব্যাহত হয়। যোনি-গহ্বরে এবং জরায়ু-

১৯নং চিত্র
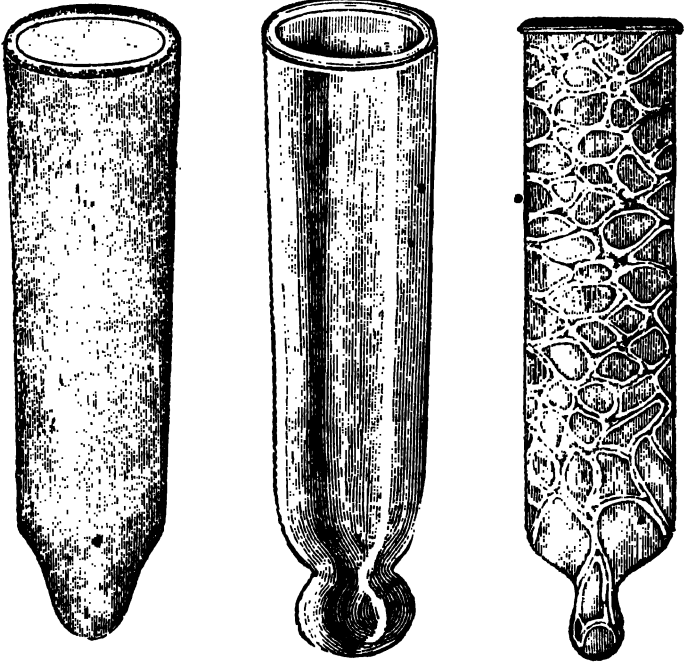
মুখে পুরুষের শুক্রপাত নারীর পক্ষে বিশেষ পুলকদায়ক; কিন্তু কনডোম ব্যবহারে নারীকে এই সুখ হইতেও বঞ্চিত করা হয়। মেরী ষ্টোপ্‌সের দৃঢ় অভিমত এই যে, নারীর যোনিগহ্বরে পুরুষ-শুক্র পতিত হইলে নারীদেহ সেই শুক্র শোষিয়া লয়। এই শোষণক্রিয়া নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব উপকারী। আবার নারীর যোনি-প্রাচীর হইতে যে সমস্ত

রস ক্ষরিত হয়, পুরুষের লিঙ্গ-গাত্র তাহাও শোষিয়া লয়। ইহাও পুরুষের পক্ষে উপকারী। কনডোম ব্যবহারে নারী-পুরুষ উভয়ে এই সুখানুভূতি ও উপকার হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু জন্ম-নিরোধে ইহার কার্য্যকারিতা অব্যর্থ বলিয়া অত অসুবিধার মধ্যেও নারী-পুরুষ ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা এই সমস্ত অসুবিধার কতক অংশ দূর করা যায়ঃ

(১) কনডোমের ভিতরে বাহিরে ভেসেলিন বা অনুরূপ দ্রব্য লাগাইলে ভাল হয়।

(২) কনডোম লাগাইবার পূর্ব্বে ইঞ্চিখানেক বাকী থাকিতেই টিপিয়া উহার মধ্য হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিবে।

(৩) পেচান অবস্থায় থাকা কন্‌ডম্ শুধু উল্টাইয়া গেলেই অঙ্গে সোজাভাবে পরিয়া যায়।

(৪) কন্‌ডোম্ সম্পুর্ণরূপে না ধুইয়া আবার ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

(৫) পূর্ব্বে ও পরে কন্‌ডোম্ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু প্রকার যন্ত্রপাতির প্রচলন আছে। উহাদের কার্য্যকারিতা ততটা নির্ভরযোগ্য নহে এবং কতকগুলি অনিষ্ট করে বলিয়া আমরা উহাদের উল্লেখ করিলাম না।

উপরোক্ত যান্ত্রিক উপায় সহ বা উহা ব্যতীত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রে এক প্রকার বটিকার উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের দেশের মেয়ে-মহলেও এই প্রকার ঔষধের কথা শ্রুতিগোচর হয়। এই বটিকা পরিমাণ-মত ঋতুস্রাবের পর সেবন করিলে

ঔষধ প্রয়োগ

সেই ঋতুতে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না। প্রত্যেক ঋতুস্নানের পর এই বটিকার একটী সেবন করিলে যতদিন ইচ্ছা ততদিন গর্ভ ঠেকাইয়া রাখা চলে। উপরন্তু ইহাদ্বারা নারীর স্বাস্থ্যেরও কোনও প্রকার হানি হয় না। শুনিতে এই ঔষধটী বড়ই ভাল লাগে এবং মনে হয়, কার্য্যকরী হইলে ইহাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিন্তু ইহার বিজ্ঞাপিত কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের কোন আস্থা নাই।

আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার নাম দেওয়া গেল ঃ

আকনাদির পাতা জল দিয়া বাটিয়া ঋতু স্নানান্তে সেবন করিলে সে মাসে গর্ভসঞ্চার হইবে না।

আড়াইটী গোলমরিচ ও পান গাছের শিকড় একত্রে বাটিয়া ঋতু স্নানান্তে ৩ দিন একতোলা করিয়া সেবন করিলে গর্ভসঞ্চার হয় না।

কাঁজি দ্বারা পিষ্ট জয়া পুষ্প পুরাতন গুড়ের সহিত ঋতুর সময়ে সেবন করিলে গর্ভসঞ্চার হয় না।

বিড়ঙ্গ, পিপুল ও সোহাগার খই সমভাবে চূর্ণ করিয়া ঋতুকালে দুগ্ধসহ সেবন করিলে গর্ভসঞ্চার হয় না।

খুব পুরাতন আকের গুড় ঋতু স্নানান্তে ৪।৫ দিন সিকি তোলা হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত দুইবেলা খাইলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না।

ঋতু বন্ধ হওয়ার পর প্রতিমাসে ৫।৬ দিন প্রত্যহ দুইবারে ৪।৫টী কুঁচ খাইলে গর্ভসঞ্চার হয় না।

ঋতুস্নানের পর ৪।৫ প্রাতে খালি পেটে মটর পরিমাণ শোধিত হিং কলার মধ্যে পূরিয়া খাইলে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা থাকে না।

উপরোক্ত আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী শাস্ত্রোল্লিখিত ঔষধসমূহ ব্যতীত বর্ত্তমানে কুইনাইন পেশারী নামক এক প্রকার বটিকা বাজারে প্রচলিত আছে। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ইহার খুব প্রচলন আছে।

এই পেশারী ক্ষুদ্র ও গোলাকার বটিকা বিশেষ। ইহা কুইনাইন, কোকো প্রভৃতির সংযোগে প্রস্তুত হয়। এই পেশারী রতি-ক্রিয়ার মিনিট পাঁচেক পূর্বে স্ত্রী-অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া দিলে এই বটিকা গলিয়া যাইবে। এই ঔষধের গুণ এই যে, ইহা শুক্রকীট ধ্বংস করে। কাজেই এই পেশারি যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবার দশ পনর মিনিট পরে রতি-ক্রিয়া করিলে এবং ঐ সঙ্গমে শুক্রপাত হইলে গলিত পেশারী শুক্রকীটসমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।

বাজার-প্রচলিত পেশারীর মধ্যে রেণ্ডেলের পেশারী ও ডকারের পেশারীই প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে রেণ্ডেলের পেশারী কুইনাইন ও কোকো-মাখনের মিশ্রণে এবং ডকারের পেশারী ল্যাকটিক এসিড ও ম্যাগনেশিয়া সালফেটের মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত পেশারী নির্ভরযোগ্য বলিয়া ডাঃ ফিল্ডিংএর মত। কিন্তু ইহাদের মূল্য প্রতি বটিকা প্রায় দুই আনা। মূল্যের আধিক্যহেতু যাহারা এই বটিকা ক্রয় করিতে না পারিবেন, তাঁহারা নিজেরা নিম্নলিখিত উপাদানের সাহায্যে পেশারী তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন :

এক ড্রাম কুইনাইন সালফেট ও এক আউন্স" কোকো-বাটার লইয়া প্রথমতঃ কোকো-বাটার গলাইয়া তাহাতে কুইনাইন সালফেট দিয়া খুব ঘাটিতে হইবে। তৎপর দশটী সমানাকৃতির বটিকা প্রস্তুত করিলেই পেশারী প্রস্তুত হইল।

ডাঃ হেয়ার প্রভৃতি কতিপয় বিশেষজ্ঞ কুইনাইন মিশ্রিত ঔষধ স্ত্রী-অঙ্গে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ডাঃ ফিল্ডিএর অভিমত এই যে প্রথম প্রথম রতি-ক্রিয়ার সময় কুইনাইন পেশারী ব্যবহার করিলে স্ত্রীর পক্ষে সত্যই খানিকটা অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

ভারতীয় যৌগিক সাধনায় শুক্রস্তম্ভনের দ্বারা বিনা-শুক্রপাতে রমণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার উপায় নির্দ্দেশ আছে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যৌগিক উপায়

এলিস বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় এই বীর্য্যস্তম্ভনের বহু সমর্থক দৃষ্ট হয়। সেখানে এই অভ্যাসকে Reservod Coitus বলা হইয়া থাকে। নিউইয়র্কের নিকটবর্ত্তী অনিডা নামক স্থানে অধিবাসিগণের মধ্যে এই অভ্যাস প্রচলিত ছিল। ডাঃ অ্যালিসষ্টকহ্যাম এই অভ্যাসের সমর্থন করিয়াছেন।

হ্যাভলক এলিস ও ডাঃ অ্যালিসষ্টকহ্যাম উভয়ে স্বীকার করিয়াছেন, এবং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই অভ্যাস অতিশয় কঠিন। ইহা অভ্যাস করিতে দীর্ঘদিন সাধনা করিতে হয়, ভারতীয় যোগিগণ দীর্ঘ দিনের সাধনায় এই যোগ অভ্যাস করিতেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে মিঃ গ্যাম্বার এ বিষয়ে যৌগিক সাধনার অনুকরণে শুধু রতি-ক্রিয়ার আসন-কৌশলের দ্বারা জন্ম-নিরোধের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যে সমস্ত বিভিন্ন কৌশলের কথা বলিয়াছেন তাহাতে শুধু গর্ভ-সঞ্চারের সম্ভাবনা কম থাকে, একেবারে তিরোহিত হয় না। অনিশ্চিত কৌশল অবলম্বন করিয়া আশঙ্কা বাড়ানোর পক্ষপাতী আমরা নহি।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত যান্ত্রিক, যৌগিক ও ঔষধিক উপায়সমূহ

সম্বন্ধে কেহই আজিও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কারণ এই সমস্ত ব্যাপারে বহু সাধনা, অসামান্য সতর্কতা ও বিরক্তিকর পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। কাজেই এ বিষয়ে একটী নিশ্চিত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা Sterilization বা বন্ধ্যাকরণ। পুরুষের শিরা কর্ত্তন ও নারীর ডিম্ববাহী নল কর্ত্তন দ্বারা উভয়কে বন্ধ্যা করা যাইতে পারে। ইহাতে নারী-পুরুষ উভয়ের রতি-শক্তি অব্যাহত থাকিবে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন হইবে না। ইহা জন্ম-নিরোধের অব্যর্থ ও নিশ্চিত উপায়। সুতরাং যাঁহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন, তাঁহারা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিলে উভয়কেই স্থায়ীভাবে বন্ধ্যা হইতে হইবে। সুতরাং এই উপায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

* * * * * *

* * * * *

* * * *
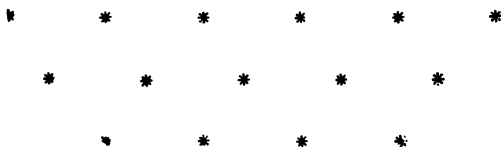
একাদশ অধ্যায়

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দুইটী দিক। একটী এই যে, আমরা আমাদের রতি-ক্রিয়া অব্যাহত রাখিব, অথচ যখন চাহিব তখনই মাত্র সন্তান হইবে, না চাহিলে সন্তান হইবে না। এক কথায় সন্তান উৎপাদন করা-না-করা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন হইবে। দ্বিতীয় দিক এই যে, আমরা যে লিঙ্গের সন্তান চাহিব সেই লিঙ্গের সন্তান হইবে, অন্যথা হইবে না। এই দুইটী ব্যাপারে সমভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে আমরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাফল্য লাভ করিলাম বলা যাইতে পারিবে।

লিঙ্গ নির্দ্ধারণ

পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়সমূহ সাফল্যের সহিত অবলম্বন করিলে আমরা আমাদের ইচ্ছামত সময়ে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিব, কিন্তু ইচ্ছামত লিঙ্গের সন্তান উৎপাদন করিতে পারিব কিরূপে ইহাই হইতেছে সমস্যা। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও বহু বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী শাস্ত্রে ঋতুর দিন হইতে গণনা করিয়া সন্তানের লিঙ্গ-নির্দ্ধারণের অনেক উপায়ের কথা শুনা যায়। একটী মত এই যে, ঋতু দর্শনের পর জোড়া দিনে পুত্র ও বেজোড় দিনে কন্যা হইয়া থাকে। অপর একটী মত এই যে, রজোদর্শনের পরবর্ত্তী যে ১৫।১৬ দিন নারীর জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত থাকে, সেই ১৫।১৬ দিনের প্রথম সপ্তাহে কন্যা ও পরবর্ত্তী সপ্তাহে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ডাঃ ডেভিডের মত এই যে, ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পর প্রথম তিন দিনে কন্যা হইবে, দ্বিতীয় সপ্তাহার্দ্ধে পুত্র-কন্যা দুই-ই হইতে পারে এবং তৎপরে পুত্র হইবে। এ সমস্ত মতই এত অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত যে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতাসহকারে কোনও কথা বলিবার উপায় নাই।

কিন্তু আমরা যতদূর অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ঋতুস্রাববন্ধের যত নিকটবর্ত্তী সময়ে গর্ভাধান হইবে, মেয়ে হইবার সম্ভাবনা তত বেশী এবং যত দূরবর্ত্তী সময়ে হইবে, ছেলে হইবার সম্ভাবনা তত বেশী। এই অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে হয় যে, আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে পুত্রকামিগণ ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পরবর্ত্তী দশ দিনের মধ্যে স্ত্রীকে বীর্য্যদান না করিয়া দশ দিনের যতদিন পর সম্ভব (অবশ্য জরায়ুমুখ খোলা থাকিতেই) স্ত্রীকে বীর্য্যদান করিবেন। ইহাতে পুত্রসন্তান জন্ম সম্বন্ধে আশা করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। পক্ষান্তরে কন্যাকামীরা উক্ত দশদিনের মধ্যেই বীর্য্যদান করিবেন।

কোনও কোনও পণ্ডিতের অভিমত এই যে, নারীর কামাধিক্যে পুত্র ও পুরুষের কামাধিক্যে কন্যা জন্মলাভ করিয়া থাকে। ইহার অর্থ বোধহয় এই যে রতি-ক্রিয়ায় স্ত্রী যদি স্বামীর আগে পুলকাবেগ লাভ করে এবং স্বামীর শুক্র যদি স্ত্রীর পুলকাবেগের পরে পতিত হয়, তবে পুত্র সন্তান হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে কন্যা হইবে। এই মতের সহিত পূর্ব্বোক্ত মতের একটু বিরোধ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ পূর্ব্বের মতে বলা হইয়াছে যে ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পরে গর্ভ হইলে কন্যা সন্তান ও ১০ দিনের পরে হইলে পুত্র হইবে। ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পরে নারীর কামভাব অত্যন্ত বেশী জাগ্রত থাকে এবং অতি সহজেই পুলকাবেগ লাভ করিয়া থাকে এবং যতই দেরী হইবে, ততই তাহার কামবেগ কমিতে থাকিবে; তখন পুরুষের পক্ষে নারীর কামবেগ জাগ্রত করিয়া তাহাকে নিজের শুক্রপাতের পূর্ব্বে পুলকাবেগ দান করা

কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কামভাবের পার্থক্য হেতু পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করা সত্য হইলে ঋতুর প্রথম দিকে পুত্রাধিক্য ও শেষ দিকে কন্যাধিক্য হইত।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এ বিষয়ে গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। জার্মান চিকিৎসাবিৎ ডাঃ সিক্সট্ এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একএক বারের রতি-ক্রিয়ায় পুরুষের এক দিকের অণ্ডকোষ হইতে মাত্র শুক্র স্খলিত হয় এবং নারীরও এক দিকের ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব অবতরণ করে। পুরুষের ডান দিকের অণ্ডকোষ হইতে শুক্র ও নারীর ডান দিকের ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নির্গত হইয়া মিশ্রিত হইলে পুত্র ও তদ্বিপরীত হইলে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। ডাঃ সিক্স্‌ট্‌ ঘোড়া-গরু প্রভৃতি প্রাণীর উপর গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ডাঃ বেলিং, ডাঃ রুলম্যান ও ডাঃ ট্রেল বিভিন্ন প্রাণীতে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ সিকৃষ্টের মতবাদের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ডাঃ ডসনের অভিমত এই যে, ভ্রূণের লিঙ্গের সহিত পুরুষের শুক্রকীটের পরিমাণ বা লিঙ্গের কোনও সংশ্রব নাই। নারীর ডিম্বের লিঙ্গ দ্বারাই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাহার মত এই যে, নারীর ডিম্বাধারদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ দিকের ডিম্বাধার হইতে যে ডিম্ব নির্গত হয়, তাহাতে পুরুষ-সন্তান ও বাম দিকেয় ডিম্বাধার হইতে যে ডিম্ব নির্গত হয়, তাহা হইতে নারী-সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

জার্মান চিকিৎসাবিৎ ডাঃ ব্লুমের মত এই যে পুরুষের শুক্রকীট হইতে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, নারীর ডিম্বের সহিত সন্তানের লিঙ্গের

কোনও সংশ্রব নাই। শুক্রকীট দুই প্রকার: পুরুষ শুক্রকীট হইতে পুরুষ ও নারী শুক্রকীট হইতে নারী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পুরুষের শুক্রকীটের মধ্যে আবার নর-শুক্রকীট অপেক্ষা নারী-শুক্রকীট অনেকখানি দুর্ব্বল ও নির্জীব। কাজেই বহিঃশক্তির সাময়িক প্রভাবের দ্বারা পুরুষের শুক্রকীট পীড়িত হইলে তদ্দারা নারী-শুক্রকীট যত শীঘ্র ও সহজে মারা যায়, নর-শুক্রকীট তত সহজে মারা যায় না। ডাঃ ব্লুম পুরুষকে অতিরিক্ত মাত্রায় মাতাল করিয়া নারী-সহবাস করাইয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে যে সন্তান হয়, তাহার সমস্তই পুরুষ সন্তান। ইহার কারণ এই যে, মদ্যপানের ফলে পুরুষের শুক্রকীটসমূহ নির্য্যাতিত হওয়ায় নারী-শুক্রকীট সমূহ মরিয়া যায়, কিন্তু নর-শুক্রকীটসমূহ তদবস্থায় নারীর ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।

ডাঃ ডাসিং ও সেণ্ট হিলেয়ার প্রভৃতি জার্ম্মান পণ্ডিতগণের মত এই যে, পিতামাতার আহার্য্যের উপর সন্তানের লিঙ্গ অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁহারা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত পিতামাতা অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করে, তাহাদের সাধারণতঃ মেয়ে-সন্তান এবং যাহারা অল্প-ভোজী ও অনাহার-ক্লিষ্ট তাহাদের পুরুষ-সন্তান হইয়া থাকে।

পিতামাতার খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণাগুণে সন্তানের লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে বলিয়া যে সমস্ত পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর অভিমত এই যে, গর্ভাধানের সময় এবং পরবর্ত্তী তিনমাস কাল ভ্রূণের কোনও নির্দ্দিষ্ট লিঙ্গ থাকে না। মাতার খাদ্যদ্রব্য, জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও চিন্তাধারার দ্বারা পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

মার্কিন ডাঃ উইলসন এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গর্ভাধানের মুহূর্তেই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সুতরাং মাতার খাদ্য, জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও চিন্তাধারা সন্তানের দৈহিক ও মানসিক দোষ-গুণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু উহার লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। বিজ্ঞান-সাধনার বর্ত্তমান প্রগতিতেও বৈজ্ঞানিকগণকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এ বিষয়কে আজ পর্য্যন্ত আয়ত্তাধীন করা সম্ভব হয় নাই। কনিংস্‌বার্গের অধ্যাপক আণ্টার বার্গার (Prof. Unterburger) বহু গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সন্তানের লিঙ্গ-নির্দ্ধারণ ব্যাপারে পিতামাতা খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া এই যে, নারীর যোনি-নিঃস্রাবের মধ্যে আলকালাইন গুণবিশিষ্ট শুক্র মিশ্রিত হইলেই পুরুষ-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সেজন্য তাঁহার মতে রতি-ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে আলকালাইন গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা ডুশ লইয়া রতি-ক্রিয়া করিলে পুরুষ-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। বার্লিনের 'কাইজার উইলিয়ম ইনষ্টিটিউট' এর 'বায়লজী'র অধ্যাপক ডাঃ গোল্ডস্মিথ্‌ কিন্তু খুব জোর গলায় বলিয়াছেন যে, পিতামাতা ভাবী সন্তানের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করিতে পারে। ডাঃ গোল্ডস্মিথের মত এই যে, পুরুষের শুক্রের মধ্যে সেক্‌স্‌ ক্রমোজম্‌ থাকে। প্রত্যেকটী শুক্র-বীজের মধ্যে চব্বিশটী করিয়া ক্রমোজম্‌ আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রত্যেক স্খালনে পুরুষের যে পরিমাণ শুক্র নিঃসৃত হয়, তাহার ঠিক অর্দ্ধেকের শুক্রবীজসমূহে কোনও ক্রমোজম থাকে না; বাকী অর্দ্ধেকের শুক্রবীজ-সমূহে উপরোক্ত হারে ক্রমোজম বিদ্যমান থাকে। ক্রমোজমবিশিষ্ট

শুক্রবীজ হইতে সন্তান উৎপাদিত হইলে পুরুষ ও ক্রমোজমহীন শুক্রবীজ হইতে নারী জন্মলাভ করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই লিঙ্গ নির্দ্ধারণ অপেক্ষা লিঙ্গ নিরূপণ করার দিকেই অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু লিঙ্গ নির্দ্ধারণ ও লিঙ্গ নিরূপণ সম্পূর্ণ পৃথক কথা। পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী পুরুষ বা নারী-সন্তান হওয়ার নাম লিঙ্গ নির্দ্ধারণ; আর প্রসবের পূর্ব্বেই সন্তান নারী হইবে কি পুরুষ হইবে, তাহা জানিতে পারার নাম লিঙ্গ নিরূপণ। লিঙ্গ-নির্দ্ধারণে যদি পিতামাতার কোনও হাতই না থাকিল, তবে শুধু লিঙ্গ নিরূপণ দ্বারা আমরা বিশেষ লাভবান হইতে পারি না।

এই সমস্ত মতবাদ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ আজিও নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হয় নাই। ডাঃ নরম্যান হেয়ার-সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সেক্সুয়্যাল নলেজ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে: "To all those who to-day wish to influence the sex of their unborn child, Science can but answer in the words of Dante: Abandone hope……"

বিজ্ঞান এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে আমরা অমন নৈরাশ্যের কোনও যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। লিঙ্গ নির্দ্ধারণের সূক্ষ্ম কারণ নির্দ্দেশ সাধারণের প্রশ্ন নহে, তাহারা চায় কার্য্যোপযোগী কোন সূত্রের আবিষ্কার। আমরা এ সম্বন্ধে প্রফেসার থুরী-(Thury) প্রবর্ত্তিত সূত্র পালন করিয়া দেখিতে পরামর্শ দিতেছি। তিনি ঋতুর

অব্যবহিত পরেই কন্যাসন্তান এবং অধিক দিন পরে পুত্রসন্তান হইবার সম্ভাবনা বেশী বলিয়া মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই মতবাদের নির্ভুলতা প্রমাণিত না হইয়া থাকিলেও ইহার সপক্ষে বহু সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে।

সুস্থ, সুগঠিত ও সদ্‌গুণাবলীবিশিষ্ট পিতামাতা দ্বারা সুস্থ, সুগঠিত ও সদ্‌গুণাবলী বিশিষ্ট সন্তান জন্মাইয়া পৃথিবীকে সুস্থ, সবল ও সৎলোকের বাসস্থানে পরিণত করা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা সফল করিবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকগণ করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কার্য্যক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ইউজিনিক মতবাদ বলা হইয়া থাকে। ইউজিনিক কার্য্যক্রমকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে :

ইউজিনিক মতবাদ

(১) প্রথমতঃ ইহার আদেশাত্মক (Positive) দিক, অর্থাৎ কি কি করিতে হইবে, সেই দিক। এই দিকে সুস্থ নরনারীর বিবাহ, যৌন সম্বন্ধের সংস্কার ইত্যাদি সাধন করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ নিষেধাত্মক (Negative) দিক, অর্থাৎ কি কি কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে, সেই দিক। এই দিকে মাতাল, রোগী, উন্মাদ প্রভৃতির বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ প্রতিকারাত্মক (Preventive) দিক। এই দিকে আমাদিগকে ইউজিনিক-পরিপন্থী রোগসমূহের প্রতিকার করিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউজিনিক মতবাদ প্রধানতঃ (Theory of Heredity) 'থিওরী অব হেরিডিটী'র উপর প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার দোষ-গুণ সন্তানের উপর বর্ত্তিয়া থাকে, ইহাই হেরিডিটী মতবাদের মূল

কথা। শুধু চরিত্রগত গুণসমূহ নহে, পরন্তু দৈহিক রোগেরও অনেকগুলি সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। পক্ষান্তরে শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-প্রভাবে ঐ সমস্ত দোষ-গুণের গতিরোধ করাও সম্ভব। এ কথাদ্বারা আমরা কোনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া লইতেছি না। পিতামাতার নিতান্ত ব্যক্তিগত দোষ-গুণের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছি—ইহাতে কোনও শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

এই উত্তরাধিকার মতবাদ (Laws of Heredity) খুব সাধারণ ও জনপ্রিয় হইলেও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারই ইহাকে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন। স্পেন্সারের অল্পদিন পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডারউইন তাঁহার উদ্বর্ত্তনবাদ দ্বারা এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্যাল্‌টন তাঁহার বিবর্ত্তনবাদ দ্বারা এবং ১৮৯৩ খৃঃ ওয়াইজম্যান তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা স্পেন্সারের মতবাদের অনেক সংস্কার সাধন করিলেও উহার মূল কথার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সমস্ত মতবাদ অনুসারেই সন্তানগণ কতকগুলি দোষগুণ পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, আর কতকগুলি শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতা হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে।

তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যক্তির দোষ-গুণের বিভেদের প্রাথমিক কারণ আজিও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। দুইটী বীজ এক শ্রেণীর হইলেই গাছ দুইটী একই রকম হইবে, একথা যেমন জোরের সহিত বলা যায় না, একই পিতামাতার সঞ্জাত দুইটী সন্তান এক রকম হইবে, ইহাও তেমনই জোরের সঙ্গে বলা যায় না। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত পার্থক্য আমরা অহরহ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নেপোলিয়নের পরিবারের কথাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক। ইতিহাস-পাঠক

সকলেই জানেন, নেপোলিয়নের জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিষ্কর্ম্মা ও আরাম-প্রিয় জীবন নেপোলিয়নের চরিত্র হইতে কত বিসদৃশ ছিল। তাঁহার ভগ্নিগণ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। সুতরাং বীজের গুণের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিলে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা আরও গভীরতর সত্য লাভের প্রয়োজন আছে। মানুষের দেহের ও মনের উপর জন্ম ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে কোনও একটি বিশিষ্ট মতবাদকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাধান্য দান করিলে উহা অতি সহজেই অনভিপ্রেত ও অকল্যাণকর কুসংস্কারে পরিণত হইতে পারে। ইউজিনিক মতবাদের নিষেধাত্মক কার্য্যক্রমের কথাই ধরা যাউক। মূর্খ, উন্মাদ, রোগী প্রভৃতিকে পিতৃত্বের অযোগ্য ঘোষণা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিলে এতদ্দ্বারা অতি সহজেই শ্রেণী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং মানব-কল্যাণেচ্ছা-প্রসূত আদর্শটী দরিদ্র-পীড়নের অত্যাচারমূলক কারণে পর্য্যবসিত হইতে পারে। সেইজন্য কোলাপুর কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ ফাড্‌কে তদীয় 'সেক্‌স্ প্রব্লেম্ ইন ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে ইউজিনিক প্রথা প্রচলনের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা ততটা উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। কারণ অতীতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মী মতবাদ শ্রেণী-প্রাধান্যের অত্যাচারের অস্ত্ররূপে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, ইউজিনিক মতবাদ খুব সাবধানতার সহিত প্রযুক্ত না হইলে ভাবীকালে বিজ্ঞানের নামে সেই অত্যাচারের পুনরনুষ্ঠান করিতে পারে। গণতন্ত্র আজিও এতটা প্রবীন ও তিক্ত হইয়া উঠে নাই,

যাহাতে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যবাদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় বর্ণাশ্রম ও আভিজাত্যবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি। দেশ, বর্ণ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নামে ইতিমধ্যেই অনেক কৌলিন্যের অনাচার ও উৎপীড়নের অনুষ্ঠান চলিতেছে। তদুপরি বিজ্ঞানের নামে আর এক শ্রেণীর দেহ-কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব-জাতিকে নিপীড়িত করিবার আমরা পক্ষপাতী নহি।

স্নুতরাং আমরা মোটামুটি নীতি হিসাবে ইউজিনিক মতবাদের পক্ষপাতী হইলেও বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের বর্ত্তমান শ্রেণী-প্রাধান্যের যুগে আমরা ইউজিনিক মতবাদকে রাষ্ট্রের সহায়তা দানের পক্ষপাতী নহি। এ বিষয়ে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের দ্বারা ব্যক্তিগত কৃষ্টি-উন্নয়ন করিলেই মানব-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অন্য দেশের কথা যাহাই হউক, ভারতবর্ষে যে জনসাধারণের মধ্যে কৃষ্টি-বিস্তারের কর্ত্তব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় সম্যকরূপে সম্পাদন করেন নাই, একথা লজ্জার সঙ্গে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের বিশ্বাস, কৃষ্টি-বিস্তারের দ্বারাই আমরা মানবের মানসিক ও দৈহিক উন্নতিবিধান করিতে পারিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

সত্যানুরাগ ও সত্য সাধনা—বিশ্ব-সংসারের বিস্তৃতি—মানব-মনের উন্মেষ—ধর্ম্মীয় মানব-বুদ্ধির মুক্তি সাধনা—অতীত ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র—কৃষ্টির আন্তর্জ্জাতিক সাধনা আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত—অতীতের প্রকৃত ধর্ম্মমত—অতীতের প্রতি আমাদের মনোভাব—যৌন-বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপযোগী মনোভাব—যৌনবোধের মহত্তর দিক—যৌন-সমস্যার জটিলতা—বিবাহে সংস্কার—প্রজননে নিরাপত্তা—গর্ভধারণে নারীর অধিকার—হিটলার-মুসোলিনীর জন্ম-বৃদ্ধিতে উৎসাহ—জন্মনিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ—ইউজেনিক মতবাদের ভবিষ্যৎ—যৌনবিকল্প সমস্যার সমাধান—বিচারকের দায়িত্ব—যৌন-ব্যাধির প্রতীকার—আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্টির সূচনা—সত্য সাধনার পথ অনন্ত—অসীম—তরুণদের কর্ত্তব্য—উপসংহার।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যৌন-বিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীকে আমার জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে যথোপযুক্তরূপে আমার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা আমি করিয়াছি। আমি জানি এবং স্বীকার করিতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করা উচিত নহে যে, অনেক বিষয় আলোচনার বাকী রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিব যে, আমার বক্তব্যে কোনও আন্তরিকতার অভাব নাই, এবং যাহা যাহা আমি বলিয়াছি, সে সমস্ত বিষয়কে আমার জাতির কল্যাণের দৃষ্টি-কোণ্ হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া বলিবারই চেষ্টা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমি যৌন-জ্ঞানের জীবনেতিহাস ও এই বিজ্ঞান-সাধনা-লব্ধ জ্ঞান-সমষ্টি ও উহাদের ভাবী গতি-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিব।

আমি উপক্রমণিকা অধ্যায়ে যৌন-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা

করিয়াছি। ঐ অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন মতবাদের উন্নতি ও পরিণতির সমালোচনা করিয়াছি। এই বিজ্ঞান-শাখা-কেন্দ্রে মানব-মনকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং হইতেছে, এখানে আমি সংক্ষেপে সাধারণভাবে সে সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব। আমি উপক্রমণিকার উপসংহারে বলিয়াছি যে, সমস্ত বিজ্ঞান-সাধনা-ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও সংস্কার-মুক্ত সত্যানুসন্ধিৎসাকেই আমাদের একমাত্র কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নিজে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসী হইয়াও এই বিজ্ঞানালোচনায় আমি সকল প্রকার ধর্ম্মীয় সংস্কার-মুক্ত হইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। এবং এই আলোচনায় বিশ্বের মানুষকে কেবলমাত্র মানুষরূপেই দর্শন করিয়াছি। কি তাহার ধর্ম্ম, কি তাহার মতবাদ, কি তাহার জাতি, কোথায় তাহার অধিবাস, কেমন তাহার বর্ণ সে বিচার আমি করি নাই। প্রকৃতি-দত্ত তাহার মানবতা ছাড়া তাহার জাগতিক কোনও দোষ-গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত হইতে দেই নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ আস্থা বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের প্রতিও ভক্তি আমার কাহারও চেয়ে কম নহে। কিন্তু সমস্ত ভাববাদীকেই তাঁহাদের যুগধর্ম্ম ও পারিপার্শ্বিকতার মাপকাঠি দ্বারা ওজন করিয়াছি—তাঁহাদের কথা ও কাজের শাশ্বততার দ্বারা করি নাই। আমি বিশ্বাস করি, অতীতের ভাববাদিগণের সত্য-সাধনার আন্তরিকতাই অতীত ও বর্ত্তমানের যোগ-সূত্র—তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদের নির্ভুলতা নহে। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, সত্যানুসন্ধিৎসাই সত্যসাধনার চরম সাফল্য—সত্যপ্রাপ্তি নহে।

সত্যানুরাগ ও সত্যসাধনা

সত্য-দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত হইতেই হইবে, কারণ সত্যদর্শন-ক্ষেত্র যে বিশ্ব-সংসার, তাহা অনুদিন বিস্তৃত ও প্রশস্ততর হইয়া পড়িতেছে।

বিশ্ব-সংসারের বিস্তৃতি

অতীতের মানুষ তাহার দেশের বিস্তৃতি, তাহার পর্ব্বতের উচ্চতা, আকাশের বিশালতা, তারকারাজির সংখ্যাহীনতা দর্শনে যেমন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত, বর্ত্তমান সৌরজগতের বিস্তৃততর বিশালতা আমাদের বিজ্ঞান-সম্প্রসারিত দৃষ্টিকে তদপেক্ষা কোনও অংশে কম স্তম্ভিত করিতেছে না।

আমরা প্রজনন অধ্যায়ে জীবন-রহস্য আলোচনাব্যপদেশে মানব-জীবনের অভিব্যক্তির রহস্যোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের

মানব-মনের উন্মেষ

এই প্রচেষ্টা কতই না সীমাবদ্ধ! কত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবনী-শক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল কে তাহার নির্ণয় করিবে? প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক সংঘাতের মধ্যে মানব-জীবন যে সংগ্রাম চালাইয়া নিজেকে বাঁচাইয়া আসিতেছে, এ সংগ্রাম কোন্ অনাদি যুগান্তরে আরব্ধ হইয়াছিল, কে তাহা বলিতে পারে? মানব-জীবনে যেদিন মনের উন্মেষ হইয়াছে, যেদিন হইতে মানুষ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, জীবনের শৈশব তাহার কত যুগ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? জীব-বৈজ্ঞানিক মিঃ জি, জি, হার্ট বলিয়াছেন, মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পূর্ব্বে মানব-জীবনকে বিশলক্ষ বৎসর নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

তারপর মানুষ যেদিন চিন্তা করিতে শিখিল, যেদিন তাহার জীবন-উষায় জ্ঞানের আলোকচ্ছটা নিপতিত হইল, সেদিন সে চরম বিস্ময়ে

ধর্ম্মীয় মনোভাবের উন্মেষ

প্রকৃতির শক্তি-কেন্দ্রসমূহকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। মানব-মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভীতি ও বিস্ময় তাহার চারিদিকে নিত্যনূতন আরাধ্য আবিষ্কার করিতে লাগিল। মানব-মনোবিকাশের এই অধ্যায়ের ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই সংগ্রামপূর্ণ। ধর্ম্ম-মতই ছিল এই সময়কার মানব-মনের নিয়ন্তা, তাহার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মের গতিকেন্দ্র।

এইভাবে যুগের পর যুগ ধরিয়া দেবতা, উপ-দেবতা ও ধর্ম্মমতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে এমন একদিন আসিল, যেদিন কি মতবাদ কি কর্ম্মপন্থা উভয় দিক দিয়াই তাহাদের মধ্যে সংঘাত ও বিরোধ বাধিয়া গেল। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন দেবতাদের সকলেই আরাধ্য হইতে পারে না এবং পরস্পর-বিরোধী মতবাদসমূহের সবগুলিই ভগবানের নির্দ্দেশ, সুতরাং সত্য, হইতে পারে না। মানব-মন যেদিন এই সমস্যার সম্মুখীন হইল, সেদিন মানবের প্রজ্ঞা বন্ধন-মুক্ত হইল। সে ধীরে ধীরে অতীত মত-বাদের স্নেহ-বন্ধন হইতে শ্রদ্ধাসহকারে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। সে নিজের চলচ্ছক্তিতে আস্থালাভ করিয়া প্রাচীন মতবাদের সাবধানী স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার বজ্র আটুনী আলিঙ্গন-পাশ হইতে ধীরে ধীরে নিজেকে বিযুক্ত করিল। মানবের বুদ্ধির মুক্তি সাধনার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মানব-বুদ্ধির মুক্তি-সাধনা

বর্ত্তমানের জন্য অতীত যতই ঘৃণ্য, হেয় ও পরিত্যাজ্য হউক, অতীতের জন্য উহাই ছিল পরম আবশ্যক। অতীতের ভিত্তিভূমির উপর বর্ত্তমানের সৌধ রচিত। কোন যুগের জ্ঞান-সাধনাই অতীত হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত ও

অতীত ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র

স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং নূতনকে আমরা গ্রহণ করি পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করি বলিয়া নহে, পরন্তু নূতন পুরাতনেরই সন্তান বলিয়া। ফলতঃ যুগ-যুগান্তরের মানুষের মধ্যে যেমন একটা রক্তের যোগ-সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, যুগ-যুগান্তরের জ্ঞান-সাধনার মধ্যেও তেমনই একটা ধারা-বাহিকতার যোগ-সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিভিন্ন যুগের জ্ঞান-সাধনার মধ্যে যেমন একটা ধারাবাহিকতার যোগ-সূত্র রহিয়াছে, একই যুগের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান-সাধনার মধ্যেও তেমনই একটা পারস্পরিকতার যোগসূত্র বিদ্যমান আছে। বিরাট সৌধের প্রস্তর খণ্ডসমূহকে পৃথক পৃথক করিয়া ফেলিলে যেমন সৌধের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই বিভিন্ন জ্ঞান-সাধনাকে পৃথক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ জ্ঞান করিলে সভ্যতা-সাধনার কোনও অর্থ থাকে না।

আমার দেশবাসীর নিকট বিশেষ করিয়া আমার বক্তব্য এই যে, দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সত্যদর্শন না করিলে এবং কৃষ্টি-সাধনাকে আন্তর্জ্জাতিক সাধনারূপে গ্রহণ না করিলে আমাদের সাধনা কদাচ সাফল্য লাভ করিবে না। বিশেষতঃ স্থানিক দূরত্ব যেভাবে দ্রুত কমিয়া আসিতেছে, জাতি-গত বৈষম্য যেভাবে দূরীভূত হইতেছে, বর্ণ-গত বিরোধ যেভাবে মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিকতাকে আমাদের সকল সাধনার ভিত্তিভূমি না করিয়া উপায়ান্তর নাই। পাঠকগণের কাছে আমার বক্তব্য, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বিচার-বিবেচনা যেন আমাদের কৃষ্টি-সাধনাকে সংকীর্ণ, সুতরাং ব্যাহত, করিতে না পারে।

কৃষ্টির আন্তর্জ্জাতিক সাধনা

তবু বিশ্বাস ছাড়িয়া জ্ঞানকে আমাদের সত্য-সাধনার কষ্টি-পাথর করিয়া

আমরা স্রষ্টায় বিশ্বাস হারাই নাই, হারাইতে পারি না। কারণ সত্যিকার জ্ঞান, প্রবুদ্ধ প্রজ্ঞা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিতে পারে না; করিলে সত্যের কোনও অর্থ থাকে না। অতীতের স্বল্প-জ্ঞানী মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্যে বিস্মিত হইত সত্য, কিন্তু আমাদের বিস্ময়ও ত কমে নাই। সুতরাং ভক্তিও কমিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির রহস্য আমাদের জ্ঞানের সন্ধানী আলোর কাছে যতটা ধরা দিয়াছে, অতীতের মানুষের কাছে ততটা ধরা দেয় নাই। অতীতের মানবের বিশ্বের চেয়ে আমাদের বিশ্ব অনেক বড় হইয়াছে; অতএব আমাদের বিস্ময়, সুতরাং ভক্তিও, অনেক বাড়িয়াছে। স্রষ্টার লীলা-বৈচিত্র্যের এমন বিপুলতা, তাঁহার শক্তি-প্রাচুর্য্যের এমন বিরাটত্ব, ভক্তি-সর্ব্বস্ব অতীতের মানবের কাছে এমন করিয়া ধরা দেয় নাই। এ-বিষয়ে গ্রন্থান্তরে আরও ব্যপকভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার রহিল।

আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত

তথাপি, অতীতের ভাব-দারিদ্র্যকে আমরা বিদ্রূপ করিতে পারি না। কারণ সত্যকার জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা জানেন, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের শেষ কথাও জ্ঞানের চরম কথা নহে, চরম কথা হইতে পারে না। কারণ চরম সত্য বলিয়া কিছুই নাই। থাকিলে স্রষ্টার শক্তি-মাহাত্ম্যের মর্য্যাদা হানি হইত। সুতরাং জ্ঞান-প্রমত্ততায় আমরা আজ যে-সব কথাকে বিজ্ঞানের চরম বাণী বলিয়া গৌরব করিতেছি এবং নিজেদের সাধনা-সাফল্যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছি, আমাদেরই উত্তর পুরুষদের কাছে দু'দিন পরে হয়ত সেই সব কথাই বিদ্রূপাত্মক কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু

অতীতের প্রতি আমাদের মনোভাব

তবু ইহাতে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ সত্য ও জ্ঞান সাধনার রীতিই এই।

কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমি বলিতে চাই যে সর্ব্ব-শ্রেণীর সকল শাখার জ্ঞান-সাধনায় যে কথা সত্য, যৌন বিজ্ঞান-সাধনায়ও অবিকল সেই কথাই সত্য। চরম সত্য বলিয়া এখানেও কোন কথা নাই। তবু অন্যান্য জ্ঞান-সাধনার ন্যায় এখানেও ধর্ম্মই এযাবৎ কাল শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছে। উপক্রমণিকা অধ্যায়ে আমি যৌন-বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশের আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সে ইতিহাস আলোচনায় পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অন্যান্য বিজ্ঞান আলোচনায় নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টি যতটা প্রয়োজন, যৌন-বিজ্ঞান আলোচনায় সত্যদৃষ্টির প্রয়োজন তাহাপেক্ষা কম ত নহেই, বরঞ্চ অনেক বেশী। কারণ কুসংস্কার, স্থিতি-স্থাপকতা পরিবর্ত্তন-বিরোধিতা ও গোড়ামী যৌন-বিজ্ঞান আলোচনায় আমাদের দৃষ্টিকে যতটা বিভ্রান্ত করিয়াছে, অন্যান্য বিজ্ঞান-শাখায় ততটা পারে নাই। সকল জাতি ও সকল দেশের মানুষের এই সাধারণ দুর্ব্বলতা দর্শনেই ডাঃ ফোরেল্ বিরক্তি-ভরে বলিয়াছেন: "I am convinced that it is only by the introduction of the scientific spirit, of an inductive and philosophical manner of thinking, into school and among masses, that we shall be able to contend efficaciously with the routine and parrot-like repetation which are rooted in the worship of authoritative doctrines

যৌন-বিজ্ঞান অধ্যয়নে উপযোগী মনোভাব

and prejadices based on the sanctity of what is old." অর্থাৎ পুরাতনের প্রতি অহেতুক ভক্তি আমাদের বিচার-শক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে এমন শোচনীয়ভাবে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিদ্যালয়সমূহে এবং জনসাধারণে্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দার্শনিক চিন্তাশীলতার প্রবর্ত্তনের দ্বারাই আমরা জন-সমাজের সম্মোহিত বিবেক-বুদ্ধিকে সত্যদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি।

যৌন-বোধের মহত্তর দিক

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যৌন-বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের সমাজে বরাবর নিষিদ্ধ হইয়া আছে। যৌন-ব্যাপারের অন্ধকারদিকটাকে কল্পনার সাহায্যে অধিকতর অন্ধকার করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। ভণ্ডামী, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি যৌন-বৃত্তির কদর্য্য লক্ষণসমূহকেই যৌন-মনোবৃত্তির প্রধান বিশেষত্ব আখ্যা দিয়া সমস্ত যৌন-বৃত্তিটাকেই নিন্দা করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এ-বিষয়ে মানুষ অপেক্ষাকৃত উদার দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। যৌন-বৃত্তির যে একটা মহত্তর দিক আছে, এ কথা যেন মানুষ এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই সত্য জ্ঞান। মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সৌরজগতের যে সম্বন্ধ, যৌন-বোধের সহিত প্রাণী-জগতের সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। সুনিয়ন্ত্রিত যৌন-বোধ একটা বিরাট স্থষ্টি-শক্তি ছাড়া আর কিছু নহে। সমস্ত স্থষ্টি-রহস্যের ইহাই মূল কারণ। আমাদের সমস্ত ভাব ও কর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি আমাদের যৌন-বোধ, এ কথা অস্বীকার করা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নহে। আমাদের যৌবনের সুখ-স্বপ্ন, আমাদের পিতৃস্নেহ, অবলা প্রাণীর প্রতি আমাদের করুণা, দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি সমস্তের উৎস এই যৌন-বোধ। বিপন্ন যুবতীকে উদ্ধার করিবার জন্য

তরুণ যুবক যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মত্যাগের অন্ধ প্রেরণা অনুভব করে, অথবা তরুণের বিচার-বিবেচনাহীন সাহসিকতার প্রতি তরুণী যে অন্ধ, সশ্রদ্ধ ও দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে, এ সকলই যৌন-বোধ-সঞ্জাত। ফলতঃ স্বার্থপর মানুষকে আত্মত্যাগের ও পরোপকারিতার সর্ব্বপ্রথম অনুপ্রেরণা দেয় এই যৌন-বোধ। সুতরাং যৌন-বোধ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বৃত্তি।

অতএব যৌন-সমস্যা মানুষের জীবন-সমস্যার ন্যায়ই জটিল সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান ত দূরের কথা, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলেও আমাদিগকে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র, হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে।

যৌন-সমস্যার জটিলতা

শুধু মনোবিজ্ঞান নহে, পরন্তু বিজ্ঞান, শরীর-তত্ত্ব, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব ও রসায়ন-শাস্ত্রের সহিত যৌন-বিজ্ঞানের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুস্তক রচনায় আমাকে এই সমস্ত বিজ্ঞান-শাখার বহু পুস্তক আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। আমি যে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা নহে। যৌন-বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্বকে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার জন্য আমি একটীর পর আরেকটী বিজ্ঞান-শাখা অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি। সত্যদর্শনের কৌতূহল আমার অজ্ঞাতে, এমন কি অনেক সময় আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আমাকে পুস্তক হইতে পুস্তকান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ও বিজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানান্তরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞান আমার পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করিলাম। আমার জ্ঞান-সূত্রসমূহ নির্ভুল হইয়াছে কি না সে

বিচারও পাঠকগণ করিবেন এবং আমাকে তাহা জানাইবেন ইহাই আমার বিশ্বাস।

বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা যৌন-ব্যাপারে সত্যই কি আমরা অনেক লাভবান হই নাই? এতদিন যাহা কেবল দৈব ও ভবিষ্যতের নির্দ্ধার্য্য বিষয় ছিল, তাহা কি বহুলাংশে মানবের শাসন ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আনীত হয় নাই? দু'একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

বিবাহে সংস্কার

বিবাহের কথাই বলা যাউক। বর্ত্তমান যুগে দাম্পত্য-সুখের জন্য কেবলমাত্র ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করিয়া দম্পতির জীবনকে সুখময় করিবার অনেক চেষ্টা-চরিত্র হইতেছে; নারীর অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে স্বীকৃত হইতেছে। নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা অন্ততঃ নীতি হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। পুরুষ-প্রাধান্যের প্রাচীন মতবাদ ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইতেছে। ঐকিক বিবাহই যে শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম বিবাহ-প্রণালী, এই মতবাদও ক্রমে সর্ব্বত্র গৃহীত হইতেছে। বিধবাদের বিবাহ করিবার অধিকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধ ও অধিকারকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল-মুক্ত করা হইতেছে। বস্তুতঃ যৌন-অংশীদার নির্ব্বাচনে মানুষকে আরও অধিক স্বাধীনতা দান করিতে হইবে—এক্ষেত্রে দেশ, বর্ণ, জাতীয়তা, এমনকি ধর্ম্ম-মত প্রভৃতি সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দম্পতির একে অন্যকে সুখী ও পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে উভয়কে যৌন-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও শিক্ষিত হইতে হইবে। শৈশব-ও বাল্য-বিবাহ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দম্পতিকে সকল প্রকারে পরস্পরের উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হইবে। দম্পতির দৈহিক ও মানসিক কল্যাণ ও তৃপ্তিই যৌন-মিলনের একমাত্র মাপকাঠি হইবে। বিবাহ-জীবনকে সকল প্রকারে সুখী, তৃপ্ত, কল্যাণপ্রদ করিয়াই বেশ্যা-প্রথা, যৌন-বিকল্প ও যৌন-ব্যাধি প্রভৃতি সামাজিক অনাচার সমূহকে দূরীভূত করিতে হইবে। অর্থ-সম্পদের বাহুল্যই সভ্যতার সৃষ্টি হইতে যৌন-জীবনে অনাচারের প্রবর্ত্তন করিয়া মানবতা বিকাশের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। বহু-পত্নীত্ব, উপপত্নীত্ব, বেশ্যা-প্রথা প্রভৃতি সকল প্রকার নারী-নির্য্যাতনের কারণ ধন-সম্পদের বাহুল্য। ধন-সাম্য-বিধানের দ্বারা মানবতাকে নিশ্চিত অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রজনন-বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গর্ভধারণ ও জন্ম-দানকে নারীর অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে গণ্য করা হইত। সুতরাং ঐ কার্য্যে তাহাকে যে সমস্ত কষ্টভোগ করিতে হইত, তাহা একরূপ অনিবার্য্য প্রকৃতির বিধান বলিয়াই গণ্য হইত। ফলে প্রসব-কার্য্যে নারীর দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমাদের দেশে আজিও প্রসূতি-মৃত্যুর হার দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমি যথাস্থানে এই সমস্ত শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি। বিজ্ঞান প্রসূতির অনেক কল্যাণ করিতেছে; বহু দেশে প্রসূতির দুঃখ-দুর্দ্দশার অনেকটা লাঘব করিবার চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যায়, অচিরকাল মধ্যেই প্রসবকার্য্য নিরাপদ স্বাভাবিক কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে। আমি যথাস্থানে এ সম্বন্ধে উপায় আলোচনা করিয়াছি। এই স্থানে আমাদের দেশবাসীর প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে হইলে

প্রজননে নিরাপত্তা

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রসূতিগণকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব বিরাট ও কর্ত্তব্য মহান। আমি আশা করি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিরাট দায়িত্ব ও মহান কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবে না।

গর্ভ-প্রকরণ, গর্ভধারণ ও প্রসব-কার্য্যের সমস্ত আবশ্যক জ্ঞাতব্য নারীকে শিক্ষা দিতে হইবে। সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার পূর্ব্বে নারীকে শিখিতে হইবে, কেন, কি ভাবে গর্ভোৎপাদন হয় এবং কি ভাবে নিজের ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের নিরাপত্তা সহকারে প্রসবকার্য্য সমাধা হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। বিবাহ ব্যাপারে যেমন নারীর স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, বিবাহের পরও সন্তান গর্ভে ধারণ সম্বন্ধেও তাহার সেইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। গর্ভধারণ করিবে কিনা, করিলে কখন করিবে, কি সন্তান ধারণ করিবে, প্রভৃতি সকল ব্যাপারে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই একমাত্র নিয়ন্তা হইবে। সুতরাং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা হইবে কি না, বর্ত্তমান যুগে প্রশ্ন তাহা নহে; কি উপায়ে সুন্দররূপে ও সফলতার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে, প্রশ্ন তাহাই। গর্ভধারণ ব্যাপারে নারীকে স্বাধীনতা দান করিলে নারীরা আর গর্ভধারণ করিতে চাহিবে না, সুতরাং প্রজনন-কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে, বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ তাঁহারা নারী-পুরুষের সৃষ্টি-বাসনার তীব্রতার প্রতি সম্যক দৃষ্টি-সম্পন্ন নহেন। তাহা ছাড়া, পৃথিবীতে যে লোক-সংখ্যাধিক্য ঘটিতেছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে লোকসংখ্যাধিক্যের ফলে যে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়িয়া

গর্ভধারণে নারীর অধিকার

যাইতেছে, এই মতবাদও ত উপেক্ষণীয় নহে। রোগের পাত্র ও মহামারীর খোরাক যোগাইবার জন্যও যেমন মানুষের জন্মদান করিয়া লাভ নাই, তেমনি কামানের গোলা-বারুদরূপেও তাহাদের জন্মদান করিয়া লাভ নাই। শুধু লাভ নাই নহে—পাপ!

জার্ম্মানীতে হিট্‌লার ও ইতালীতে মুসোলিনী তথাকার যুবক-যুবতীকে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়াইতেছেন—সন্তানোৎপাদনের জন্য। কারণ সাম্রাজ্য বিস্তারে কামানের গোলাবারুদরূপে তাঁহাদের আরও মানুষের দরকার, উপনিবেশ বিস্তারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের যোগ্য আরও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রয়োজন। সুতরাং ভাবী সভ্যতা, বা ভবিষ্যৎ মানব-শিশু, কাহারও পক্ষে হিট্‌লার-মুসোলিনীর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছুই নাই। যুদ্ধ বর্ত্তমান সভ্যতার অভিশাপ বিশেষ। ধর্ম্ম, জাতীয়তা, রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা প্রভৃতি বড় বড় বুলির জোরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মানব-সন্তানকে বলি দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত মানব-সন্তানকে কি বৃহত্তর ও মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইত না? কিন্তু বর্ত্তমান যুগের স্বৈরাচারী অতীতের স্বৈরাচারী অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নততর মনোবৃত্তিসম্পন্ন নহেন। প্রাচীন যুগের আলেকজাণ্ডার, মধ্য যুগের নেপোলিয়ান ও আধুনিক যুগের হিট্‌লার-মুসোলিনীর মনোবৃত্তিতে বাস্তবিক কোনও পার্থক্য নাই। ইঁহাদের স্বৈর-মনোভাব মূলতঃ এক। ইঁহারা মানব-সন্তানকে নিজেদের অভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অস্ত্র ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কলেরা বসন্তের খোরাকরূপে এবং ইউরোপে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের গোলাবারুদরূপে

হিট্‌লার-মুসোলিনীর জন্মবৃদ্ধিতে উৎসাহ

প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মানব-শিশুর জন্মদান করিয়া সভ্যতা ও মানবতার কি কল্যাণ সাধিত হইতেছে? এই অবস্থায় জননী, প্রসূতি ও মাতৃ-জাতি যদি সন্তান ধারণে অসম্মতি-জ্ঞাপন করেনই, তবে তাহা কি অন্যায় হইবে?

ইচ্ছা-মত নারী-পুরুষ-সন্তান জন্মাইবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সম্যক সফল না হইলেও এ বিষয়ে বিজ্ঞান-সাধনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। আমরা আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে আমরা ইচ্ছা ও প্রয়োজন-মত পুত্র ও কন্যার জন্মদান করিতে পারিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পুত্র ও কন্যা-সন্তানের প্রতি আমাদের ব্যবহার ও মনোভাবের সাম্য সাধিত হওয়া প্রয়োজন। পুত্র ও কন্যার প্রতি আমাদের দেশবাসীর মনোভাব-বৈষম্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অত্যাচারমূলক। এখানে পণ-প্রথা আবার পুত্র-কন্যার আর্থিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া এই জটীল বিষয়টীকে অধিকতর জটীল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিষময় কুপ্রথার ফলে বহু "স্নেহলতা" অগ্নিযোগে আত্ম-হত্যা করিয়া ভারতীয় নারীর দুরবস্থার কথা চীৎকার করিয়া জগৎ-বাসীকে জ্ঞাপন করিতেছে। এই শোচনীয় কুপ্রথা দূরীকরণের জন্য ভারতবর্ষে সহস্র মহাত্মা গান্ধীর প্রয়োজন।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ

ইউজেনিক দ্বারা ভাবী মানবজাতিকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ব্যাধি-মুক্ত করিবার সম্ভাব্যতাতে আমি বিশ্বাসবান। এ বিষয়ে আমি যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, বিজ্ঞান-সাধনার দ্বারা মানুষের জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অধিকতর সাফল্যের সহিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ

ইউজেনিক মতবাদের ভবিষ্যৎ

করিতে পারিবে। বিকৃত-দেহ, বিকৃত-মস্তিষ্ক ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের দ্বারা সন্তান জন্মাইয়া এই দুঃখ-ও সংগ্রামপূর্ণ বিশ্ব-জগতে রোগী ও দুঃখীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। আমি আশা করি, শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই দায়িত্ব-ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উন্মেষ হইবে। এই ব্যাপারে আভিজাত্য, বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেণী-প্রাধান্য যাহাতে মানবতাকে কলুষিত করিতে না পারে, সেদিকে ভাবী মানব সম্পূর্ণ সচেতন হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অনাগত শিশুর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য-বোধ আরও তীব্র হওয়া প্রয়োজন। অনভিপ্রেত সন্তান-সন্ততি অনিচ্ছুক পিতামাতার দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, এই অবস্থাকে কিছুতেই স্থায়ী হইতে দেওয়া উচিত নহে। পিতামাতার অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও ইচ্ছার উপরই সন্তান-জন্ম নির্ভর করিবে, বিজ্ঞান-সাধনার দ্বারা এই ব্যবস্থাকে সাফল্যের সহিত প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

যৌন-বিকল্প ও যৌন-বৈপরীত্যের ন্যায় জটীল সমস্যাকে কি ভাবে বিচার করিতে হইবে, সেকথা আমি যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

যৌনবিকল্প-সমস্যার সমাধান

মানুষের এই সমস্ত দুর্ব্বলতাকে নিষ্ঠুরভাবে শাসন ও নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতন করিয়া লাভ নাই। একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সমস্তই মানবের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা। এই সমস্ত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা মৌখিক নিষ্ঠুরতার দ্বারা দূর করা যাইবে না। সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করিয়া সহৃদয় প্রতীকার-ব্যবস্থা দ্বারা ঐ সমস্ত কু-অভ্যাসের সংস্কার সাধন করিতে হইবে। পাপের প্রতি নিষ্ঠুর কটূক্তি করিয়া বা উহাকে গোপন করিয়া

পাপ দূর করা কদাচ সম্ভব হয় নাই। সহানুভূতির সঙ্গে উহার মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া উহার প্রতিকার-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিতে হইবে।

আমি এই সমস্ত যৌন-বিকল্পের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। কুসংসর্গ এই দোষের বহু কারণের একটী মাত্র। সুতরাং সমস্ত পাপের একটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; তরুণদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সমস্ত পাপ-কর্ম্মের মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কারণ নির্দ্ধারণ ব্যতীত কোনও পাপের প্রতিকার-সাধন সম্ভব নহে। প্রাচীন কালে অপরাধীকে কঠোর হস্তে দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল; কি অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ মানসিক পরিস্থিতিতে অপরাধী অপরাধ করিয়াছে, বিচারকের পক্ষে তাহার বিচার করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সেকালে বিচারকের কাজ অতীব সহজ ছিল। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিচারের মানদণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিচার এখন অন্ধ নহে, বিচারক এখন বিবেচনাহীন নহেন, ন্যায়ের দণ্ড এখন শুধু জল্লাদের অস্ত্র নহে। বর্ত্তমান যুগের বিচারকের দায়িত্ব অনেক বেশী। তিনি এখন শুধু শাসক নহেন, তিনি শিক্ষকও বটেন, সংস্কারকও বটেন। বর্ত্তমান যুগে কোনও অপরাধীকে শাস্তি দিতে হইলে সে অপরাধের কার্য্য করিয়াছে, ইহা জানাই যথেষ্ট জানা নহে। সে কি অবস্থায় অপরাধ করিয়াছে, সে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় অপরাধ করিয়াছে কি না, তাহাও জানিতে হইবে। আর শুধু শাস্তি দিলেই চলিবে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে সে তেমন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক বা বাধ্য না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিচারকের দায়িত্ব সম্পাদিত

বিচারকের দায়িত্ব

হইবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, কুপ্রথা, পারিপার্শ্বিক দুর্নীতি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংসর্গ, মদ্য, ব্যাধি, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, দৃষ্টান্ত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি অসংখ্য কারণে মানুষ অপরাধ করিয়া থাকে। সুতরাং এক কথায় কাহাকেও কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফেলা সুবিচারকের কর্ত্তব্য নহে। মনোবিজ্ঞান, মনোবিধান, মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিজ্ঞান সাধনা দ্বারা আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ অপরাধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। এই সমস্ত বিজ্ঞান-শাখা যৌন-অপরাধেরও কারণ অনুসন্ধান করিতেছে। আশা করা যায়, এমন একদিন আসিবে, যেদিন আমাদের সমস্ত যৌন-অপরাধের কারণ নির্দ্ধারিত ও প্রতীকারোপায় উদ্ভাবিত হইবে। তৎপূর্ব্বে যৌন-অপরাধের প্রতি আমাদের মনোভাব ও অপরাধীর প্রতি আমাদের কঠোরতার সংস্কার করিতে হইবে। শিক্ষাহীন দরিদ্রের পারিবারিক জীবনের বীভৎসতা, শিশু-মাতার দুরবস্থা, স্বামী-পরিত্যক্তা হতভাগিনীর অপরাধ, উপপত্নীর নীচ-মনোবৃত্তি, যৌন-বিকল্পীর উন্মত্ততা ও বেশ্যা-মনোবৃত্তির জঘন্যতাকে বিদ্রূপ করিয়া লাভ নাই। অজ্ঞানকে উপহাস করা জ্ঞানীর কাজ নহে। জ্ঞানীর কর্ত্তব্য অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে জ্ঞানদানের দ্বারা সৎপথে আনয়ন করা, শিক্ষার আলোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত করা। এইখানেই জ্ঞানের সার্থকতা।

যৌন-ব্যাধি আমাদের জন-শক্তিকে অনুদিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের সহানুভূতিহীন নির্দ্দয় কঠোর শাসনের ভয়ে দুর্ব্বল অপরাধী প্রাণ খুলিয়া নিজের হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাই সে সমাজ-পরিচালকদের অজ্ঞাতে

যৌন-ব্যাধির প্রতিকার

সংগোপনে অপরাধ করিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অপরাধ ও ব্যাধি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। লোক-লজ্জা ও শাসনের ভয়ে ব্যাধিগ্রস্তরা নিজেদের রোগের সুচিকিৎসা করাইতেছে না; পাপ-ব্যবসায়ী হাতুড়িয়াদের হস্তেই নিজেদের জীবন-মরণ সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। অথচ এই সমস্ত যৌন-ব্যাধি বিস্তৃতি, সংক্রামকতা ও ভয়াবহতায় কলেরা, বসন্তের চেয়ে কম মারাত্মক নহে। সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ গবেষণা দ্বারা সমস্ত রোগীর বিশ্বাস অর্জ্জন না করা, পর্য্যন্ত এই সমস্ত ব্যাধির কারণ নির্দ্ধারিত ও প্রতিকারোপায় আবিষ্কৃত হইবে না।

পৃথিবীর বয়সের তুলনায় সভ্যতার বয়স আর কয় দিন? কিন্তু ইহারই মধ্যে সভ্যতা মানবতাকে যথেষ্ট দান করিয়াছে। বিজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানের পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন বর্ত্তমান যুগের একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। এই মিলনের ফলে মানবতার অভূতপূর্ব্ব কল্যাণ হইবে, ইহা নিশ্চিত। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন বর্ণের নর-নারীর মিলন বর্ত্তমান সভ্যতার দান। এই মিলনে মানব-সমাজে অভিনব কল্যাণ-প্রসূ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, দৈহিক বা মানসিক, ঐহিক বা পারত্রিক কোনও সাধনাই আজ জাতি বা দেশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না। একই সঙ্ঘবদ্ধ পরিবারের মত সমস্ত জগতের মনীষিগণ আজ সমবেতভাবে সকল প্রকার সাধনায় একে অন্যের সাহায্য গ্রহণ ও প্রদান করিতেছেন। ইহাকে আমি আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্টির সূচনারূপে অভিনন্দিত করিতেছি।

আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্টির সূচনা

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতি হিসাবে ভারতবাসী আমরা বিশ্বের সাধনায় পশ্চাদপদ হইয়া পড়িয়া আছি, ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই। কারণ ইহা সভ্যতা-সাধনার দোষ নহে, ইহা সাধনা-প্রণালীর দোষ; ইহা বিশ্ব-পরিবারের লোক-বিশেষের অজ্ঞতা মাত্র। ইহা দ্বারা গোটা সভ্যতার কোনও ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু সভ্যতার এই কলঙ্ক স্খালন করিয়া উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে। বর্ত্তমান বৈশ্য-সভ্যতার নগরসমূহে নয়নাভিরাম হর্ম্ম্যরাজির পশ্চাতে কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর কুটীরসমূহের ন্যায় চরম সুসভ্য জাতির প্রতিবেশীরূপে চরম অসভ্য জাতির অবস্থিতি বর্ত্তমান সভ্যতার বিপুল কলঙ্ক, লজ্জাস্কর অপূর্ণতা, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন না, যাঁহারা সভ্যতার উদ্ভাবয়িতা ও আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া সভ্যতায় জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব বা বর্ণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবেন, তাঁহারা সভ্যতার শত্রু, মানবতার বিদ্রোহী।

মানবের কৃষ্টি, সভ্যতার সাধনা জ্ঞানমার্গী; সে সত্যের সন্ধানে সাধনা-পথে কেবল সম্মুখে অগ্রসর হইবে। যুগ-পরিবর্ত্তনের সীমান্ত রেখায় দাঁড়াইয়া সাধক তাহার সম্মুখের পথই চিন্তা করিবে; পথ শেষ হইয়াছে বলিয়া সে পশ্চাদগমন করিবে না। তাহা সে যেদিন করিবে, সেদিন হইতে আত্মার মহিমা সে হারাইবে, স্রষ্টাকে সে অস্বীকার করিবে। মানুষের জ্ঞান-মার্গ, সুতরাং তাহারা সাধনা, বৃত্তাকারে আবর্ত্তন করিবে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা স্রষ্টার বৈচিত্র্যের অসীমতায় বিশ্বাসী নহেন। তাঁহাদের উদ্ভাবনী-প্রতিভা লোপ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সত্য সাধনার পথ অনন্ত

সেইজন্য আমরা আমাদের পুস্তকে যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব ও নগ্ন-বাদের সমর্থন করি নাই। নগ্ন-বাদ ও যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক অতীত অধ্যায়। বহু শতাব্দীর সাধনার পর অতীতের অধ্যায়বিশেষে ফিরিয়া যাওয়ার অর্থ মানবের কয়েক শতাব্দীর সাধনার ব্যর্থতা মানিয়া লওয়া। এই মানিয়া লওয়ার মধ্যে সত্য-স্বীকৃতির পৌরুষ নাই; কারণ ইহা অগ্রগমন নহে, ইহা প্রত্যাবর্ত্তন। মানবের সভ্যতা-সাধনাকে এমন করিয়া গণ্ডীবদ্ধ করিলে মানবের স্রষ্টাকেই পিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নগ্ন-বাদ ও যৌন-নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমাদের সমস্ত কৃষ্টি-সাধনা সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সত্য-সাধনার পথ অনন্ত, অসীম। সুতরাং যুগ-সীমান্ত-রেখাকে যেন আমরা কোনক্রমেই পথের শেষ বলিয়া ধরিয়া না লই।

কৃষ্টি-সাধনার রাজপথে চলিবার সময় আর একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ইহা জনাকীর্ণ রাজপথ। এ পথের সবাই অগ্রগামী। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকা কাহারও সাধ্য নহে।

তরুণদের কর্ত্তব্য

যাহারা যথেষ্ট পথ চলিয়াছে মনে করিয়া স্থাণু হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইবে তাহারা যে কেবল সহযাত্রীদের পশ্চাতে পড়িবে তাহা নহে, সহ-পথিকদের পদতলে তাহাদিগকে পিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং নবাবিষ্কৃত সত্যকে চরম সত্য বলিয়া মনে না হইলেও পরিপার্শ্বিকতার খাতিরে গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

আমার দেশবাসী তরুণ বন্ধুদের কাছে একটা কথা বলিয়া আমি উপসংহার করিব। তরুণেরা শুধু দৈহিকতঃই জাতির ভবিষ্যৎ নহে মানসিকতঃও তাহারা জাতির ভাবী সম্পদ। সুতরাং জাতি রক্ষার উপযোগী অভিনব সত্য তাহাদিগকে আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও প্রচার করিতে হইবে। এই আবিষ্কার ও প্রচার-কার্য্যে তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সমাজ বড়ই বেআড়া স্থিতিস্থাপক জীব। সে যে শুধু নূতন সত্য গ্রহণ করে না, তাহা নহে; নূতন সত্য-প্রচারককে সমাজ কঠোর হস্তে দণ্ডদান করিয়া থাকে। আবার একবার সেই সত্য গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী যুগে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য নূতন সত্যের বিরুদ্ধে তেমনই উৎসাহের সহিত সংগ্রামও করিয়া থাকে। পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ ও নূতনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষই সমাজ-জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব। আমার দেশবাসী তরুণেরা আমার পুস্তকে প্রচারিত সত্যসমূহকে যদি জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধ করে, তবে প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাহারা সে সত্যের পতাকা উত্তোলিত রাখিবে, এই বিশ্বাস ও আশা লইয়া আমি আমার গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

সমাপ্ত

প্রদর্শিকা

অ

আ

ই

উ

ঋ

এ

ও

ঔ

ক

ফ

ব

ল

পরিভাষা

অত্যনুরাগ—Fetishism
আসঙ্গ-বিবাহ—Companionate marriage
অভ্যাসজাত—Acquired
ঐকিক বিবাহ—Monogamy
ডিম্ববাহী নল—Fallopian tube
নগ্নবাদ—Nudism
প্রদর্শনবাদ—Exhibitionism
দখলী স্বার্থ—Vested interest
পুলকাবেগ—Orgasm
বিবাহেতর—Extra-marital
ভগদেশ—Vulva
ভগাঙ্কুর—Clitoris
বহু-বিবাহ—Polygamy
যৌন-প্রদেশ—Erotic Zones
যৌন-বিকার—Sexual Perversions
যৌন-বৈপরীত্য—Sexual Inversion

যৌন-নিবৃত্তি—Sexual abstenance
যৌন-নির্বিশেষত্ব—Promiscuity
সমমৈথুন, সহমৈথুন—Homosexuality
স্বয়ং মৈথুন—Onanism, self-polution
সহজাত—Congenital
সংসর্গবিধান-প্রণালী—Associational Therapy

প্রাগুদ্বাহ—Prenuptial
দ্বৈত মনোভাব—Contrariness
যৌন জড়তা—Sexual anaesthesia
যৌন ঔদাসীন্য—Frigidity
শৃঙ্গার, যৌন উপগমন—Physical Courtship—Conjugal flirtation
যৌনকেশ—Pubic hair
মনোবিধান—Psycotherapy
মনোবিশ্লেষণ—Psycoanalysis